[illegible]

মৌচাক

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই :

উপন্যাস :

বৃত্ত
মরামাটি
দিনান্ত
কস্মৈদেবায়
রাত্রি
কল্লোল

গল্প :

ফসল
ঋণ
নতুন দিনের কাহিনী

কবিতা :

সংকলিতা
নতুন দিন
যৌবনোত্তর
প্রাচীন প্রাচী

জীবনী ও মতবাদ :

কার্ল মার্ক্স

আলোচনা :

তিনজন আধুনিক কবি
ভারতীয় নারী ও সমাজ
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

মৌচাক

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

পাঁচ টাকা

প্রথম প্রকাশ

মাঘ, ১৩৫৫

জানুয়ারী, ১৯৪৯

প্রচ্ছদশিল্পী : অখিল গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা-র পক্ষে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মৌচাক

উনিশ শ' বারো

এক

১

এ-সময়টায় রোজ কেমন যেন একটু ভয়-ভয়ই করে বিরজার। কুপির আলোতে রান্নাঘরের বেড়ায় বড়-বড় ছায়া নড়ে-চড়ে ওঠে—তার নিজেরই ছায়া, তবু যেন কেমন অদ্ভুত! বিরজা ঘোমটা সরিয়ে আঁচলটা কোলের উপর জড় করে রাখে, চুলের স্তূপ আঁট-সাট খোঁপায় জড়িয়ে নেয় তবে যদি ছায়াটা একটু স্বাভাবিক দেখায়। পেতলের থালা-বাটি-গ্লাসগুলো, জলের কলস, শিকেয় তোলা হাঁড়িকুঁড়ি সবই দেখতে আরেক রকম। আগুনের রঙ লাগা—বিরজা বুঝতে পারে—অন্ধকারের উপর উনুনের আঁচ আর কুপির আলো লেগে এমনি হয়। তবু ভয়টাকে চেপে রাখা যায়না—মনের আনাচে-কানাচে সুঁচের মতো কি যেন বিঁধতে থাকে—বিরজা চমকে উঠতে চায়।

দরজা খোলা। দরজার গা ঘেঁষে মিতু আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে—মাটির নীচু দেয়ালটার মুখোমুখি। দেয়ালের উপর থেকে কুপিটা দরজার আড়ালে নিয়ে গেলে হয়ত আর বেড়ার গায়ে ছায়াগুলো পড়েনা। কিন্তু তক্ষুনি মিতু চেঁচিয়ে উঠবে। ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে ওকে তেজপাতা পুড়তে দেওয়া হয়েছে বলেই। কুপির আগুনে

তেজপাতা ধরে ধরে মিতু ফড়্ফড়্ আওয়াজ শুন্‌ছে। তেজপাতার গায়ে ফোস্কা পড়াটা-ও কম মজার ব্যাপার নয়। কুপিটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েও তক্ষুণি আবার গুটিয়ে নেয় বিরজা। মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেলে মিতুকে নিয়ে আর রক্ষা নেই। শোবার ঘরে হাবুল আর তিতুকে কোনোরকমে পড়ায় বসিয়ে দিয়ে এসেছে—হয়ত খানিকক্ষণ পরে হারিকেন লণ্ঠনের আলো ভাগাভাগি নিয়ে নিজেরাই মল্লযুদ্ধ সুরু করবে—তার আগে মিতুকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবার দরকার নেই। পুড়ছে পুড়ুক ও তেজপাতা—তবুত ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে।

কাঠের আগুন—উনুন ছেড়ে উঠবার উপায় নেই। এবারের চেলাগুলো ভালো নয়, আগুনের চাইতে ধোঁয়াই বেশি। কে দেখবে? উনি ত কাঠের আড়তে হুকুম পাঠিয়েই খালাস—ওরা কি পাঠাল না-পাঠাল কে তার খোঁজ রাখে? যতীন অবশ্য পারে। কিন্তু সব সময় কি যতীনকেও ফরমাস করা চলে? বোনের ছেলে, পড়তে এসেছে এখানে কলেজ আছে বলে'। ছেলে যদি পরীক্ষায় ফেল করে বসে, দিদি ভাববেন মাসীর ফুট-ফরমাস খেটেই ওর পড়াশুনো চুলোয় গেল। তার চেয়ে যেমনি চল্‌ছে চলুক। যখন বাইরের উঠোনে গরুর গাড়িতে করে গাছের গুঁড়ি এনে ফেলে, বিরজা নিজেই দেখতে যায়। কিন্তু গুঁড়ি দেখে সে কি বুঝবে? কাঠুরে মজুররা কুড়ুল চালাতে এসে চেলার গুণাগুণ বলাবলি করে। তাদের কাছ থেকেই চেলাকাঠ চিন্‌তে শিখেছে বিরজা। কিন্তু চিন্‌লেও বা কি? খারাপ বলে ত কাঠ আর ফেলে দেওয়া যায়না—তা দিয়েই চালিয়ে নিতে হয়।

কাঠ নিয়েই খানিকক্ষণ বিরজা মনে-মনে কথা কাটাকুটি করে চলে। মন থেকে ভয়টা তাড়ানো দরকার। কেন যে ভয় করে তা-ও ত সে

ভেবে পায়না? রান্নাঘরের উপরে রঙি গাছের ডালে পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ হয়—বিরজা জানে কাক আর শালিকগুলো আস্তানা নিয়েছে ওখানে—কিন্তু জেনেও গা ছম্‌ছম্‌ করে। উপায় কি? কথা দিয়ে মনটাকে ব্যস্ত করে না রাখলে আর উপায় নেই।

রাত হয়ে গেল—যতীন কোথায়? বাসায় ফিরতে ত ওর সন্ধ্যা পেরোয়না কোনদিন? তবে?

"যতীন আসেনি রে মিতু?" মনে-মনেই কথাটা বল্‌তে চেয়েছিল বিরজা কিন্তু মুখ ফুটে গেল।

পোড়া তেজপাতার গন্ধে মিতু বেদম কাশ্‌তে লেগেছে।

বিরজা মিতুর উপর ঝুঁকে পড়ল: "শুঁক্‌তে গিয়েছিলি না কি এগুলো আবার?"

"নাকের ভেতর ধোঁয়া ছেড়ে দিয়েছে—" মিতু চোখ রগড়াতে লাগল।

"দেবেনা? ধরে ধরে পুড়ছিস ওদের!"

মিতু দু'আঙুলে একটা পাতা তুলে দেখতে লাগল, কে জানে গেছো মাছ কি না এ পাতাগুলো—এমনিতে মড়ার মতো দেখতে কিন্তু আগুনের তাত লাগলেই রকমারি কাণ্ড বাধিয়ে দেয়।

"এদের গাছ আছে?" মিতু মার চোখের উপর পাতাটা তুলে ধরে।

"হুঁ---" বিরজা উনুনের হাঁড়িতে মন নিয়ে যায়।

"এগুলো মাছ নয় মা?" ভয় খেয়ে চোখগুলো একটু বড় হয়ে আসে মিতুর।

"হুঁ—" বিরজা ফেন গড়াবার আয়োজন করছে।

আঙুল দু'টো আল্‌গা করে মিতু পাতাটা ছেড়ে দেয়। কিন্তু

ছাড়লেও বা কি? এক্ষুনি ওটা নড়ে-চড়ে উঠতে পারে। লাফিয়ে উঠে কামড়ে ধরতে পারে মিতুর হাত। কোত্থেকে যে তখন ওর দাঁত বেরিয়ে পড়বে কি জানে।

"মাসীমা—"

হাত কেঁপে গেল বিরজার—শরার ফাঁকে খানিকটা গরম ধোঁয়া বেরিয়ে আঙুলের পিঠে ছেঁকা লাগল। যতীন! কিন্তু ওভাবে ডেকে উঠল কেন যতীন? গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছেনা যেন। বিরজার বুক ধড়ফড় করে উঠল।

যতীন রান্নাঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে—বিরজা উঠে এসে দরজার কাছে তার মুখোমুখি থেমে গেল।

"কি রে—" বিরজাও যেন আতঙ্কে শ্বাস নিতে পারছিলনা।

"রেবতীবাবুকে মেরে ফেলেছে—"

"রেবতীবাবু!"

"কদমতলার রেবতীবাবু—বিরাট পালোয়ান—"

"শৈলর দাদা—কি সর্ব্বনাশ—" সমস্ত মুখের ভেতরটা যেন শুকিয়ে উঠল বিরজার।

"কারা গুলি করে ফেলে গেছে জগন্নাথবাড়ির রাস্তায়!" যতীন মুখস্তের মতো কথাগুলো বলে যেতে লাগল।

"চুপ।" বিরজা যতীনকে চুপ করিয়ে দিতে চাইল—হয়ত নিজেরই চুপ করে যেতে ইচ্ছা করছিল তার—হয়ত ভয় হচ্ছিল মিতু শুনতে পাবে, হাবুল আর তিতু শুনতে পেয়ে হাজারো রকম প্রশ্ন সুরু করবে—এ অবস্থাটা যেন বিরজা সয়ে যেতে পারবেনা।

যতীন বুঝতে পারলনা কেন তাকে চুপ করে যেতে হবে কিন্তু চুপ করে গেল সে—মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

"রাত্তির অবধি রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে এ-খবর তোকে কে আন্‌তে বলেছে?" বিরক্তির একটু ঝাঁজ এলো বিরজার গলায়ঃ "রাস্তায়ই যদি ঘুরবি পড়াশুনোটা কখন হবে শুনি!"

"কলেজের হষ্টেলেই ত ছিলাম আমি—" যতীন বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নেমে গেল।

শোবার ঘরের বারান্দার এক পাশে বেড়ার ঘেরাও দিয়ে ছোট একটি কামরা তৈরী করা হয়েছে। প্যাকিং বাক্সের কাঠে তৈরী একটা ছোট সেল্‌ফ আর দু'হাত-চারহাত একটি চৌকি ধরবার মতো একটু ঠাঁই। তা-ই যতীনের ঘর। বারান্দার দিকেই দরজা। দরজার শিকল তুলে ঘরে ঢুকল যতীন। সার্ট খুলে বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে দিলে—সব আনাচ-কানাচই এতো পরিচিত যে অন্ধকারেও কোনো অসুবিধে নেই। হাত বাড়ালেই ছোট্ট ডিট্‌স্ লণ্ঠনের ধরনাটা হাতে ঠেকে যায়। লণ্ঠনটা চোখ বরাবর তুলে চাবি টিপে চিমনি উপরে সরিয়ে নিয়ে যতীন আবার রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে আসে।

কিন্তু ঘরে ঢোকে না—বারান্দায় দাঁড়িয়েই বলেঃ "ল্যাম্পটা ধরিয়ে দিন্ মাসীমা—"

এক ফালি ছেঁচা বাঁশে আগুন ধরিয়ে বিরজা নিঃশব্দে এসে ল্যাম্পের সল্‌তেয় লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। উনুনে মাছের ঝোল ফুটছে—একটু দাঁড়ালে ক্ষতি হবেনা—তবু সে দাঁড়ায় না। যতীনকে বুঝতে দিতে হবে সে বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু সত্যি কি বিরক্ত হয়েছে বিরজা? সবসময়কার সেই মানে-হীন ভয় এখন যেন পুরোপুরি একটা চেহারা নিয়ে তার মনের উপর ভার জমিয়ে তুলছে। উনি ফিরছেন না কেন এখনো! কি বিশ্রী হয়ে চলেছে যে দিনকাল—ডাকাতি খুনোখুনি। পুলিশ দারোগার ভয় যেন নেই আর মানুষের—ফিরে

পুলিশের লোকদেরই এখন ভয়! কিন্তু ভয় কি আছে ওঁর—শখ করে রাত্রির ডিউটিতে যাবেন, যেখানেই কোনো গোলমাল সেখানেই ওঁর থাকা চাই। এ না হলে যেন আর চাকরির উন্নতি হবেনা। তা-ই যদি, না-ই বা হল উন্নতি, বেঁচে থাকলে টাকা রোজগার একভাবে কর যাবেই।

এতোক্ষণ খেয়াল ছিলনা, হঠাৎ কানে এলো বিরজার শোবার ঘরে চেঁচামেচি স্নুরু হয়ে গেছে।

"এই মিতা—গেলি এখান থেকে—" ভারিক্কি গলায় ধমক দিচ্ছে হাবুল।

"দ্যাখো মা, মিতু কি স্নুরু করেছে এখানে এসে—" তিতু চেঁচিয়ে চলছিল।

কখন পালিয়েছে মিতু সে-খেয়ালও ছিলনা বিরজার! ঝোলটা আরো ফুটবে—তবু উনুনের পাশে কড়াই নামিয়ে রেখে, জ্বলন্ত কাঠগুলো উনুনের মুখে টেনে এনে বিরজা উঠে এলো। রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে শোবার ঘরে এসে তাকে উপস্থিত হতে হল।

মার গন্ধ পেয়েই মিতু এসে দুহাতে বিরজার হাঁটু জড়িয়ে ধরল। দাদা আর তিতুকে কি ভয় আর? ওই বাতির সামনে মাদুরের উপর তাকে কে বস্‌তে দেয়না দেখা যাক এখন! চোখ দুটো বেপরোয়া করে দাদার দিকে তাকাল মিতু।

হাতের উপর মাথার ভর রেখে বই-এর উপর উবু হয়ে আছে হাবুল। তিতু সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি তুলে নামতা মুখস্তের চেষ্টা করছিল—এতো ঝাঁকুনি খেয়েও যেন শরীর ব্যাপারটাকে মনে তুলে দিতে রাজি হচ্ছেনা, বোঝা গেল। কারণ সতেরো দুগুণে চৌত্রিশের

পর নাম্‌তার বংশে এমন কথা পাওয়া যায় না যে মিতুকে এ-ঘর থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে!

"থাকতে চায় থাকুক না বসে তোদের কাছে—" বিরজা বললে।

"তোমার ছেলে চুপ করে বসে থাকে কি না!" তেতো হয়ে উঠল তিতুর গলা।

"আমার কাছে ত এতোক্ষণ চুপ করেই বসে ছিল।" বিরজা হাসতে লাগল।

"যতসব আজগুবি বকর বকর করতে সুরু করেছে—"

"না মা—" হুইসেলের আওয়াজে চেঁচিয়ে উঠল মিতু।

"আঃ!" বাঁকাচোরা চোখে এক পলক উপরে তাকিয়েই হাবুল আবার চোখ নামিয়ে নিল।

"ও বলছে আমাকে গুলি করবে তারপর আবার বলছে গুলি করলে কি হয় রে তিতু"—তিতু গজগজ করতে লাগল।

বিরজা চমকে উঠল—যতীনের কথাগুলো তাহলে শুনতে পেয়েছে মিতু। শুনতে পাবেনা কেন--তার পেছনেই ত দাঁড়িয়েছিল ও, যতীন এসে যখন বকবক করতে সুরু করল। আর ছেলেগুলোও তার যেমন হয়ে চলেছে—কোথায় কি কথা হচ্ছে কান পেতে পেতে শোনা চাই। টুঁ শব্দটি গোপন রাখবার উপায় নেই এদের যন্ত্রণায়। এক টানে মিতুকে কোলে তুলে নিল বিরজা—হাতে যদি ওর একটু ব্যথাও লাগে লাগুক —বুড়োদের কথা গেলার এমন অভ্যাস হয়েছে কেন ওর?

মিতুকে বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে বিরজা আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। ঝোলটা সেরে খানকয়েক ভাজা উল্টে নিলেই এ-বেলার মতো হাঙ্গামা চুকে যায়। তারপর দুধের কড়াই উনুনে বসিয়ে দিতে পারলেই একদম নির্ঝঞ্ঝাট। পাঁচ-দশ মিনিট মাত্র সময়। একটা গান গুণগুণ

করে উঠল বিরজার মনে। তাদের গাঁয়ের এক সিদ্ধার গান—ঘরে ঘরে গাওয়া হ'ত—অনেক শুনেছে বিরজা, মনে না রাখতে চাইলেও মনে আছে। আর কি অদ্ভুত ছাখো—ঠিক-ঠিক সুর নিয়ে এখন মন থেকে উঠে আসছে গানটা। "বলো মা কি গুণে তব গুণগাণে তুষিব তোমায় ত্রিগুণে…" গলা ছেড়েও গাইতে পারে বিরজা, কিন্তু না। পাশের বাড়ির ওরা শুনতে পেলে কেলেঙ্কারি! রান্নাঘরের গা-ঘেঁষা ওদের ঘর, এখানকার শ্বাসের আওয়াজও ওরা শুনতে পায়। তেম্নি ওদের কথাও বিরজার কানে আসে হরদম। পশ্চিমের বাড়ির লোকদের সঙ্গে বাড়ির কর্ত্তা ডেকে ডেকে কথা বলছেন—গলার স্বরটা ওর অনেকক্ষণ ধরেই কানে আসছিল, ইচ্ছো করলেই বিরজা কথাগুলো শুনতে পারে। হ্যাঁ—এইত শোনা যাচ্ছে—কিন্তু এ কি বলছেন উনি? গলার গুণগুণানি থেমে গেল বিরজার, কান খাড়া হয়ে উঠল। রেবতীবাবুর কথাই বলছেন।

"হেঁ-হেঁ ছিলেনত স্বদেশীর দলেই—পুলিশের গোয়েন্দারাও আজকাল স্বদেশী সাজে—" কর্ত্তার ভারিক্কি গলাটা বিদ্রূপে হাল্কা শোনাচ্ছিল।

ও-বাড়ির লোকরা উত্তরে কি বলছিলেন বিরজা শুনতে পেলনা। আবারও কর্ত্তারই গলা শোনা গেল: "স্বদেশীরা এবার তা-ই ধরে ধরে দারোগা-পুলিশ মারবে!"

পেটের নাড়িতে যেন মোচড় লাগল বিরজার। একরকম বেহুঁসের মতোই হাত চালিয়ে একের পর এক কাজগুলো করে যেতে লাগল সে—আলু-কুমড়ো ভেজে দুধের কড়াই উনুনে চাপিয়ে দিতে গিয়ে মনে করতে পারলনা সত্যি আলুকুমড়ো ভাজা হয়েছে কি না। থালার উপর উঁকি দিয়ে ভাজাগুলো আবার দেখতে হল। এ-ঘর থেকে পালিয়ে শোবার ঘরে আশ্রয় নেবার একটা তাগিদই অবিরত তার মনকে

খুঁচিয়ে চলেছে—এ-ঘরের দায় কোনোরকমে শেষ করে পালাতে পারলেই যেন সে বাঁচে। কিন্তু তাতে খানিকটা সময় নষ্টই হয়—খানিকটা বেশি সময় থাকতে হয় তাকে এ-ঘরে। হাত ধুতে ভুল হয়—উনুন থেকে জলন্ত কাঠগুলো সরিয়ে আনতে ভুল হয়ে যায়, ডালের বাটি ঢাকা দিতে মনে থাকেনা। তবু একসময় সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বিরজা মিতুকে কোলে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। চৌকাঠের আংটায় দরজার শেকলটা গলিয়ে দিয়ে ছায়ার মতো নিঃশব্দে শোবার ঘরে চলে আসে।

২

রাত দশটা। নিঝুম হয়ে গেছে সমস্ত পাড়া—বড় সড়কেও টুঁ শব্দ কেউ করছেনা। সাড়ে এগারোটায় একটা ট্রেন আছে—ষ্টেশন থেকে লোকজন নিয়ে তখনই যা দু'চারটে ছ্যাকরা গাড়ি আসবে—কাতরানির শব্দে জাগিয়ে দিয়ে যাবে চারদিক। তার আগে কি বিশ্রী চুপচাপ—মনে হয় কাকপক্ষীটিও বেঁচে নেই। ঠিক গাঁয়ের মতন। বিরজার ভালো লাগেনা—সহরেও ঠিক গাঁয়ের মতন কেন মনে হবে? বিরজা বুঝতে পারেনা। কচি সহর, গাঁয়ের গন্ধ কি সহজে ভুলে যেতে পারে! দিনের বেলায় মানুষের ছুটোছুটি, ছটফটানিতে একটু সরগরম তারপর রাত্রিতে বড় বড় গাছগুলো বোঝা-বোঝা অন্ধকার নিয়ে দাঁড়ায়, ল্যাম্পপোষ্টের শ'-দেড়শ' টিমটিমে বাতি সে-অন্ধকারে নিরুপায়। গাঁয়ের মতোই ঘরে ফিরে যায় মানুষ —অকর্মণ্য সময় অন্ধকারে নিঝুম হতে সুরু করে।

একা বসে বসে শাড়ির পাড় থেকে রঙীন স্থতো ছাড়িয়ে নিচ্ছিল বিরজা—ছোট ছোট শিশি-বোতল রাখবার শিকে তৈরী হবে। কিন্তু কান পেতে রেখেছে সে বাইরে—মোহিনীর জুতোর আওয়াজ শুনবার আশায়। অনেক আগেই তিতু আর মিতু ঘুমিয়ে পড়েছে—গুলি ছোঁড়ার গল্প থেকে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে এসে পালা শেষ হয়েছে ওদের। হাবুলকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট নেই—খাবার ভাগটা ওর বেশি হলেই হল, আর মেজাজ দেখা যাবে না। কিন্তু তিতু-মিতুর সোরগোল যে কখন উঠবেনা বলা মুস্কিল। একসঙ্গে ওদের থাকাও চাই আবার প্রহরে-প্রহরে ঝগড়াও চাই। তবু ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকাটাও যেন ভালো—এ সময়ে একা এমনি বসে থাকতে হলে তা-ই মনে হয় বিরজার। একটু সাড়া নেই কোথাও—ঘরের কবাট বন্ধ করে চুপচাপ জেগে বসে থাকতে পারে না কি কেউ? সাড়ে ন'টা অবধি যতীনকে জাগিয়ে রেখেছিল সে, যতীনও হাই তুলতে লাগল! ছেলেমানুষ, কতক্ষণ আর জাগতে পারে—ভাতের ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল।

এ-ঘরেই মোহিনীর জন্যে ভাত ঢাকা আছে। বিরজা খেয়ে নিয়েছে। ক্ষিদে পায় তার, কি করবে? মোহিনী অনেকদিনই বলেছে, দারোগার খাবার আশায় উপোসী বসে থাকলে ক্ষিদে মরে অসুখ করে যাবে কিন্তু। প্রথম-প্রথম বিরজা মানতে চায়নি। শেষটায় নিয়ম ভাঙতেই হল। কতো নিয়মই ত ভাঙতে হচ্ছে দিনের পর দিন। মা যা করতেন—ছোট বেলায় দেখেছে বিরজা—তা কি ঠিক ঠিক করে যেতে পারছে সে? সহরে থাকার দোষ দিয়ে লাভ নেই—মন থেকেই যেন সব কিছু মেনে নিতে নিষেধ আসে। চেষ্টা করেও মার মতো হতে পারছেনা বিরজা। আর তা-ই হয়ত মা

তাকে ঠিক আগেকার চোখে দেখেন না—একটু যেন অবহেলা, একটু কৌতূহল যেন চোখে-মুখে মাখানো থাকে তাঁর। আগেকার মতো হেসে কথা বললেও মার মুখে আগেকার সেই হাসি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাবতে গেলে দুঃখ হয়। কিন্তু নিজেও ভেবে পায়না বিরজা কি করে সে মার কাছ থেকে এতোটা দূরে সরে এলো! কাছের মোহিনীকেই তাই দুষতে হয়। তোমার ঘরে এসেই আমার সব গেছে, ব্রতপূজো ত মাথায় উঠেছেই—যত সব নোংরামির অভ্যাস হচ্ছে দিন-দিন। তাই নাকি?—কানেই ঢোকেনা যেন ওঁর কথাগুলো। বেশ আলাদা হয়ে থাকতে পারেন—আলগোছে তুলে নিয়ে যেতে পারেন নিজেকে! এক অদ্ভুত মানুষ! পুরুষ হলেই কি এমি ভেসে ভেসে চলতে হবে? বিরজা কি দেখেনি তার বাবাকে? টোলের পড়ুয়াদের পড়িয়েও ক্ষেতখামারের কাজে একটু অমনোযোগ ছিলনা তাঁর। সংসারটাকে দু'হাতে আঁকড়ে রেখেছিলেন। পালপার্ব্বণে খুঁত থাকার উপায় ছিলনা। বাবা পেছনে না থাকলে মার সাধ্য কি মাসের পর মাস এতো কাজ গুছিয়ে তোলা! হাটবাজার থেকে সুরু করে রান্নাঘরে পর্য্যন্ত বাবাকে দেখতে পেয়েছে বিরজা। কোনো কাজেই তাঁর উৎসাহের অভাব ছিলনা, অযত্ন ছিলনা। মারাও গেলেন ঠিক তেমি কাজেরই উপর। বিদ্যাকূটের পণ্ডিতসভা থেকে ফিরে এসে জ্বরে মাত্র তিনদিন বিছানায় শোওয়া ছিলেন—শেষ দু'দিন জ্ঞান ছিলনা। ভালোই গেছেন—সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে এমন চমৎকার ক'জন যেতে পারে? বিরজা গিয়ে দেখতে পায়নি বাবাকে। অসুখের দ্বিতীয় দিনই মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে মা নৌকো পাঠিয়েছিলেন—কে জানত তিনদিনের জ্বরেই সব শেষ হয়ে যাবে? বিরজা কান্নাকাটি করেনি খুব—কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল

শরীরটা—মনে হচ্ছিল চোখের উপর থেকে যেন মস্ত একটা পাহাড় ধ্বসে গেল।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বিরজা মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাল। কোথায় কে? আসবার নামগন্ধও নেই মোহিনীর। বিপদ হয়নি নিশ্চয়ই। তেমন কিছু হলে এতক্ষণে খবর এসে যেত। কিন্তু ও-বাড়ির কর্ত্তা ওসব কি বলাবলি করছিলেন? যতই দিন যাচ্ছে মানুষটার উপর ধারণা বদলে যাচ্ছে বিরজার—বিরজার বাবার বয়েসী হবেন কর্ত্তামশাই, পাড়ার মুরুব্বি মানুষ—কিন্তু সাদাসিদে মন নয়। প্যাঁচালো কথা ছাড়া বলেন না, লোকের খুঁত শুঁকে বেড়ান চারদিকে। দারোগা বলে মোহিনীর উপর ওঁর নজরটা গোড়া থেকেই বাঁকা হয়ে আছে। কোর্টে সেরেস্তাদারি করেন—ডাকহাঁক-দাপটের অন্ত নেই,—পাইকপেয়াদার সেবা-সেলামে প্রভুত্ব ওঁর উঁচু হয়েই থাকবে—দারোগা বলে ত মোহিনী আর ওঁর মানমর্য্যাদা কেড়ে নিতে যাচ্ছেনা! তবু কোথায় যেন একটা গলদ খুঁজে পেয়েছেন কর্ত্তামশাই, নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না মোহিনীকে নিয়ে—পাড়ায় নূতন বাসিন্দে এলে পুরোনো বাসিন্দের মনে যা হয়। উকীল-পাড়া ছেড়ে এ-পাড়ায় এসেছে ত বিরজারা প্রায় একবছর হয়ে গেল। একটা বছরেও কি কর্ত্তামশাই-এর সন্দেহ গেলনা?

বিরজার মনে কর্ত্তামশাই-এর কথা আর ছবিগুলো তলিয়ে যেতে লাগল—উপরে ভেসে উঠল উকীল-পাড়া। উকীল-পাড়াতেই তার সহরবাসের স্থরু। তিনচার বছর কাটিয়ে এলো তারা ওখানে—ওখানেই মিতুর জন্ম। ছেড়ে কি আসত বিরজা ও-পাড়া? শৈলর বুড়ো শ্বশুর এসে বললেন, মা, তোমাদের দশের আশীর্ব্বাদে ওদিকটায় একটি পাকা কোঠা তুলতে চাই—নতুন পাড়ায় তোমাদের আমি

ভালো বাড়ি খুঁজে দিচ্ছি, চাও ত খানিকটা জায়গাও কিনে নিতে পার! বুড়োর গলায় বাড়ি-ওলার জবরদস্তি ছিলনা, ছিল অনুনয়, অনুরোধ। তবু কোথায় যেন বিঁধল বিরজাকে। হয়ত অপমানেরই একটু খোঁচা লাগল। পরের জায়গা বলেই ত আজ তাকে উঠে যেতে হবে এখান থেকে! তাছাড়া যাঁর জায়গা তাঁর অসুবিধে সৃষ্টি করবে কেন তারা? এ অভিমানটুকু বিরজার থাকতে পারো নিজের খানিকটা অসুবিধে হবে হোক। কিন্তু একবার, তার বেশি নয়। ভাড়াটে বাড়িতে থাকবার শিক্ষা তার একবারেই হয়ে যাক। জায়গা কিনতে হল মোহিনীকে নতুন পাড়ায়—বদলীর চাকরী বলে মোহিনীর আপত্তি ছিল কিছুটা। তবে ধরেপড়ে দশপনেরো বছর যদি থাকা যায়—তাছাড়া টাকাও যখন মাত্র তিন শ'—একটা জায়গা থাকা নেহাৎ লোকসানের ব্যাপার হবে না। তারপর সহরের জায়গা, দাম ওর বাড়তেই থাকবে, যখন খুসী বেচে দাও।

নিজের জায়গা, নিজের ঘরদুয়ার, তবু যেন মন বসতে চাইত না বিরজার। সব যখন সিজিলমিছিল হয়ে গেল, কাজের ঝঞ্ঝাট কমে এলো, তখন যে কী ভীষণ মনে পড়ত তার উকীল-পাড়ার পড়শীদের কথা! শৈলর বর ছাড়াও দু'ঘর উকীল—ভারি আমুদে উকীলগিন্নীরা, একটু বাবু—তবে বাবুগিরিটা ওদের অভ্যাসই, পরকে দেখাবার জন্যে নয়। অম্বিকা মোক্তারের দুই স্ত্রী—হাবাগোবাই বলত সবাই বড়গিন্নীকে, কিন্তু আসলে মানুষটা ভালো, বড্ড বেশি ভালো—ফাজিল ছোটগিন্নী চোখে-মুখে কথা বলত। এদের সবাইকে হয়ত ভুলে থাকা যায় কিন্তু সোনার মার অভাবটা বিরজা কিছুতেই ভুলতে পারেনি। কাছারীতে পানের দোকান ছিল সোনার বাপের—রোজগার যা হত ওদের স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে যথেষ্ট। সোনার মাও

ওস্নি—সোনা বলে ওদের কেউ নেই—ছেলেপুলে হয়নি ওর। একটা ময়না পুষত—বিরজা বলত, ময়নাই বুঝি তোর সোনা? হাসতে হাসতে বিরজাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সোনার মা উত্তর দিত, 'ওলো দারোগা, তোদের সোনাগুলো কি আমার সোনা হতে পারেনা?' শুধু সোনার মাকে দেখবার জন্মে—ওর সঙ্গে গল্প করবার জন্মে বিরজা সপ্তাহে দু-একদিন ঘণ্টাচুক্তি গাড়ি ভাড়া করে দুপুর বেলা উকীল-পাড়ায় বেড়াতে গেছে। কাছেপিঠে হলে হেঁটেই যাওয়া যেত কিন্তু আধমাইল রাস্তা মেয়েরা হেঁটে যায়না—হেঁটে ত যায়ই না, গাড়ির ঝিলমিলও তুলে যেতে হয়।

সুতো ছাড়াবার কাজ হয়ে গেছে। খাগের নলে জড়ানো লাল-নীল সুতোর গুলিগুলো ছোট্ট একটা ঝাঁপিতে তুলে রেখে বিরজা উঠে দাঁড়াল। ঘড়িটা টিকটিক করে সাড়ে দশটায় এগিয়ে গেছে! একেকদিন এমন দেরী করবেন উনি আর এমন ভাবিয়ে তুলবেন! বিরক্ত হয়ে উঠল বিরজা। বিছানার কাছে গিয়ে মশারি তুলে দেখল—ছেলেরা নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে—মিতুটা সরে এসেছে প্রায় তার বালিশের উপর—জেগে উঠলে হাতড়ে খুঁজতে সুরু করবে মাকে। না পেলে চেঁচিয়ে উঠবে—তারপর সে চেঁচানি থামাতে প্রাণান্ত।

মশারি নামিয়ে দিয়ে বিরজা ঘরের ওপাশে মোহিনীর বিছানায় এসে বসল। হঠাৎ মনে হ'ল তার সমস্ত হৃদপিণ্ডটা যেন বুকের নীচে জেগে উঠেছে। আর তাই সমস্ত শরীরের ভেতরটাও যেন নড়েচড়ে উঠছে। মোহিনী বিছানায় থাকলে যেমন হত। অদ্ভুত এ মুহূর্ত্তগুলো! শরীরের খুঁটিনাটি সবটুকু চেহারা মনে করিয়ে দেয়। এমনিভাবে শরীরটাকে আর কোনো সময় মনে পড়ে না ত! ভারি-ভারি মনে হয় মাথাটা—দপ্দপ্ করতে থাকে বুক—পা দু'টোকে নাড়তে ইচ্ছা করে।

বিরজা কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়—নিজেকেই শোনাবার জন্যে বলে, 'ভালো লাগছে না'। ভালো লাগছে না?—সত্যি? সত্যি নয় ত কি? কখন আসবেন—কখন খাবেন—কখন বা শোবেন কে জানে! ঘুমিয়ে থাকলেই পারত সে। কিন্তু মনে একটা ভাবনার খোঁচা নিয়ে ঘুম আসতনা হয়ত। মিতুর পাশে পাঁচ মিনিট শুয়ে উঠে আসতে হয়েছে ত তাকে—ঘুমুতে পারতনা বিরজা।

সন্ধ্যাবেলা ভয়-ভয় করে বিরজার কিন্তু আশ্চর্য্য, রাত্রি বাড়তে থাকলে, কই, আর ত ভয় থাকেনা। চারদিকে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে—একা সে জেগে আছে, ভয় পেতে হলে এখনি ভয় পাবার কথা। কিন্তু তার চারপাশে ভয়ের ছায়াগুলো আর জমে নেই—মনে হয়, সে যেন খুবই জানাশোনা একটা সময়ের কাছাকাছি এসে গেছে—যেন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ চারদিক। এখানকার অন্ধকারের সঙ্গে, এখনকার নিঝুম মুহূর্ত্তগুলোর সঙ্গে তার যে কি গভীর পরিচয় সে ছাড়া আর কি কেউ তা জানে? হয়ত জানে আর একজন—মোহিনী। তাই হয়ত বিরজার জন্যে তার ভাবনা নেই। মোহিনী জানে, বিরজা ভয় পায়না। এমনি কতো রাত্রিতে বাড়ি ফিরে এসে বিরজাকে একা জেগে বসে থাকতে দেখেছে মোহিনী। হয়ত বিরজার চোখে একটু অভিমান আছে, কিন্তু তাছাড়াও আছে খানিকটা দুরভিসন্ধির মতো কিছু—ভয়ের সাদাটে জড়তা নেই। চামড়ার নীচে রক্তের আনাগোনায় চকচক করছে বিরজার মুখ—মোহিনী বুঝতে পারত। বিরজা নিজেও বুঝতে পারে এ সময়টায় সে যে আরেক রকম হয়ে যায়। দিনের বেলায় যে খুঁটিয়ে খুটিনাটি কাজ করে চলছে—ছেলেদের পেছনে টইটই করছে—গলা ছেড়ে কথা বলছে—রাগ করছে—হাসিতে ভেঙে পড়ছে—এ-বিরজা যেন সে-মানুষ নয়। এ যেন তার দিনের জগৎটাকে

কোথায় পেছনে ফেলে আসে, কথা বলতে ভুলে যায়, ভাবতে পারেনা শরীরটা ছাড়া নিজের বলতে তার আর কিছু আছে কি না। আয়নাতে গিয়ে মুখ দেখতে ইচ্ছা করে বিরজার—কিন্তু রাত্রিতে আয়নায় মুখ দেখা অন্যায় তাই বেড়ার গায়ে ঝোলানো আয়নার ভয়ে ওদিককার বেড়ার দিকেই আর তাকায় না। কিন্তু আয়নায় না দেখলেও মুখটা তার এমনিতেই চোখের উপর ভেসে উঠে। দিনের বেলাকার কোনো মুখের মতোই এ-মুখ নয়। স্নানের শেষে চুল আঁচড়ে নিয়ে যখন সে সিঁদুর পরে, তখনকার মুখের মতো কি? উঁহু। ছেলেরা কেউ ঘরে নেই, মোহিনী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছে—রান্না ছেড়ে বিরজা এসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে মোহিনীর পাশে দাঁড়াল—তখন যে রকম মুখ থাকে বিরজার, তা-ও এ-রকম নয়। কি করে এ-রকম হবে তখন? তখন দিন আর এখন রাত্রি।

চোখ বুঁজিয়ে রাখে বিরজা। বোঁজা চোখে খানিকটা সময় কেটে যাক। কিন্তু চোখ বুঁজে থাকলেও সব কিছুই দেখা যাচ্ছে। মোহিনী যেন এলো—একটু বেশি ক্লান্ত মুখ। কিন্তু তা কিছু নয়—জামা জুতো খুলে হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নিল চাট্টি। পোলো সিগারেটের বাক্স থেকে খুঁটে একটি সিগারেট তুলে ঠোঁটে গুঁজে দিল। দেশলাই-এর কাঠি জ্বলল ফর্‌-ফর্‌ আওয়াজ করে। এ-আওয়াজে তিতু মিতু কেউ জেগে উঠল না কি? না, ঠাণ্ডা হয়েই ঘুমুচ্ছে ওরা। সিগারেটের ধোঁয়ার ঝাঁজাল গন্ধ এসে নাকে ঢুকছে বিরজার—খারাপ লাগছেনা ত তার একটুও—শরীরের ঝিম্‌ঝিম্ শব্দটাকে চড়িয়ে দিচ্ছে খানিকটা—বেশ লাগছে তাতে। 'কি?'—সেই একই কথা, একই গলা মোহিনীর। কিন্তু এ শব্দটুকু শুনবে বলেই যেন অপেক্ষা করেছিল এতক্ষণ বিরজার শরীর—ঝিম্‌ঝিম্ শব্দটা ডুবে গিয়ে শরীর থেকে অনেকগুলো ফাঁকা

গেল। যেন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল, 'কি', 'কি', 'কি'। হাসতে চেষ্টা করছে বিরজা কিন্তু ম্লান হয়ে যাচ্ছে হাসি।

বিরজা চোখ মেলে তাকাল, এপাশ-ওপাশ গড়িয়ে নিয়ে উঠে বসে পড়ল।

এবার ঠিক শোনা যাচ্ছে। গলির মোড়ে অনেকগুলো জুতোর অস্পষ্ট আওয়াজ। হেঁ—ঠিক। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বিরজা আবার পিছিয়ে এলো। থাক—এলেই খোলা যাবে। ভারি-ভারি অনেকগুলো জুতো তাল ঠুকে এগিয়ে আসছে—হয়ত কনষ্টবলদের সঙ্গে এনেছেন। ভালোই করেছেন—'স্বদেশীরা এবার ধরে ধরে পুলিশ দারোগা মারবে'—কর্ত্তামশাইর গলা চেঁচিয়ে উঠল বিরজার মনে—ভালোই করেছেন কনষ্টবলদের সঙ্গে এনে। রেবতী বাবুকে যারা মেরেছে কে বলবে তারা যে মোহিনীরও পেছনে নেই! কদমতলায় কি সোরগোলই না জানি পড়ে গেছে—আর উকীল পাড়ায় শৈলদের বাড়িতে। বিরজার চোখের উপর দপ করে ফুটে উঠল রেবতীবাবুর বৌ-এর কচি মুখখানি। ঈস্, কি সর্ব্বনাশ মেয়েটার। স্বপ্নেও ভাবেনি, আজ ওর এ সর্ব্বনাশ লেখা ছিল।

উঠোনে দাঁড়িয়ে কনষ্টবলদের বিদায় করে দিচ্ছে মোহিনী। বিরজা দরজার খিল খুলে কবাটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মনে পড়ল না সলতে উস্কে দিয়ে লণ্ঠনটা যে চৌকাঠের পাশে এনে রাখা উচিত। যখন মনে পড়ল মোহিনী তখন ঘরে এসে ঢুকেছে।

দুই

১

কাপড়ের খুঁটটা মাথার উপর ঘোমটার মতো তুলে দিয়ে যতীন দুলে-দুলে লজিকের কিম্ভুত সূত্রগুলো মুখস্ত করছিল। ওগুলো যেন দুর্ব্বোধ্য কোনো মন্ত্রের ভাষা—বাংলা অক্ষরের ধ্বনিতে টেনে না আনলে কিছুতেই মগজে ঢোকানো যায়না। 'ব্রাহ্মণটি কেমন আছে দ্বিমারীর দেশে'—কথাটাই তাই সে ফিরে-ফিরে আওড়ে যাচ্ছিল। লাল-নীল রংয়ে ছকআঁকা বাঁশের একটা খুঁচিতে মুড়ি আর নারকেলের নাড়ু নিয়ে বিরজা এসে কখন দরজার পাশে দাঁড়িয়েছে সে খেয়াল তার নেই। আর-আর দিন বিরজা এসে দাঁড়ায়না, টুকরিটা যতীনের সামনে রেখে নিজের কাজে চলে যায়। কিন্তু আজ, মনে হ'ল, যতীনের পড়ায় সে খানিকটা উৎসুক হয়ে উঠেছে।

"কলেজে এসব মাথামুণ্ডুই বুঝি পড়িস্ তুই—" ঘরে ঢুকে বিরজা হাসতে লাগল।

মুখ তুলে যতীন খানিকক্ষণ হাঁ করে মাসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর সমস্ত ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে পেরে যেন হঠাৎ বলে উঠল: "মাথামুণ্ডু? ওত লজিক—তর্কশাস্ত্র।"

"তোদের কলেজেও তা-ই পড়ানো হয়—টোলের বিদ্যে! বাবার পড়ুয়ারা কোমর বেঁধে পণ্ডিত সভায় লড়তে যেতেন।"

মাসীমার মেজাজে উৎসাহিত হয়ে উঠল যতীন, খুঁচিটা কোলের উপর রেখে মাসীমার কথার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল: "এ হচ্ছে আপনার

বিদেশী পীণ্ডিতের শাস্ত্র। এর প্যাঁচে আমাদের পণ্ডিতমশাইরা ঘায়েল হ'য়ে যাবেন—দেখবেন আপনি!"

"তুই কি পণ্ডিতদের সঙ্গে লড়তে যাবি না কি।" গোল হয়ে উঠল বিরজার চোখ।

"এখন নয়—পরে।" যতীন মুড়ি চিবতে লাগল।

"ওঁ, বাবার নামের উপর কালি মাখাবার মতলব করছ তুমি। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হবে!"

"ঐ দেখুন মাসীমা আপনি লজিক জানেন না! কালিই যদি মাখাই, তাহলে ত প্রহ্লাদকুলে দৈত্য হলাম—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ত নয়!"

বিরজা চোখ রাঙায়ঃ "চুপ কর!" কিন্তু মনে-মনে খুসী হয়ে ওঠে। ভারি সাদাসিধে আর মিশুক হয়েছে ছেলেটা। মুখচোরা, কিন্তু কুটিল নয়। দিদি ওকে অসুর বলে গাল দেন। আর তাই হয়ত বিরজার কাছে ওর আদর খানিকটা বেশি। দিদির সঙ্গে বিরজার রেষারেষি একটু আছে বই কি! রেষারেষি মানে, বিরজার স্বভাবটা দিদির মতো নয়। দিদির রকম-সকম হুবহু মার মতো—মার প্রথম সন্তান, মার চেয়ে বয়েসে মাত্র পনেরো বছরের ছোট—তাই স্বভাবটাও ফিরে মার মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বিরজা আরেক রকম। মার ছাঁচে তৈরী তাকে বলতে পারোনা। ছোটবেলা থেকেই সে একটু খাপছাড়া, মা অবশ্য বলতেন ঝগড়াটে। নিজে খাপছাড়া বলেই যতীনের খাপছাড়া কথাবার্ত্তাগুলো ভালো লাগে বিরজার।

"আজ তোর কলেজে যাওয়া হবেনা কিন্তু, তাই বলতে এলাম!" বিরজার গলায় তখনও অভিভাবকের ভঙ্গী।

মাসীমাকে আবার দুর্ব্বোধ্য মনে হ'ল, যতীন বোকা-বোকা চোখে তাকিয়ে রইল।

"আজ আর কলেজে গিয়ে দরকার নেই, উনি বলে গেলেন!" বিরজা নিষেধটা আরেকটু পরিচ্ছন্ন করে তুলল।

"কলেজে আজ আমাদের ডিবেট্ আছে—" ডিবেট্ কথাটা যে মাসীমা বুঝবেন না নিষেধের তাড়নায় তা-ও ভুলে গেল যতীন।

"একদিন তোর ওসব ছাইভস্ম না থাক্‌লেও চল্‌বে! পুলিশ যাবে আজ কলেজে, কাকে ধরতে কাকে ধরে নিয়ে যাবে ঠিক নেই, আর উনি চলেছেন কলেজে!"

যতীন সশব্দে হেসে উঠল: "আজ কলেজে না গেলেই ত বরং পুলিশের সন্দেহ হবে! মেসোমশাই কখখনো কলেজে যেতে আমায় নিষেধ করেন নি—" মাথা নাড়তে সুরু করল যতীন: "আপনি মিছে কথা বলছেন!"

"ধেৎ—" একটা কড়া ধমক দিয়ে বিরজা মুখ ফিরিয়ে নিল, ফের যখন যতীনের দিকে তাকাল তখন তার ঠোঁটের আশে-পাশে বিন্দুবিন্দু হাসি দেখা যাচ্ছে: "তোকে আজ বাসায় থাক্‌তে হবে!"

"থাক্‌ব!"

"আমাকে যেতে হবে না রেবতীবাবুর বাসায়—শৈলদের ওঁখানে? অপিস থেকে আর্দ্দালি পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। মিতুকে নিয়ে বাসায় থাক্‌তে হবে তোর!"

যতীন চুপ করে মুড়ি চিবোতে লাগল।

"তোদের সবারই বিকেলের ভাত ঢাকা থাক্‌বে—ফির্‌তে যদি আমার দেরি হয় খেয়ে নিস। উনুনের উপর দুধের কড়াইটা কিন্তু দেখিস, দুধ খেতে ত রোজ তোর ভুল হয়!" শাড়ির বেড়ে ফট্-ফট্ আওয়াজ তুলে বিরজা চলে গেল। দুপুরের পর কয়েক ঘণ্টা ছুটি নিতে হলে কাজের আর তার অন্ত নেই।

মাসীমা চলে গেলেও চোখের উপর তাঁকে স্পষ্ট দেখতে লাগল যতীন। নিজেও সে জানেনা কেন যে মাসীমার সব কথা সে মুখ বুঁজে শুনে যায়—মার বেলায় ত তা নয়। মার সঙ্গে যতীন নিজের এক কণা মিল খুঁজে পায়না—তাই ছুটিছাটায় বাড়ি যাবার নামও সে মুখে আনেনা। তবু যেতে হয়—যেতে হয় মাসীমা পীড়াপীড়ি করেন বলে! তা-ও সাত দিনের বেশি কিছুতেই সেখানে থাকা যায়না—ক্যাম্বিশের ছোট ব্যাগটা বগলদাবা করে ষ্টেশন থেকে হাসতে হাসতে একদিন এ-বাসায় এসে ঢুকতে হয়। হঠাৎ যতীনকে দেখে মাসীমা হয়ত চমকে ওঠেন: "কি রে?"—ছোট্ট খুপরির চাবির জন্মে মাসীমার কাছে হাত পেতে যতীন বলে: "মিতু-টার কথা বড্ড মনে পড়ছিল, তাই চলে এলাম!" মাসীমা হাসতে থাকেন তবু খানিকটা আশঙ্কা লেগে থাকে তাঁর চোখে: "তোর মা-বাবা কি ভাববেন, বলত!" কি আর ভাববেন? হু'দিন পর বাবার চিঠিতে মাসীমা শুনতে পান, উপায় নেই, ছেলেটাকে তোমায়ই দিয়ে দিলাম। যতীন নিশ্চিন্ত হয়ে যায়!

আলপাকার একটা ফ্রক্ গায়ে মিতু এসে দরজায় উঁকি দিল। সেই অদ্ভুত ফ্রকটা—মাসীমার হাতে তৈরী—দোলাই আর সেমিজে মিশিয়ে তৈরী। প্রথম যেদিন দেখেছিল যতীন হাসতে হাসতে পেটে তার খিল ধরে যাবার জোগার। মাসীমা ধমকে উঠেছিলেন: "এতো কি হাসির আছে তোমার শুনি? ওঁর আলপাকার পোষাকী কোটটা কেটে তৈরী হয়েছে, গায়ে লাগেনা?" যতীন থামেনি: "ব্যাটাছেলেকে আপনি সেমিজ তৈরী করে দেবেন?"—"ও আমার মেয়ে—" গলার স্বরটা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল মাসীমার আর কেমন যেন অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে রইলেন তিনি। যতীন থেমে

গেল, হাসিটা মিলিয়ে গেল হঠাৎ। তাহলেও মিতু যখন মেয়ে নয় আর ফ্রকটাও দেখতে অদ্ভুত—মিতুর গায়ে ওটা দেখলেই যতীনের পেটে হাসি জমতে সুরু করে।

"মিতুনি—এসো—" হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিল যতীন।

মিতু তার আগেই এক-পা' দু-পা' এগোচ্ছিল, ইসারা পেয়ে দৌড়ে এসে যতীনের হাত জড়িয়ে ধরল।

"তুমি পড়তে যাবেনা আজ ?" মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে মিতু যতীনের মুখের দিকে তাকায়।

"উহুঁ"—যতীন মিতুকে তুলে চৌকির উপর বসিয়ে দেয়।

"যাবে। ঐ ত বই পড়ছ !"

"ব্রেমনুটিস্ ক্যামেনেস্ দিমারিস্ ডিসামিস্—" সং-এর মতো মুখ নাড়তে সুরু করে যতীন।

মজা পেয়ে মিতুও জিবের জল জড়িয়ে কতগুলো শব্দ উচ্চারণ করে যায়।

"সর্ব্বনাশ—সরস্বতীকে নিন্দে করছ তুমি মিতুনি—তোমার বিদ্যে হবে না !"

খানিকটা ঘাবড়ে যায় মিতু। তারপর চারদিকে তাকিয়ে বলে : "সরস্বতী কোথায় ?"

"বেড়ার ফাঁকে কান পেতে আছে।"

"কই ?" মিতু বেড়ার দিকে তাকায়, তারপর বেড়ার গায়ে ঝোলান পরিব্রাজক বিবেকানন্দের একটি ছবির দিকে আঙুল তুলে ধরে : "ও কে ?"

"সরস্বতীর ছেলে !"

বিবেকানন্দের এ পরিচয়ে যেন যতীন নিজেই খুসী হয়ে ওঠে। অনেক চেষ্টায় ছবিটি যোগাড় হয়েছে—ছবিটি যোগাড়ের কি চেষ্টাই না তার ছিল কিন্তু কেন যে ওটা তার চাই তা যেন ঠিক সে জানতনা। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীর কাছেও চাওয়ার কোনো স্পষ্ট কারণ সে বলতে পারেনি। আর এখন কি অদ্ভুত ভাবে কারণ আবিষ্কার করে ফেলল সে! সরস্বতীর ছেলে! তা নয়ত কি? বিদেশে গিয়ে ওম্নি বক্তৃতা আর কে দিতে পারে?

"তোমার পাগড়ি কই?" ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকেই বলে মিতু।

"আমার পাগড়ি?"

"ঐ যে পরেছিলে একদিন—গোলাপী পাগড়ি!"

"ও"—যতীনের মনে পড়ে। 'দরবার-ডে'তে গত বছর কলেজের ছেলেদের পাগড়ি পরতে দেওয়া হয়েছিল—মনে পড়তেই হেসে ওঠে যতীন: "ওটা সরস্বতীর ছেলের পাগড়ি নয়, আর্দ্দালির পাগড়ি!"

"আর্দ্দালির পাগড়ি?" কথাটা আর শুনেছে কি না মনে করতে সুরু করে মিতু: "আর্দ্দালির পাগড়ি কোথায় পেলে?"

"সায়েবরা আর্দ্দালিকে পাগড়ি পরতে দেয়!"

"ওকেও দিয়েছে?" আবারও ছবিটির দিকে আঙুল তোলে মিতু।

"সায়েবের গালে চড় বসিয়ে দিয়েছেন উনি!"

মিতু হাতটা গুটিয়ে ফেলে জড়সড় হয়ে যায় তারপর ভয়ে ভয়ে বলে: "তোমায় মারেনি?"

"আমায় কেন মারবে?" মিতুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে যতীন দোলাতে সুরু করে: "মিতুনি তুমি কিচ্ছু জানোনা—মিতু মিতু মিতুনি

—রাঙা মাথায় চিরুণি—কিচ্ছু তুমি জানোনি—” ছড়ার সুর তোলে সে।

বন্দীদশায় ছটফট্ করতে থাকে মিতু—গলার সুর চড়িয়ে দিয়ে বলে ঃ “তিতুকে মাষ্টার মেরেছে।”

“তাই না কি ?”

“মাকে বলে দিয়েছে তিতু !” মিতুর চোখ দু’টো গোল হয়ে যায়।

“ইস্কুলে গেলে তোমাকেও মারবে !”

“আমি মাষ্টারকে মারব।” থুতনিটা বুকে ঠেকিয়ে ঘাড় ফুলিয়ে তোলে মিতু।

“ছিঃ—” যতীন জিভ কাটে।

“তিতুকে মেরেছে কেন ?”

“তিতু যে পড়েনি !”

“তুমি ত পড়তে যাবেনা আজ !”

“আমাকেও কাল মারবে মাষ্টার।”

“কি করবে তা’লে ?”

“কাঁদব।”

“ওকে বলে দেবেনা মাষ্টারকে মারতে ?” মিতু ছবিটির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়।

“উনি ত নেই—মরে গেছেন।”

“ডেকে নিয়ে আসবে !”

যতীন চুপ করে যায়। মরলে ডেকে নিয়ে আসা যায় সে-ও ভাবত একসময় ছোটবেলায়। তার দিদি যেবার মারা যায়—তার খেলার সাথী ওই এক দিদি—যতীন ঠিক মিতুর মতোই ভাবত। তাদের বাড়ির পশ্চিম দিকের মস্ত আম বাগানের এক কোণায় দিদির

শ্মশান ছিল—এখন ওটা ভাঙা বেড়ায় ঘেরা একটা উঁচু শণবনের মতো দেখায়—দুপুর বেলা কাউকে না বলে চুপিচুপি বাগানে চলে যেত যতীন। সেই পাখীটার কাঁপা-কাঁপা চড়া সুর, যা শুনলে দিদি মুখ ভার করে বলত: "জানিস তিনু, ওটা কাঁদে"—যতীনের হাতের মুঠো থেকে তখন ঢিলটা গড়িয়ে পড়ে যেত—ছুঁড়বে বলে যে ঢিল কুড়িয়ে নিয়েছিল সে! সেই পাখীটার কাঁপা কাঁপা সুর শুনতে পেত যতীন, মাথা বোঝাই হতে সুরু করত সে-সুরে—মাথার ভেতর কি যেন ঝিমঝিম করে বাজতে থাকত। তারপর হঠাৎ, কি জানি কেন ছোট অস্পষ্ট একটু আওয়াজ করে যতীন ডেকে উঠত: "দিদি—।" এখন আর স্পষ্ট মনে নেই দিদিকে। ছোট যে বোনটা হয়েছে, মা বলেন দিদিই না কি এসেছে আবার! পাগল, ও কি দিদির মতো না কি! চোখ নাক মুখ এক রকম হলেই ও দিদি হয়ে যাবে? তবে কেউ কেউ ফিরে আসে—সংস্কৃত পুঁথিপত্তরে না কি লেখা আছে—অনেকে বলেও। যতীন নিজেই ত না কি মার কোন খুড়তুতো শ্বশুর ছিলেন—বলেন মা। কিন্তু যতীনের ত একটুও মনে পড়েনা মার খুড়তুতো শ্বশুর হিসেবে সে কি করত, কি ভাবত, কোন্ কোন্ কথা বলত। আগের জন্মের একটি কথাও মনে থাকবে না, সে কি কথা! যতীন মনে করতে অনেক চেষ্টা করেছে—ছাইভস্ম কিছুই মনে পড়েনি। মাসীমাকে জিজ্ঞেস করেছে সে শেষটায়। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট ভেঙ্গে বলেছেন মাসীমা, "কি জানি, লোকে ত বলে!" তারপরই নিজেকে শুধরে নিয়েছেন: "কতো অদ্ভুত কথাই ত বলে মানুষ! জানিস্ না, আঁতুড় ঘরের ছেলেদের গলায় ফাঁসীর দাগ খুঁজে বেড়াত মেয়েরা ক্ষুদিরামের ফাঁসীর পর?" যতীন জানতনা, মাসীমার কথায় নিবিড় হয়ে আসত তার গলার স্বর: "খুঁজে পেয়েছে কেউ

ফাঁসীর দাগ?" "—কারো কারো থাকে ওদাগ—নাড়ীর দাগ—মিতু-টারইত ছিল!" —যতীনের কৌতূহলকে আর প্রশ্রয় দেননি মাসীমা। কিন্তু যতীন নিজের মনে-মনে ভাবতে ছাড়েনি ক্ষুদিরামকে, একটি ক্ষুদিরাম মরে গিয়ে হয়ত অনেক ক্ষুদিরাম জন্মেছে আবার—নইলে কারো কারো গলায় ওদাগ থাকবে কেন? মিতুরও ওদাগ ছিল? তা-ই! হঠাৎ-হঠাৎ অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে মিতু—যতীন বুঝ্তে পারেনা কি করে মিতুর মনে আসে ওসব কথা।

যতীন মিতুর দিকে তাকায়—তখনও মিতু ছবিটার দিকেই তাকিয়ে আছে।

"মিতুনি—"

মনোযোগ ভেঙে যায় বলে একটু চমকে ওঠে মিতু।

"কি করছিলে—" মিতুর পিঠে হাত বুলাতে সুরু করে যতীন।

"ওকে ডাকছিলাম—কথা বল্‌ছিল ও!"

"যাঃ—"

"হেঁ—"

"কি বল্‌ছিল? তোমাকে মারবে বল্‌ছিল ত?"

"তোমাকে—মারবে—মারবে—" মিতু সুর ধরে দেয়।

"আমাকে মারবে কেন?"

একটু থেমে গিয়ে মিতু বলে ওঠে: "ওর মতো পাগড়ি পরেছিলে কেন?" মিতু হাস্‌তে থাকে—গালে টোল খায়—টুস্‌টুসে হয় ঠোঁটদুটো—দাঁতের অঙ্কুরগুলো চিকিয়ে ওঠে।

কিন্তু যতীন চোখ ফিরিয়ে নিয়ে যায়, ওর দিকে তাকায়না। ওর কথাগুলো যেন একটা অস্বস্তির মতো মাথায় ঘোরাফেরা করতে সুরু করে। ওর মতো পাগড়ি পরেছিলাম কেন? কেন—কেন?—

হাতুড়ির মতো পিটিয়ে চলে কথাটা—ছোট হাতুড়ির মতো টুং-টাং শব্দ তুলে দেয় মাথায়। বইগুলো গুছিয়ে রাখতে সুরু করে যতীন। আর পড়া হবেনা। কলেজে যেতে হবেনা যখন, না পড়লেও ক্ষতি নেই।

২

গাড়ি এসে উকিল-পাড়ায় পৌছুঁবার মুখে বিরজা ভাবছিল শৈলর বাড়িতেই প্রথম যাবে। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে প্রকাণ্ড ঘোমটার আড়ালেও সে শৈলর বাসায় ঢোকবার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিতে পারলনা। কতো লোক জড় হয়েছে সেখানে কে বলবে? তাছাড়া দারোগার স্ত্রী বলে তার উপর কৌতূহলও মানুষের কম থাকবে না। সেরেস্তাদার কর্ত্তামশাই-এর মতো কথা অবশ্যি কেউ বলবেনা কিন্তু দারোগা-পুলিশ যে আজকাল নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে কেউ-কেউ তেমন টিপ্পনি ত কাটতে পারে। শুনতে বিরজার ভালো লাগবেনা—কি কাজ ওখানে গিয়ে? তার চাইতে সোনার মা-ই ভালো। টিপ্পনিতে ওর জুড়ি কেউ নেই, তাহলেও সে-টিপ্পনিতে মন হাল্কা হয়ে যায়। বিরজা সোনার মার ঘরের বারান্দায় এসে ঘোমটা তুললো। দাঁড়ে-বসা ময়নাটা মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল: 'বীরু বাবু—বীরু বাবু—'

"চেঁচাচ্ছিস কেন মুখপোড়া—বাবুকে বসতে বল।" ঘরের ভেতরে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল সোনার মা।

"বাবু তোমার ঘাড়ে এসে বস্‌বে মুখপুড়ী—"

"তবু ভালো, কোলে নয়!" সোনার মা নাকে-মুখে হাসি ছিটোতে লাগল।

ওর সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব নয়, বিরজা জানে। পেছনে পড়ে যেতেই হবে একসময়। হাসিটা অনেক কষ্টে হজম করে তাই বিরজা বললে: "তুই হাসছিস কি করে লো আজ?"

"তেম্নি কাল ত কেঁদেওছি!" সোনার মার পানের রঙমাখা ঠোঁটগুলো কুঁচকে খানিকটা কালো দেখাতে লাগল।

"কখন শুনতে পেলি?"

"আধ ঘণ্টার মধ্যেই—" নীচের ঠোঁটটা বীভৎসভাবে উল্টে দিল সোনার মা: "হৈ-হৈ পড়ে গেল সমস্ত পাড়ায়!"

"পড়বেনা? কি সাংঘাতিক ভাবতে পারিস?"

"এ জংলী জায়গায় সবই ভাবতে পারি। চুরি-ডাকাতি খুনোখুনি ত এখানকার জলভাত!"

বিরজা বলতে পারত, 'সত্যি তা-ই'—কিন্তু কথাটা শুনে মনে যেন তার অরুচি ধরে গেল। সোনার মার কথায় যেমন হেলাফেলা থাকে এতে যেন তা নেই।

সোনার মা বিরজার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে পানের বাঁটা নিয়ে বসে গেল: "খুনোখুনিতে তোর মুখ শুকিয়ে ওঠে, দারোগা! পান খেয়ে তাজা করে নে মুখটা!"

বিরজা হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু সেই ভয়টা গিলতে সুরু করেছে যেন তার সমস্ত বুক—সন্ধ্যাবেলাকার সেই ভয়টা। সোনার মা পান খেতে দিচ্ছে কেন তাকে? মোহিনী কি এখন থানায় আছে, না কি কোর্টে—না কি আর কোথাও—রাস্তায়?—রেবতীবাবুর মতো? সোনার মা কি জানে সে-কথা? না কি না-জেনেও যে একরকম জানা

যায় তারি জন্যে সোনার মা বিরজাকে খাওয়াবে বলে পান সাজতে বসেছে ? তখনও পান সাজা হয়নি, বিরজা হাত বাড়িয়ে দিল : "দে—"

"স্বদেশী ডাকাত—" সোনার মা যেন চোখে-মুখে বোকা বনে গেল : "ওরা বলছে এ কাজ না কি স্বদেশী ডাকাতের। সে আবার কেমন ? তোরা ত দারোগা-পুলিশের লোক, বলতে পারিস ?"

"কি জানি !" বিরজা হাতটা গুটিয়ে নিল।

"না জেনে দারোগাগিরি করা চলবে ?"

দারোগাগিরি করা চলবেনা বিরজা জানে। কিন্তু মোহিনী কিছুতেই বুঝতে চায়না। কাল রাত্তিরেও বলেছিল বিরজা। কথাটা বলবার মতো সময় অবশ্যি ছিলনা—ভীষণ চুপচাপ ছিল মোহিনী। কিন্তু বিরজা একটা সুযোগ করে ত একসময় বলেছিল : "এ-চাকরি তুমি করতে পারবেনা—"। "ছেলেমানুষ—" ওই ছোট্ট একটু কথাই ছিল মোহিনীর উত্তর। হয়ত ছেলেমানুষের মতোই তখন অসহায় দেখাচ্ছিল বিরজার মুখ। স্বামীর কাছে স্ত্রী ছেলেমানুষ ছাড়া আর কি ?

সোনার মা লক্ষ্য করছিল বিরজা কেমন যেন থিঁতিয়ে যাচ্ছে। দূর-দূর-দূর—এসব বিদ্‌ঘুটে কথা বলে একটা মানুষকে খামকা কালো করে তোলা কেন ? বাঁটাশুদ্ধ পানগুলো বিরজার কোলের উপর রেখে সোনার মা বলে উঠ্‌লো : "নাও নাও। বাড়িঘরদোরেই ত পয়সা উড়োবে, দারোগাত আর পান কিনবেনা !"

বিরজার চোখে-মুখে একটু রোদের আভা চিকিয়ে গেল : "সত্যি পান খাওয়া কমে গেছে—"

"টাকা জমানোর বাই-তে ধরলে অনেক সুখই কম্‌বে লো—যোগিনী হতে হবে !"

"মাথা গুঁজবার হয়েছে ত ক'টা ডেরা-ঘর, তাতেই তোর চোখ টাটাল ?" বিরজা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এলো।

"পানওয়ালির কিসে না চোখ টাটায় বল্ !" খিল-খিল করে হেসে উঠল সোনার মা।

"কথার ছিরি ছাখো—"

"মিছে কথা কি ? উকিল-মোক্তার যে নই তা-ত সত্যি।"

বিরজা সোনার মার মুখের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে রইল। নিশ্চয় কিছু হয়েছে—মোক্তার-গিন্নীরা ত ঝগড়াটে নয়—উকিল-গিন্নীরা একটু দেমাকী, অন্তত শৈলর মতো মিশুক নয়। ওরাই কি কিছু বলেছে সোনার মাকে ? হয়ত বলেছে। নইলে আজ সোনার মা চুপচাপ নিজের ঘরে বসে আছে কেন ? সবাই ত নিশ্চয়ই শৈলদের বাড়ি গিয়ে ভীড় করেছে—সোনার মা কেন সেখানে নেই ? ওকি এম্নি একা চুপচাপ ঘরে বসে থাকবার মানুষ ?

ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে সোনার মা তক্ষুণি যেন কথা বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল : "আচ্ছা দারোগা—মিতুটাকেও সঙ্গে নিয়ে এলিনে ? কদ্দিন ওদের দেখিনি !"

"ভাবলাম কান্নাকাটি দেখ্‌লে ও ভয় পেয়ে যাবে !"

"এপাড়ায় কান্নার ধুম পড়বে তোকে কে বল্‌লে ?"

"শৈলদের বাড়িতে ?"

"শৈল ত কালই কদমতলায় চলে গেছে—ওর বর কাল চেঁচিয়ে সমস্ত পাড়াটা মাথায় করে তুলল ! যাবে এবার স্বদেশীরা, নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি লাগিয়েছে—হ্যানো ত্যানো আরও কত কি বলে চেঁচাতে লাগ্‌ল !"

"স্বদেশী ত উনি নিজেও !"

"তাইত লোক জড় করে বক্তৃতা দিলেন !"

"কথকঠাকুরের মতো ?"

"বক্তৃতা বল্‌তে কি কথকঠাকুরের নাকি কান্না বোঝায় লো বাম্‌নি ? তুই একদম গেঁয়ো ভূত !" সোনার মা একটা পান তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলে তারপর খানিকটা দোক্তাপাতা হাতের তেলোয় রেখে ধুলোবালি মুছতে সুরু করলে : "যে বক্তৃতা শুনে আমরা সেবারে হাতের রেশমি চুড়ি ভেঙে ফেললাম দলে-দলে কালীবাড়ির মণ্ডপে গিয়ে তাকে বলে বক্তৃতা ! তখন কোথায় ছিল তোর দারোগা, কোথায় বা তুই !"

"বাবা, সে মারপিটের সময় এখানে ছিলামনা যে ভাগ্যি আমার !" খুসীতেই যেন বিরজা খানিকটা শিউরে উঠ্‌ল।

"কিন্তু এখন ? এখন বুঝি সময়টা খুব ভালো ভাবছিস্‌ তুই ?"

"স্বদেশীর হৈ-হাঙ্গামা ত নেই এখন !"

"বিপিন কামারের ঘরে ডাকাতি হল—একতাল সোনা নিয়ে গেল কারা ? স্বদেশী ডাকাত ! কে নাকি ওদের ধরা পড়ে বলে দিয়েছে !"

বিরজা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌ল : "কি জানি বাবু—ও খবর শুনে কাজ নেই আমার ! এতো খবরই যদি রাখিস তোকে যে পুলিশের লোকেরা কেন নিয়ে যায়না তাই ভাবি !" ফিক্‌ করে হেসে ফেল্‌ল বিরজা।

"তোর ঘরের মানুষকে বলে দিলেই পারিস্‌ !" চাপা হাসিতে ঠোঁটের ভাঁজে-ভাঁজে পানের রস উঁকি দিল সোনার মার।

"বলিস্‌ত বল্‌ব।" বিরজা এগোলো।

কিন্তু মোড় ফিরে গেল সোনার মা : "তারপর রেবতীর মতো দশা হোক আর কি আমার !"

পিক ফেলার এখুনি দরকার ছিলনা, তবু পিকের ছুতোয় বিরজার

ঘরের বাইরে যাবার দরকার হ'ল। কর্ত্তামশাই তাহলে সত্যি কথাই বলেছেন, রেবতীবাবুকে সবাই জানে—ফিরে আসতে আসতে ভাবছিল বিরজা। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠতে চাচ্ছিল, বিরজা প্রাণপনে বাধা দিলে ঃ "রেবতীবাবু পুলিশের দলে ছিল নাকি ?"—ফিরে এসে ঠোঁট থেকে হেলাফেলায় কথাটা ছেড়ে দিতে চেষ্টা করল সে।

"পুলিশের লোক বলে পুলিশের তকমা-আঁটা নয়—স্বদেশীদের খবর নিয়ে পুলিশদের দিত না কি রেবতী!"

"সে কি আর পুলিশের দোষ!" আশ্চর্য্য, বিরজা সোনার মার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিলনা।

"আমি কি বললাম তোকে ওটা পুলিশের দোষ?" ছোট ছোট হাসির টুকরোয় সোনার মা বিরজাকে বিঁধতে চাইল।

সত্যি, সোনার মা ত বলেনি পুলিশেরই দোষ। তাহলে ও-কথা কেন বলতে গেল বিরজা ? কেন সে নিজের মনেরই একটা সন্দেহের উত্তর দিতে গেল সোনার মার কথার পিঠে ? কেন ? সন্দেহটা গাঢ় হয়ে উঠছে মনে—তাই। নিজের অজান্তেই একটা অস্বস্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে তার মন—তাই। সে যা-ই হোক, সন্দেহ আর অস্বস্তি ত আসছে তার মনে! সব সময়ই মনকে অপরাধ দেওয়া যায়না। বিরজা উঠে দাঁড়াল।

সোনার মা কথা খুঁজে পেলনা। ঘর থেকে যখন বেরিয়ে গেল বিরজা, একটা টুঁ শব্দ করেও যেন তাকে বাধা দিতে পারলনা। সে ঠায় বসে রইল। ময়নাটা চেঁচামেচি সুরু করেছে। মাত্র তখন যেন সোনার মা বুঝতে পারল, বিরজা চলে যাচ্ছে। বুঝতে পারল, রাগ করে চলে গেল বিরজা।

মানুষটা বিরজা ওম্নি—একটা চেরা পানে চূণ ঘসতে ঘসতে সোনার

মা মনের উপর কথার সারি সাজাতে লাগল—হঠাৎ রেগে যায়, খোলামেলা গেঁয়ো মন বলেই হয়ত ; বামুনের মেয়ে, হঠাৎ রাগ করাটা ওদের অভ্যেস ! তারপর একটা নিশ্বাসের সঙ্গেই যেন মনে পড়ে গেল, কার জন্য আর পান সাজছে সে এখন !

৩

বাসায় ফিরে এসেও বিরজা হাল্কা আবহাওয়া খুঁজে পেলনা। তিতু-মিতুকে নিয়ে যতীন বেরিয়ে গেছে। কোলের উপর একটা বই নিয়ে বারান্দায় হাবুল হাঁ করে বসে আছে। ওর পাশে এতক্ষণ কর্তামশাইর মেয়ে নিরুপমা দাঁড়িয়েছিল। বিরজাকে দেখেই যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল নিরুপমা।

"চলে যাচ্ছি বৌদি—অনেকক্ষণ এসেছিলাম—"

একটা কুয়াশা-হাসি ছড়িয়ে গেল বিরজার মুখে, তা-ও খানিক-ক্ষণের জন্যে। তক্ষুণি আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে ঘরে ঢুকে গেল।

ঘরে ঢুকেও বিরজা শুনতে পেল নিরুপমা হাবুলের কাছে বিদায় নিচ্ছে : "যাচ্ছি হাবুল—বসে বসে পড় এবার !" আঁচলটা টেনে টুনে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে নিরুপমা হাঁটতে সুরু করল।

বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে লক্ষ্য করছিল বিরজা সত্যি ও যাচ্ছে কি না, না কি ফাজিল একটা কথা মুখে নিয়ে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু না, নিরুপমা চলেই গেল। এসেছিল কেন কে বলবে ? আরো দু'চারদিন এম্নি হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে। প্রথম দিন দেখে ত

অবাকই হয়ে গিয়েছিল বিরজা—আঠারো উনিশ বছরের মেয়ের বিয়ে হয়নি! কর্ত্তামশাই পরের খুঁত খুঁচিয়ে বেড়ান, নিজের বেলায় একি! আর মেয়েটাও যে কি রকম, সরম-ভরম নেই—নিজেকে জাহির করে বেড়ানো শুধু। ভাল লাগেনি বিরজার, এখনও ভাল লাগেনা। ভাল লাগেনা কি, মনে দস্তুরমত একটা যন্ত্রণা হয়।

ওরকম একটা যন্ত্রণা নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বিরজা: "যতীন কোথায় গেছে রে?"

"বড় মাঠে ওদের নিয়ে গেছেন খেলা দেখাতে—" বই থেকে মুখ তুললনা হবুল।

"তোকে রেখে গেছে বসে বসে গল্প করবার জন্যে, না?"

হবুল মুখ তুলে তাকাল।

"কখন এসেছিল ও, শুনি?" ভুরু কুঁচকে উঠল বিরজার।

"এইত খানিকক্ষণ আগে। এসে ত তোমায়ই খুঁজছিলেন!"

চোখ নামিয়ে নিজেকে থামিয়ে দিল বিরজা। আবার গিয়ে ঘরে ঢুকল। জামা-সেমিজ-সায়ার বোঝা সরিয়ে আটপৌরে শাড়ীটা পরতে হবে এখন। লণ্ঠন দু'টোতে তেল ভরে বারান্দায় সাজিয়ে রেখে গেছে যতীন, ও হাঙ্গামা আর তার নেই, তার শুধু রান্নার কাজ। মনটাকে কাজের তালিকার পেছনে ছুটিয়ে দিয়েও বিরজা নিজেকে যেন গুছিয়ে নিতে পারছিলনা। ভেতর থেকে একটা রাগ গর্জ্জে উঠছিল। রাগটা যে কেন আর কার উপর তা সে ঠিক বলতে পারবেনা। সোনার মার উপর নয়, নিরুপমার উপরই কি? তা-ও হয়ত নয়। মোহিনী! ঠিক তা-ই! রাগটা যেন মোহিনীর দিকেই থাবার নখ বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—মোহিনী, মোহিনী!

৪

মোহিনীকে নিরিবিলিতে পাওয়া গেল পরদিন দুপুরবেলা। সেদিনও অনেক রাত্রিতে ফিরে এসেছিল সে, রাগ নিয়ে তার অপেক্ষায় বসে থাকার চেয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে থাকাই বিরজা ভালো মনে করল। রাগের মাথায় রাগই চড়তে থাকবে, শেষটায় চোখ ফেটে জল গড়াতে সুরু করবে, মোহিনীর দোষত্রুটিগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলা যাবেনা। রাগটা তাই থিতানো দরকার আর তার জন্যে খানিকটা সময়ও চাই। বিরজা ভেবেছিল মোহিনী যখন বাইরে বেরোবে তখনই সময়। কিন্তু মোহিনীর আজ অপিসের তাড়া নেই—বিছানায়ই সাতটা বাজিয়ে দিলে। যতীন বাজার এনে হাজির করল, চুপচাপ বিরজা একের পর এক কাজ করে চল্‌ল। বাজার নিয়েও টুঁ শব্দটি বেরোলনা তার মুখ থেকে। আর-আর দিন বাজারটা মাসীমার সামনে রাখা যতীনের পক্ষে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। মাছ কিছুতেই পছন্দ হবেনা মাসীমার। গাঁয়ের মতো রকম-রকম মাছ পাওয়া যায় নাকি সহরের বাজারে? মাসীমা বুঝতে চাইবেন না, একটা দিনও মাছে তাঁর মন উঠবেনা! "জিনিষপত্র যদি সব ভালোই না পাওয়া গেল তবে কিসের তোর সহর রে?'—বলবেন মাসীমা। যতীন আর কি বলবে—তবে জেলেদের কাছে সে মাসীমার এ-কথাটাই মাঝে-মাঝে উগরে দিয়ে আসে। আজ অবাক হয়ে খানিকটা ভয়ই যেন পেয়ে গেল সে, বাজারের পুটলি-টা মাসীমা চুপচাপ তার হাত থেকে তুলে নিলেন, খুলে দেখলেন, একটি কথা বল্‌লেন না! যতীন জড়সড় হয়ে সরে এলো। কাল বিকেল থেকেই সে মাসীমাকে ভালো বুঝছেনা—

ক'টা দিন খুব সাবধানে তাকে চলতে হবে—বিগড়ানো মেজাজ না তারই দোষে হঠাৎ একসময় ক্ষেপে ওঠে! মার চেয়ে মাসীমা তিনগুণ বেশি রাগী। সেদিক থেকে মাকে ভালোই বলতে হয়। যতীন তার ঘরে ঢুকে পড়ার বই খুলল। স্নানের আগে একটা ঘণ্টা হাবুল-তিতু-মিতুকে নিয়ে সে আড্ডা জমায়, আজ আর আড্ডা জমাবার সাহস হলনা তার।

অগত্যা হাবুল-তিতুকে বারান্দায় বসেই বই ছেড়ে ছবি আঁকায় মন দিতে হচ্ছিল। আশ্চর্য্য, হাবুলেরও আজ পড়ায় মন নেই। বই খাতা-পত্র খোলা আছে কিন্তু ওরা যেন সব বেওয়ারিশ। তিতুর পাঠশালায় যে মাত্র একজন মাষ্টার আর তাঁর মুখের চেহারাটা যে হাবুল শ্লেটের গায়ে যা এঁকে চলেছে ঠিক তা-ই, এই তিনটি ব্যক্তির এখন এই একমাত্র মনোযোগের বিষয়। তিতু অবশ্যি ব্যাপারটায় খুব খুসী হতে পারেনি কিন্তু দাদার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনে তার খুসী-অখুসী হওয়া কোনো প্রশ্নই নয়। মাষ্টার মশাই নিজে অখুসী হলেও ত দাদার কিছু আস্বে যাবে না, দাদা বড় ইস্কুলে পড়ে—বড় মাষ্টার সেখানে, তাঁরা জুতো পরেন, কোট গায়ে দেন—বাবু-বাবু দেখতে! আর তার মাষ্টার মশাই-এর হাতা-কাটা একটা জামা আর ছেঁড়া চটি! তবে মাষ্টার মশাই বড্ড মারেন, তাই দাদা যে ছবিটা আঁকছে তাতে তিতুর তেমন ঘোরতর আপত্তি নেই।

শ্লেটের উপর মাথা গুঁজে ছবিটাকে যেন গিল্‌তে বসেছিল মিতু। একটা খণ্ড-ততে টিকি এঁকে মাথাটা শেষ করল হাবুল—মিতু খুসীতে চেঁচিয়ে উঠল: "নাকের উপর তালগাছ দাও, তালগাছ—"

মুখ আঁকতে গেলেই নাকটা বাড়িয়ে দেওয়া হাবুলের অভ্যাস; বাবার নাকের ছায়াটাই হয়ত তার মনে গেঁথে গেছে—নাকটা বাড়িয়ে

দিলে নাকের উপর অনেকটা খালি জায়গা পড়ে থাকে —এত জায়গা যে ওখানে দিব্যি একটা গাছ উঠতে পারে। তালগাছের চেয়ে সোজা গাছ আর কি আছে? লম্বা করে একটা এ-কার এঁকে তার মাথায় কতগুলো পূরণচিহ্ন বসিয়ে দাও। ব্যস্ হয়ে গেল। নাকের ডগায় তালগাছ-ছাড়া কোনো মুখ হাবুলের চিত্রশালায় ঠাঁই পায়না। মিতুর আব্দারে নিজের মৌলিক প্রতিভা স্মরণ করল হাবুল, তিতুকে জিজ্ঞেস করল: "কি রে, দেব তালগাছ?"

মিতু শ্লেটের উপর হাবুলের হাত টেনে নিয়ে এলো, বল্লে: "দাও—মস্ত বড় তালগাছ।"

তিতু এতক্ষণ চুপচাপ থেকে বল্‌ল: "ওটা মাষ্টার মশাই হয়নি।"

"হয়নি?" বোঝা গেলনা হাবুল তারপর কি করবে।

"হয়েছে—দাও—" সুর ধরল মিতু।

"হয়েছে! তোর মাথা হয়েছে—" তিতু ধম্‌কে দিল মিতুকে।

"দাঁড়া—তাহলে আবার আঁকছি—" হাবুল ছবিটা মুছতে গেল।

দাঁতে ঠোঁট চেপে মিতু দাঁড়িয়ে গেল—তারপর শ্লেটটার উপর থুতু ছিটিয়ে রান্নাঘরে দৌড়ে পালাল।

যতীন ওদের লক্ষ্য করছিল—মিতুকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে সে শিউরে উঠ্‌ল। আর রক্ষা নেই! এক ঝাঁক বকুনি কখন এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তারই অপেক্ষা করতে লাগল সে। আর তাই ভট্টিকাব্যের কঠোর ব্যাকরণে মনটাকে শক্ত করে চেপে ধরতে চাইল। কাপড়ের খুঁটে আধা ঘোমটায় দু'কান ঢাকা—পড়ার চাপা নাকী সুরে দুল্‌তে সুরু করল যতীনের শরীর। ঝাপ্‌টাটা শরীরে আর লাগ্‌বে না।

কিন্তু কোথায়? মাসীমার একটা নিশ্বাসও শোনা গেলনা। খানিকক্ষণ পর মিতুকে দেখা গেল রান্নাঘরের দরজায় এসে বীরপুরুষের ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তার পরেই মাসীমা রান্নাঘর থেকে চুপচাপ বেরিয়ে এসে পৈঠায় সাজানো দু'খানা চেলা কাঠ নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। থুতু হজম করে নেওয়া তিতুর সহজ ছিলনা কিন্তু হাবুল তার উপর পাহারা ছিল, কাজেই যুদ্ধটা স্বভাবমতো গড়ে উঠতে পারলনা।

সবটা ব্যাপার কেমন যেন আজ অদ্ভুত লাগছিল যতীনের—যেন অচেনা, অজানা একটা বাসায় সে বসে আছে—এখানকার লোকজনের চালচলন যে কি হবে তার তা জানা নেই। ঠিক দু'বছর আগে কল্‌কাতার মাসীর বাড়িতে গিয়ে প্রথমটায় যা হয়েছিল তার। এ-মাসীমা কলকাতা যাচ্ছেন—কিছুতেই যতীনকে সঙ্গে নেবেন না—বল্‌তে সুরু করলেন, তোর বাবার কাছে বলে আয়। সঙ্গে নিলেন না ত! আচ্ছা দেখা যাক তার কল্‌কাতা যাওয়া হয় কি না! মাসীমাও গিয়ে কল্‌কাতা পৌঁছেছেন, ঠিক তার দু'দিন পরেই যতীন এক গাল পান মুখে নিয়ে চাঁপাতলার নম্বর খুঁজে কলকাতার মাসীর বাড়িতে গিয়ে হাজির! মাসীমা চোখ কপালে তুলে বল্‌লেন: 'কী ডাকাত ছেলেরে তুই!' কলকাতার মাসী হেসে গড়িয়ে পড়লেন: 'ওর রকমটা ছাখো দিদি, পান খেয়ে কেমন মাতব্বর চেহারা করেছে!' মাসীমা ওকথায় কান না দিয়ে এক নিশ্বাসেই বলে চল্‌লেন: 'ফিরে যাবি এলি তুই, পাজী?' কি করে আবার! বাবার বাক্স থেকে টাকা নিয়ে! বাবা মহলে গেছেন, কবে আস্‌বেন কে জানে, আর কে বসে থাকে ওঁর আসার জন্যে। বাবা যদি মাস খানেক না-ই আসেন তাহলে কি যতীনের কলকাতা দেখা হবেনা? আজব সহর কলকাতা—

এক'টা দিন কতো কি আকাশ-পাতাল ভেবেছে যতীন আর এসেও ত দেখতে পেল কি তাক-লাগানো ব্যাপার। কাটা-কাপড়ের মস্ত দোকান মেসোমশায়ের—সব সময় ঠাকুর-ঝি-চাকর মাথায় তুলে রাখছে বাড়ীটাকে—মাসী কথায়-কথায় হেসে কুটি-কুটি হয়ে যান—তাঁর ফুটফুটে দু'টি মেয়ে পুতুলের মতো হাত-পা নাড়ে, পুতুলের মতো তাকায়—গোঁফ চুমরে পানের ডিবি হাতে নিয়ে সকাল আটটায় মেশোমশায় দোকানে বেরিয়ে যান, ফিরে আসেন একটা-দেড়টায়। একটা আলাদা জগৎ! প্রথমটায় যতীন একটু মুষড়েই পড়েছিল—নিজেকে ঠিক-ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলনা ওখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে। পরে মনে-মনে ভেবে নিলে মাসীমা যখন আছেন তার আর অসুবিধে কি? শেষটায় দেখা গেল ঝি-কে সে পূব-বাংলার ভাষা শেখাচ্ছে—ষ্টার থিয়েটারে গিয়ে টিকিট কেটেও নিয়ে আস্ছে মাসীমাদের জন্যে। কল্‌কাতা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছিলনা যতীনের, কলকাতার মাসীরও তাতে আপত্তি ছিলনা কিন্তু মাসীমা ওখানে থাক্‌বেনা সেই হল মুস্কিল। মাসীমার সঙ্গেই ফিরে আস্‌তে হল যতীনকে। ফিরে এলো যতীন চোখ বোঝাই করে, মন ভর্ত্তি করে। প্রথম একটা ধাক্কা লাগলেও অচেনা আবহাওয়া দু'দিনেই যতীনের ধাতস্থ হয়ে যায়।

রান্নাঘরের বারান্দায় আবার একটা ছায়া পড়ল—আবার হয়ত এসে দাঁড়িয়েছেন মাসীমা।

"যতীন—"

মাসীমার ঠাণ্ডা গলায় ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়াল যতীন।

"রামশরণ বাসনগুলো মেজে গেল, জল নিয়ে এলোনা ত এখনো—দ্যাখ্ তো বাবা—"

কাপড়ের খুঁটটা কোমরে জড়িয়ে যতীন বেরিয়ে এলো : "হাজার বাড়িতে ঠিকে নেবে, ব্যাটার কি আক্কেল আছে!" এম্নি মারমুখো হয়ে ছুট্‌ল যতীন যেন সহরের বেহারী ঠিকে-চাকরদের ডেরাগুলো আর সে আস্ত রাখবেনা।

"শোন্—" পেছন থেকে ডাক্‌ল বিরজা।

যতীন থামল, থেমে মাসীমার দিকে তাকাল যখন মুখে আর তখন সেই তেজবিক্রম নেই।

ঠোঁটে একটু হাসির আভাস এনে বিরজা বল্‌লে : "মা-মাসী পেছনে ডাক্‌লে কিছু হয়না। শোন্—ওকে বলে বলে হদ্দ হয়ে গেছি—ন'টার আগে কিছুতেই ও জল পৌঁছুবেনা! তা হলে ও বলুক আমরা অন্য লোক দেখি!"

"এত কাছে দিঘী, জলের জন্যে ওর মুখ চেয়ে বসে থাক্‌ব।" যতীন এগিয়ে এলো : "কলসীটা দিন—জল এনে তারপর ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করব!"

"রাগ তাতিয়ে কাজ নেই তোমার—থাক্। ওকেই খুঁজে আনো"—বিন্দু-বিন্দু হেসে চল্‌ল বিরজা।

খানিকটা জুড়িয়ে গিয়েই যতীনকে বেরিয়ে যেতে হল।

বিরজা ঘরে ফিরে এলো—হাসির আভাসটা মুখে কঠিন হয়ে লেগে আছে। সমস্ত শরীরটাই যেন শক্ত, জমাট করে আজ তুল্‌তে চায় সে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বইয়ে দিতে চায় শরীরের ভেতর। রাগ নয়, বিরক্তি আর অভিমান নয়—সহিষ্ণুতার পরীক্ষা। চলুক না খানিকক্ষণ। তারপর ত সময় আস্‌বেই—দুপুরবেলা। ছেলেরা স্কুলে চলে যাবে, মিতু ঘুমিয়ে পড়বে, স্নান-খাওয়া শেষ হবে মোহিনীর—তারপর। বিরজাও খেয়ে নেবে কিনা ভাব্‌ছে। না খেয়ে থাক্‌লে

ত মেজাজটা তাতিয়ে রাখা হল। মেজাজ গরম রেখে কথা বলতে গেলে মোহিনীর সঙ্গে সে পেরে উঠ্‌বেনা—মোহিনীর মেজাজ ত আর গরম হবেনা—শেষটায় দেখা যাবে বিরজার অভিযোগ-অভিমান সবকিছুই ছেলেমানুষি, পাগ্‌লামি। বিরজা আজ আর সে-সুযোগ দিতে রাজি নয়।

শোবার ঘরের বারান্দায় মিতু চিঁ-চিঁ আওয়াজ করছিল। তিতুর খর্পরে পড়েছে। বিরজা কান দিতে চাইল না। হাবুল ত আছেই—এই দুই দেবতার উপর ঈশ্বর। দুজনেরই বরাতে আজ চোখের জল আছে।

৫

মেজাজটাকে মানিয়ে নিলেও সময়কে কি মানানো চলে! মিতুকে সঙ্গে নিয়ে মোহিনী খেতে বসেছিল—বাবার মতো কাঁটা ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে মাছ তাকে আর কেউ দেয়না, মা-ও না। মোহিনীর সঙ্গে খাওয়ার লোভ মিতুর এমন কিছু নূতন নয় কিন্তু আজ যেন বিরজার চোখে সমস্ত ব্যাপারটা অসহ্য, অস্বাভাবিক ঠেকতে লাগ্‌ল। মনে হ'ল মোহিনীও যেন তার মন থেকে আল্‌গা হয়ে গিয়ে ওখানে ঘাড় গুঁজে থালার সামনে বসে আছে। সময় এসে গেছে—মনে হল বিরজার। মেজাজটাকে আর মানিয়ে রাখা চলেনা।

"একদিন ও-আদর না দেখালেও ছেলে বেঁচে থাক্‌বে—" আগুনের আঁচে যেন রাঙা হয়ে উঠ্‌ল বিরজার মুখ।

"?"—মোহিনী কি করে জান্‌বে কি হয়েছে।

"যোগেশবাবু ছেলেকে মাসীর বাড়িতে পড়তে পাঠিয়েছেন—মাসীর হাটবাজার করতে পাঠান নি!"

এ-কথা শুনে অভ্যাস আছে মোহিনীর—আর কথাটা যে শুভ নয় তা-ও সে জানে। তবে এ ধরণের ঝগড়ার মেঘের দিকে সে হাসিমুখেই তাকায়।

"তিনটে শিশু আর একটা নাবালক ছেলে নিয়ে আমাকেই শুধু চারদিক সাম্‌লে চল্‌তে হ'বে—আর কারো যেন কিছু দেখবার-শুনবার নেই। রোজগার সবাই করে–সবাই সংসার করে। আর ও-রোজগার না-করলেও বা কি—যার উপর সবাই থুথু দেয়।" দুধের বাটিটা মোহিনীর থালার পাশে থপ্ করে রেখে বিরজা বেড়ার একটা খুঁটি ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল।

"তিনপুরুষই থুথু খেয়েছি–ও আর আমার গায়ে লাগেনা!" নিজের মনেই যেন হাস্‌তে লাগ্‌ল মোহিনী।

"কিন্তু আমার গায়ে সে-থুথু লাগবে কেন?" বিরজার গলা একটু-একটু ভারি হয়ে এলো—যুক্তির সঙ্গে আর সে দৌড়ুতে পারছিলনা, বুকে যেন ব্যথার মতো কি একটা টন্‌টন্ করে উঠল।

"আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে—"

"সর কই মা—" মিতু দুধের বাটির উপর ঝুঁকে পড়েও খুসী হতে পারলনা—মুখ তুলে বিরজার দিকে তাকাল: "আরো সর—"

হাতায় তুলে খানিকটা সর কেটে নিয়ে এলো বিরজা, বল্‌তে বল্‌তে এলো: "তাছাড়া আর কি?"

"ভালো ঘরে বিয়ে হলেই ত পারত তোমার—" যেন বরফে তৈরী ঠাণ্ডা গলা মোহিনীর।

নির্দ্দয়! এ-গলাটা শুন্‌লেই বিরজার মনে হয়, কি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর লোকটা! মনে হয়, সত্যি ভালো হত যদি রায়পুরের জমিদার-বাড়ির সম্বন্ধটাই পাকাপাকি হয়ে যেত তার। ওঁদের বংশ ভালো নয়, এঁদের

বংশ ভালো—বাবা বলেছিলেন। ভালো বংশের এই ত পরিচয় দিচ্ছে মোহিনী!

বিরজার মুখও শক্ত হয়ে এলো: "তাতে আমার যা-ই হোক-না-হোক, তুমি হয়ত বাঁচতে—" চোখের উপর তাঁর নিরুপমার মুখটা ভেসে উঠল: "ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসারের তোমার কি দরকার?"

থালার বাকি ভাতটুকু আলগোছে দুধের বাটিতে তুলে নিয়ে থালার উপর হাত ধুয়ে নিল মোহিনী। দুধের ভাত মুখে নেবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে মিতু। প্রায় অধৈর্য্য হয়ে গেছে। আসনপিঁড়ি হয়েও নড়ে-চড়ে উঠছে থেকে-থেকে। মোহিনী লক্ষ্য করছিল। কিন্তু লক্ষ্য করেও সে ব্যস্ত হয়ে উঠলনা। আস্তে আস্তে ভাত মেখে নিয়ে মিতুর মুখে গরস তুলে দিতে লাগ্‌ল। বিরজা একহাতা ভাত এনে দুধের বাটিতে ঢেলে দিতে চাইল, হাতের পিঠের ধাক্কায় মোহিনী ভাত ক'টা সরিয়ে দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলে। দুধের সবটুকু ভাত আর সবটা দুধ মিতুকে খাইয়ে মোহিনী গ্লাসের জলে চুমুক দিয়ে চুপচাপ উঠে গেল। আরেকটা বাটিতে করে বিরজা দুধ নিয়ে আস্‌ছিল, তা আর আনা হলনা।

'ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করবার তোমার কি দরকার?' তারই জবাব দিয়ে গেল মোহিনী। বেশ! বিরজাও এম্নি জবাব দেবে। খাবেনা, কিছুতেই খাবেনা সে। মোহিনী জানবেনা সে খেয়েছে কি না—এইত? জানিয়ে দেবে বিরজা। তা-ও জানিয়ে দেবে। এক্ষুনি যদি সে উঠোনে ভাতের হাঁড়িটা ধুপ করে ফেলে দেয়, তাহলে ত জানবে মোহিনী! আর এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করলনা বিরজা—হাঁড়িটা টেনে এনে উঠোনে ছুঁড়ে দিলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মোহিনী গামছায়

মুখ মুছ্ছিল—দেখতে পেল, ভাতগুলো উঠোনে ছড়িয়ে গেছে। নিরুদ্বেগে সে ঘরে ঢুকে গেল।

থালার উপরই মিতুর মুখ-হাত ধুইয়ে দিল বিরজা। মুখ-হাত ধুইয়ে দিতে গেলে সচরাচর মিতুর যে আপত্তি থাকে তা আর আজ নেই। অনেকদিন দেখেছে মিতু মা যে এম্নি অন্যরকম হয়ে যায়। আগে সে ভয়ে কেঁদে ফেল্‌ত, এখন কাঁদেনা কিন্তু ভয় পায়। দৌড়ে বাবার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করে তার তখন, তিতু থাক্‌লে তার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মা তাকে ছাড়েনা—শক্ত হাতে কোলে তুলে নেয়।

রান্নাঘরের কপাটের শিকল তুলে দিয়ে বিরজা মিতুকে কোলে নিয়ে শোবার ঘরে এলো। ছাড়া পাবার আর উপায় না দেখে আস্তে-আস্তে স্বর তুল্‌ছিল মিতু: "মা, ঘুমোবো—", তোষক-বালিশের স্তূপ থেকে মিতুর বালিশটা পাটি-বিছানো চৌকির উপর বার করে এনে বিরজা মিতুকে চৌকির উপর ছেড়ে দিলে।

"না যদি ঘুমুস—"

বিরজাকে কথা শেষ করতে হলনা, তার আগেই মিতু বালিশে মাথা রেখে গুটিসুটি মেরে গেল।

এতোক্ষণ বিরজা ভেবে পাচ্ছিলনা কি করা যায়। সে যে শুয়ে থাক্‌তে পারে আর ঘুম এলে ঘুমিয়েও থাকতে পারে, কিছুতেই কথাটা তার মনে পড়েনি। মিতুর শুয়ে পড়ার ভঙ্গীতে এখন মনে হল। মোহিনীর সঙ্গে টুঁ-শব্দটিও আর নয়। কাঠের সিন্দুকটার পাশে ওই মেঝেতে—অন্ধকারমতো জায়গাটুকুতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়বে বিরজা। তার আগে চুলগুলো আলগা করা দরকার। বিরজা দুহাত চালিয়ে খোঁপাটা খুলে দিল, পিঠময় ছড়িয়ে গেল চুল। মোহিনী

নিশ্চয়ই ডায়েরীর পাতা থেকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে তার দিকে—দেখতে পাচ্ছে চুলগুলো যে তার পিঠময় ছড়িয়ে গেল। যত্ন করতে হয়নি, এম্নিতেই রাশি-রাশি চুল তার। গাঁয়ের মেয়েদের এম্নি চুলই হয়—বাহারের তেল মাখতে হয়না—দেখুক মোহিনী।

"তুমি খাবে না কেন? ছেলেপুলে নিয়ে তুমি ত ঘরসংসার করছ—" মোহিনীর কথায় বিরজা চমকে উঠলনা—আরো যেন শক্ত, হিম হয়ে গেল। আরো চুপচাপ।

"ঝঞ্ঝাট আমার ভালো লাগেনা—" থুতুর মতো খানিকটা বিরক্তি ছিটিয়ে দিল মোহিনী।

"আমার জন্যেই ঝঞ্ঝাট, না?" বিরজা ফিরে দাঁড়াল: "আমাকে নিয়েইত সব ঝঞ্ঝাট, আমি এখানে আছি, তা-ই!" স্বর উঁচুতে উঠলনা, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগ্‌ল তার।

মোহিনী উঠে দাঁড়াল—খাকিগুলো আর চামড়ার বেল্ট বিছানার উপর টেনে এনে জড় করে তুল্‌ল। বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। ঘরে যখন বিশ্রাম নেই, থানার ইজিচেয়ারটায় চুপচাপ বসে থাকা যাবে।

কিন্তু বিরজাই আগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অনায়াসে সে কাঁদতে পারত কিন্তু কাঁদবেনা ঠিক করে নিয়েছে। কান্নায় মোহিনীর কিচ্ছু যায় আসেনা। তাছাড়া সে ঠিক জানে, এম্নি দুপুরবেলা বেড়ার ওধারে নিরুপমার মা কোবরেজ গিন্নীকে নিয়ে চুপি দিতে সুরু করে। একা-একা বিরজা কি করে ওদের তা-ই দেখা চাই—দেখা চাই লুকিয়ে-লুকিয়ে—বাড়িতে আসবেনা। কি সব পড়শীই না জুট্‌ল তার! বিরজাকে কাঁদতে দেখলে ফুরতির কি আর ওদের অন্ত থাকবে—অথচ কী যে তার অপরাধ সে জানেনা! কে জানে বেড়ার ফাঁকে চোখ পেতে উঠোনের ভাঙা হাঁড়িটা এরই মধ্যে ওরা দেখে নিয়েছে কি না।

হয়ত বেড়ার ধারে গেলে এখন ওদের খিল্-খিল্ হাসি শোনা যাবে।

উঠোনে নেমে বিরজা ভাঙা হাঁড়ির খোলামকুচি কুড়োতে লেগে গেল। শরীরের সঙ্গে মেজাজটাও নুয়ে গেল যেন খানিকটা, তাড়া খেয়ে কাক আর শালিখগুলো পালাচ্ছে না—উঠোনময় ভাত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছে। সব জঞ্জাল জড় করে আঁস্তাকুড়ে নিয়ে ফেল্‌তে খানিকটা সময় লাগল বিরজার। আরো খানিকক্ষণ খরচ করতে হ'ল গোবরজল ছড়িয়ে দিতে। সমস্ত উঠোনটাই ত এঁটো হয়ে গিয়েছিল—গোবরজল না দিয়ে উপায় কি! যতীন দেখলে অবশ্যি বল্‌ত—'তাহলে ত মনে করা যায় সারা ব্রাহ্মাণ্ডই এঁটো হয়েছে, শুধু উঠোনটুকু কেন?' আজেবাজে কতো কথাই ত বলে যতীন—তারজন্যে বিরজা ত তার অভ্যাস ছেড়ে দিতে পারে না। ছোটবেলাকার এ-অভ্যাস। মার আর দিদির ত রীতিমতো শুচিবাই—সে-ফাঁড়া-টা কাটিয়ে উঠেছে বিরজা! তা অবশ্যি—বিরজার মন খানিকক্ষণ থেমে রইল, তারপর বলতে হ'ল, স্বীকার করতে হল—তা অবশ্যি শ্বশুরবাড়িরই গুণে! কিন্তু ওঁদের যা ছিরি, বামুনের কোন আচার-বিচারই নেই! বড়-জা না থাক্‌লে ত বাড়িটা আঁস্তাকুড় হয়েই থাকৃত! ওই একটি প্রাণী—ঘরের দাওয়া-পইঠা, মাটকোঠার দেয়াল, উনুন-উঠোন ওঁরই জন্যে তকৃতকে হয়ে আছে। বকে-ঝকে বাড়ি মাথায় করে রাখেন সবসময়, রাগও হয় ওঁর উপর কিন্তু মানুষটার কাছে অনেক শেখবার আছে—পরিষ্কার থাকেন, পরিষ্কার রাখেন অথচ শুচিবাই নেই।

হাত ধুতে গিয়ে বিরজা দেখল এক-ভার বেশি জল তখনও পড়ে আছে। রামশরণের কাছে থেকে জরিমানা আদায় করেছিল যতীন। স্নান করবার জন্যে এতোটা জল অনেকদিন পায়নি সে। এতোটা

ভালো জল! কেরোসিনের টিনের ভেতর ঝক্‌ঝক্ করছে জলটা! তোলা জলে স্নান করে করে স্নানের আর রুচি নেই আজকাল তার—পুকুরের তোলা জল যা নোংরা দেখায়! তবু পুকুরে নেমে পুকুরের জলে স্নান করা একরকম—পুকুর থেকে জল তুলে আন্‌লে নাক-চোখ না বুঁজে গায়ে লাগানো মুস্কিল। সেরেস্তাদারের পুকুরে বেড়ার ঘেরটোপ দেওয়া মেয়েদের ঘাট আছে—এ-পাড়া ও-পাড়ার মেয়েরা আসে কিন্তু বিরজা একদিনও যায়নি। যাবে কি—তার পেছনে নিরুপমার মা মুখে কাপড় ঠেসে হাস্‌তে সুরু করবে, তা নাহয় ত বলবেঃ "এ-ঘাটে কি সাঁতার দিতে পারবে—গাঁয়ের মেয়ে, জলে হুটোপুটি করেই ত অভ্যেস!" দু'চারদিন মিশতে গিয়েই এ-পাড়ার কথার ধরণ জেনে নিয়েছে বিরজা—কথার ধরণ, ঠাট্টার ধরণ, হাসির ধরণ। ওদের যেন সাতপুরুষ সহরে বাস! গাঁয়ের ছায়া দেখলেই চোখ থেকে হাসি ছিট্‌কে উঠ্‌বে! পুকুর আর হবেনা বিরজার! ছোট্ট একচিল্‌তে এটুকু জায়গায় পুকুর আর হবে কি করে? তবে পশ্চিমদিকে মহিম-পিওনের ভিটেটা আর তার লাগ্ খানাখন্দটা নাকি তাদের পাওনা আছে, মহিম উঠে গেলেই ওজায়গাটা তাদের হয়ে যায়। তাতে অবশ্যি পুকুর আর হয়না, বড় জোর একটা ডোবা হয়। খানাখন্দ কেটে জল কেমন হয় কে বল্‌বে! যাঃ, ভালো জল হলে ডোবায়ও স্নান করা যায়—একটা পাকা ঘাটলা থাকলে ত আর কথাই নেই।

ইট-বিছানো স্নানের জায়গাতে বসে ঘটি-ঘটি জল তুলে মাথায় ঢাল্‌তে সুরু করল বিরজা। মাথায় তেল দেওয়া ত হয়নি! না হোক, তেল মেখে চুল-শুকোবার হাঙ্গামা এখন কে করতে যাবে? কিন্তু গামছা-কাপড়, তা-ও ত আনা হয়নি। ওটা ভুল হয়ে গেছে—ভিজে কাপড়েই ঘরে গিয়ে উঠ্‌তে হবে! মেঝেতে কাপড়-চোঁওয়া

জল লক্ষ্মীর চিহ্ন নয়—কাজ বাড়ল, আবার নেতা হাতে নিতে হবে! রাগ করলেই কাজ বেড়ে যায়—বিরজা সব সময়ই দেখতে পাচ্ছে—তবু রাগ করতে হয়! বাবা রাগী ছিলেন, ভীষণ রাগী মানুষ—বাবারই রাগটা বোধ হয় পেয়েছে বিরজা—চেহারাও তার বাবারই মতন, মার মতন নয়। কিন্তু পিতৃগঠন মেয়ে ত সুখী হয়—সুখী হচ্ছে কি, সুখী হবে কি সে? সুখী হয়? একটা চলতি কথা মাত্র—হয়ত হয়, আবার হয়ও না। বিরজার বেলায় কি হবে কে জানে!

বিরজা উঠে দাঁড়াল—শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে কাপড়। স্নানের জন্যে এতোটা জল কোনোদিন থাকেনা। পা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়টা আলগা করে না দিলে হাঁটবারও উপায় নেই। কিন্তু একদিকে আলগা করলে অন্যদিক লেপ্টে যায়। লাড্ডু-ঘোড়া মার্কা কাপড়ের অই দোষ—এতো পাতলা! মোহিনীর যেন একটা জেদই—দিশি মোটা কাপড় কিছুতেই কিনবে না—বললে বলবে, ওটা ফ্যাসন, দু'দিনেই মিইয়ে যাবে! কিন্তু পাতলা কাপড় যে এত বিশ্রী—ভিজলেই যে সমস্ত গা ফুটে বেরোয়—তা কি বুঝবে মোহিনী? একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকাল বিরজা। হলুদ-মতো হয়ে গেছে গায়ের রং—এতো ফর্সা ত সে ছিলনা—সহরে এসে ফর্সা হতে সুরু করল কি, না কি চামড়ায় টান ধরছে, শরীর ভালো হচ্ছে তার? আঁচলটা নিংড়ে বিরজা চুলের উপর গামছার কাজ চালিয়ে নেয়—কাপড়ের জল গড়াক—চুলের জল গড়াতে দেবে না সে—আঁচল দিয়ে চুলটাকে জড়িয়ে তোলে।

কেউ নেই, তবু যেন কেমন লজ্জা করছিল তার। কেউ নেই বলে কি—আলো আছে ত, নিজে ত সে দেখতে পাচ্ছে তার শরীর—উদোম শরীর, কাপড়ের সাদা-কুচি দু-এক জায়গায় আছে কি নেই!

লজ্জা করছে বলেই যেন বুকটা ভারি-ভারি মনে হচ্ছে। হাওয়া লাগছে বলেই শুধু নয়। বিরজা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে উঠোনটা পার হয়ে এলো। উঠোনটা পার হয়েই যেন হাল্কা হয়ে গেল শরীর, মনে হ'ল উঠোনটা লজ্জা দিচ্ছিল তাকে এতোক্ষণ। ঘরে ঢুকতে আর লজ্জা নেই। বরং এভাবে যে ঘরে ঢুকতে পারছে তাতে তার ভালোই লাগল।

মোহিনী আছে কিন্তু চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। তবু আছে ত, তোড়জোড় করেও বেরিয়ে যায়নি।

তিন

১

অনেকবারই দেখেছে বিরজা মেজাজ যখন তার এম্নি তেতো হয়ে ওঠে, একটা না একটা অনর্থ ঘটবেই। তিতুর উপর এবার ফাঁড়া চলছে। ও যে একটা শক্ত অসুখে পড়বে ক'দিন থেকেই মনে হচ্ছিল। একদিন শুধু তারই পেছনে পেছনে ঘুরেছে—ইস্কুলে যায়নি—মুখ শুক্নো, বিরজা লক্ষ্য করেছিল। গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে সে বারবার—গা গরম ছিলনা; তাই মনে হয়েছিল, হয়ত মাষ্টারের ভয়ে ইস্কুলে যাবেনা বলেই সং ধরেছে তিতু। আর বলেওছে তাই একসময়: "যাবিনে ত যাস্‌নে ইস্কুলে, পেছন-পেছন ঘুরে ওরকম চিঁচিঁ করছিস কেন? একদিন ইস্কুলে না গেলে তোর বিদ্যে কিছু হজম হয়ে যাবে না!" কিন্তু রাত্রিতেই গা গরম হয়ে উঠল। আর এখন ত এই! দু'দিনের জন্যে আবার মোহিনী গিয়েছিল মফঃস্বলে—যতীনকে দিয়ে বিরজা পাড়ার কোবরেজ মশাইকেই ডাকিয়ে আনল। সর্দ্দি বসে গিয়ে জ্বর হয়েছে, আধ-সপ্তাহের অষুধেই বুকটা পরিষ্কার হয়ে জ্বর সেরে যাবে, কোবরেজমশাই বলে গেলেন। সর্দ্দিজ্বরে কি ছেলে এম্নি নিঃসাড় হয়ে যায়—চোখই মেলছে না—গা পুড়ে যাচ্ছে, বিরজা তিতুর মুখের উপর ঝুঁকে বুঝতে চেষ্টা করেছিল। সর্দ্দিজ্বর কি আর বিরজা চেনে না? একদিনও ত ওর নাকে সর্দ্দি গড়ায়নি! কিন্তু কোবরেজমশাই যখন বলছেন, বিরজার সন্দেহ করে কি লাভ? লাভ নেই! ছেলেদের মেজাজ-মর্জ্জি চিনতে পারে বলে কি বিরজা

তাদের অসুখ-বিসুখও চিনতে পারবে? ডাক্তারবৈদ্যের বিদ্যে কি তার জানা আছে না কি! কিন্তু আদার রস, তুলসীপাতার রস আর মধু দিয়ে অষুধ ত তিনবেলা খাওয়ানো হ'ল—একটুও ধরলনা যে! যতীনকে আবার যেতে হ'ল কোবরেজমশাই-এর কাছে—কোবরেজ-মশাই না কি হেসে ফেললেন—বলে দিলেন: "সামান্য অসুখে অত অস্থির হতে নেই, বলো গে তোমার মাসীকে।" বিরজা একটু যেন অপ্রস্তুতই হয়ে গিয়েছিল—হাবুলকে তিতুর কাছে রেখে রান্নার কাজে গিয়ে মন দিয়েছিল। কিন্তু বিকেলবেলা যখন তিতুর ইস্কুলের সাথীরা বই বগলে তিতুকে দেখতে এসে ওর বিছানা ঘেরাও করে দাঁড়াল, বিরজার যেন হাত-পা অবশ হয়ে যেতে লাগল। কেন যে এমন হচ্ছে—বুঝতে পারেনি সে। ফুটফুটে ছেলেগুলো মুখভার করে আছে বলেই কি? ফিস্‌-ফিস্‌ করে ওরা কি বলছে—'জ্বর?'—'জ্বর'—'তিতু—'—'এই যাঃ'—কানে আসছিল বিরজার, বুঝতেও পারছিল কথাগুলো তবু যেন মনে হচ্ছিল ও-কথাগুলো ছাড়াও আরো কোনো কথা জানা আছে ওদের—তিতুর অসুখ যে সাংঘাতিক ওরা খবর পেয়েছে। কোথায় খবর পেল? কে খবর দিল? যতীন? যতীন কিছু জানে না কি—কোবরেজমশাই কিছু বলেছেন যতীনকে? হয়ত গোপন করছে যতীন—বিরজা ভয় পাবে বলে গোপন করছে। কিন্তু গোপন করে কি লাভ তার—আর মাসীমার কাছে কিছু গোপন রাখবার ছেলে কি সে? ছেলেরা চলে গেলে যতীনকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে বিরজা বলেছিল: "জ্বরটা ওর কমলনা ত!" যতীন ঘাবড়ে গিয়ে বললে: "ডাক্তার ডাকব—ভূপেশডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসব?" "আমি কি জানি—কোবরেজমশাই তোকে কি বলেছেন আমি কি জানি—" কেমন যেন অস্থির-অস্থির শোনাল

বিরজার গলা। "কোবরেজ ত বললেন সেরে যাবে !"—দিশে হারিয়ে তাকিয়ে রইল যতীন। যতীনের মুখের প্রত্যেকটি রেখায় বিরজা চোখ বুলিয়ে দেখেছিল—কিছু গোপন করলে যতীন ওভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। যাক, ডাক্তারের খোঁজ যতীনকে করতে হলনা—সন্ধ্যায় মোহিনী মফঃস্বল থেকে ফিরে এসে ভূপেশবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো। সে যে কী রাত্রি গেছে বিরজার, এখনও ভাবতে গেলে যেন বুকটা হিম হয়ে আসে। মোহিনীর বন্ধু-মানুষ ভূপেশ ডাক্তার—বাড়িতে পা দিলেই বাড়ির গিন্নীকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা সুরু করে দেন কিন্তু সেদিন রোগীর কাছে বসে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর মুখ। দু'বার করে বুকে নল বসালেন তারপর একটা কাগজে অষুধের নাম লিখে দিয়ে যতীনকে পাঠিয়ে দিলেন ডাক্তারখানায়। অষুধ এলো—বুকের প্রলেপ—বিদঘুটে গন্ধ—নিজহাতে প্রলেপ লাগিয়ে হাত ধুতে তিনি বারান্দায় গেলেন। ঘটিতে করে জল ঢেলে দিচ্ছিল মোহিনী—বোঁজা-বোঁজা গলায় জিজ্ঞেস করল: "কেমন দেখলে ?" "কাল আমায় খবরটা দিলনা কেন বলতে পারো ?"—পাল্টে প্রশ্ন করলেন ভূপেশবাবু। যতীনকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারখানায় চলে গেলেন তিনি। মোহিনী একটা হাতপাখা নিয়ে নিজের গায়ে হাওয়া করতে লাগল। কোন্ দিকে তাকাবে বিরজা ভেবে পাচ্ছিল না—শেষটায় তিতুর পাশে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ডাকতে সুরু করল—"তিতুন্—বাবা—আজই জ্বর সেরে যাবে তোমার—ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, দ্যাখোনি ?" এক কাতেই রাত্রি কাটল বিরজার—মিতুটা যে কোথায় রইল সে-খোঁজও সে করেনি! সমস্ত রাত্রি প্রলাপের মতো কি যেন বিড়্‌বিড়্ করেছে তিতু—বুকে চেপে রেখেও ছেলেকে ভোলাতে পারেনি বিরজা---ও-বিছানায় মোহিনী মশারির নীচে ঠায়

জেগে বসেছিল ঘড়ি দেখে দেখে অষুধ দেবার জন্যে। ভোরের দিকে তিতু ঘুমুচ্ছিল—বিছানা ছেড়ে উঠে এলো বিরজা। মোহিনীর বিছানায় হাবুল ঘুমুচ্ছে—মোহিনীর তামাক-টানার শব্দ আসছে বারান্দা থেকে। পরিচিত শব্দ—তবু কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে সব—একটা দুঃস্বপ্নের অন্ধকার এইমাত্র চোখ ছেড়ে চলে গেছে—চোখের ফর্সা-টা যেন তাই ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়না। গলা-খাকারির আওয়াজ—খড়মের ঠুক্-ঠুক্ শব্দ করে বাইরে কে এলো ?

"কোন্ খোকার না কি শক্ত অসুখ—কি হে! পাড়ার মানুষদেরত একবার জানাতে হয়—"

ও-বাড়ির কর্ত্তামশাই-এর ভারি গলায় ঘরের মধ্যেই বিরজা খানিকটা পেছিয়ে এলো—ঘরের মধ্যে থেকেই ঘোমটা টেনে দিল সে।

"আমি ত ছিলাম না—মফঃস্বলে ছিলাম—" হুঁকোর টান বন্ধ হয়ে গেল মোহিনীর।

"শুন্‌ছি কোবরেজের চিকিৎসে চলেছে—শক্ত জ্বরে কবরেজ-ফবরেজে চল্‌বেনা—ডাক্তার ডাকো—"

"ভূপেশবাবু এসে দেখে গেছেন কাল!"

"হাঁ—ভূপেশকে দিয়ে চিকিৎসে চালাও—জ্বরে ওর হাতযশ খুব!"

"নিমোনিয়া—ভূপেশবাবু বল্‌লেন।" মোহিনীর গলাটা ধরে গেল।

নিমোনিয়া! বিরজা কোনদিন এ-নাম শোনেনি—নিমোনিয়া—নিমোনিয়া—বিরজার মনে হল যেন নামটা মুখস্ত করা দরকার।

"বুঝলাম ত নিমোনিয়া—ওতে ঘাব্‌ড়াবার কিছু নেই—আট দশ দিন ভোগাবে—বরফের দরকার হ'তে পারে, ষ্টেশনে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।"

কর্ত্তামশাই চলে যাচ্ছেন মনে হ'ল—কিন্তু খড়মের ঠুক্-ঠুক্ ক'টা আওয়াজ উঠেই আবার থেমে গেল।

"রাত-জাগতে পারে এমন লোক ত দেখ্‌ছিনে তোমার—বলো ত সুরেশ-বিনয়-নিরু এসে রাত্তিরে থাকতে পারে !"

"দরকার হলে বল্‌ব—"

"বলো—ওকথাটাই বল্‌তে এসেছি। পাড়ায় যে আছি ভুলে যেয়োনা—"

গলা খাকারি দিয়ে কর্ত্তামশাই এবার সত্যি চলে গেলেন। চোখের সাম্‌নে অনেকখানি জায়গা ফর্সা হয়ে উঠল বিরজার—বুকটা যেন কি করে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, ভরাট হয়ে আস্‌তে সুরু করল আবার। বিরজা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

"নিমোনিয়া—নিমোনিয়ার অষুধ দিয়েছেন ত ডাক্তারবাবু ?" মোহিনী রপাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল বিরজা।

ঘাড় নেড়ে মোহিনী হুঁকোয় মন দিলে।

"তিতুর অসুখের কথা কার কাছে শুন্‌লেন উনি ?"

"কোবরেজমশাই হয়ত বলেছেন—"

"পাড়ার লোক বলে' কি—কোবরেজের উপর ওঁর-ও বিশ্বাস নেই—" বিরজা একটু থেমে আবার বল্‌লে: "সেদিন চোখে-মুখে পথ না দেখে আমি কোবরেজকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম !"

"ভূপেশবাবুকে ডাক্‌লেই হত !" মোহিনী উঠে দাঁড়াল।

বিরজা চুপ করে রইল। ভূপেশবাবুকে ডাকবার কথা মনে হয়েছিল তার কিন্তু ডাকেনি—বাসায় মোহিনী নেই বলেই ডাক্‌তে সাহস করেনি। উনি ত সরল মনে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করবেন—কিন্তু বেড়ার ওধারে সব চোখ-কান খাড়া হয়ে থাক্‌বে—তারপর একটা

কথা রটিয়ে দিতে ওদের আর কি ? নিরুপমার হিষ্টিরিয়া ভূপেশডাক্তার না এলে সারেনা—মাষ্টারবাবুর পিসিমাই ত একদিন এসে বলে গেছেন বিরজাকে। কে কেমন লোক বিরজা কি করে বলবে! লোকটা হাসি-খুসী, মিশুক বলেই হয়ত ওঁর বদনাম! তবু বদনাম যখন আছে কাজ কি সে-বদনাম ডেকে এনে গায়ে মাখিয়ে নেবার ?

দুপুরবেলা নিরুপমার মা এলেন—চাকরকে সঙ্গে নিয়ে—চাকরের হাতে একটা বস্তায় বরফ। দিনের বেলায় ষ্টেশনে বরফ পাওয়া যায়না—কলকাতার মেল-এ বরফ থাকে, রাত্রি এগারোটায় তার টাইম। "কর্ত্তা তাই জংসন-ষ্টেশনে লোক পাঠিয়ে বরফ আনিয়েছেন, বউ,—বললেন বিকেলের দিকে যদি জ্বর বাড়ে তখন বরফ পাবে কোথায় ?"—গিন্নীঠাকরুণের কথার ভঙ্গীই শুধু নয়, চেহারাটাও কেমন যেন নরম আর তাই সুন্দর মনে হ'ল বিরজার। বিরজা অনায়াসে হাত বাড়িয়ে বস্তাটা তুলে নিলে। তারপর একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। "জানো বউ, ছোট ছেলেপিলেদের জ্বরজারিতে ডাক্তারই ডাকতে হয়—আমার বাবা ত ডাকসাইটে কোবরেজ ছিলেন কিন্তু উহুঁ, কোবরেজী অযুধে আমার বিশ্বাস নেই!" বিরজার মনে হল যেন সে শাশুড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে—নড়বার ক্ষমতা নেই।

সন্ধ্যা হতেই সুরেশ এসে বললে: "কি বলো যতীন, আমি আর তুমি আজ রাত জাগব—বৌদি, আপনি ঘুমুন্ আজ।" "জেগো কিন্তু ওর জ্বরও কমে গেছে—" বিরজা না বলতে পারলনা। সুরেশ এলো, যতীনের বিছানায় ঘুমিয়ে রইল, রাত জাগতে হলনা। কিন্তু এসেছিল সুরেশ।

এখন ভাবতে গেলে সে-রাত্রিটা আর পরের দিনটা কেমন যেন

ছবির মতো মিথ্যে মনে হয়। কর্ত্তা-গিন্নী-ছেলেপুলেরা হঠাৎ এগ্নি কাছে এসে কেন যে দাঁড়িয়েছিলেন, বিরজা ভেবে পায়না। নিরুপমা কিন্তু আসেনি তখন--এখন আস্‌ছে। অদ্ভুত ওদের রকমসকম—বোঝা যায়না। থাক্, বুঝতে চেষ্টাও করেনা বিরজা। বুঝ্‌তে গিয়ে ওদের উপর ভালো ভাবটুকু যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে লাভটা কি হবে তার? তাছাড়া ঋণ যে সে নিয়েছে—সেকথা ত আর মিথ্যে নয়। তারজন্মে এখন দুবেলা তিতুর খবর গিন্নীকে দিয়ে আসা উচিত—কিন্তু তা করছেনা ত সে! সময় নেই, অবসর নেই এমন কথা বল্‌তে পারবেনা বিরজা। ঠিকে ঠাকুর রান্না করছে এখন, চাকরও একজন এসে জুটেছে। মাকে চিঠি দিয়েছে বিরজা—আজ কি কালই আস্‌ছেন তিনি। তিতুর কাছে বসে থাকা ছাড়া সত্যি বল্‌তে আর কি কাজ আছে তার? গিন্নীকে সে খবর দিয়ে আস্‌তে পারে—কিন্তু দিচ্ছেনা। দু'পা হেঁটে যেতে শরীরটা রাজি নয় সত্যি কিন্তু মন ওদের ঋণটা স্বীকার করে নিয়ে বসে আছে। নিরুপমা এলে তার সঙ্গে এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে থাকে বিরজা—প্রাণ খুলে হাসিঠাট্টা চালায়।

"আমার চুলগুলো যদি, বৌদি, তোমার মতো হ'ত—" বিরজার চুল বেঁধে দিতে যেন একটা আলাদা উৎসাহ পায় নিরুপমা।

"তাহলে আরো সর্ব্বনাশ করতে আর কি—" বাড়ির বৌ-এর মতই ফিক্ করে হেসে ফেলে বিরজা।

নিরুপমা ঘাবড়ায় না, বরং চোখের পলক একটু নেতিয়ে আসে, চিরুণীর উপর আঙুলগুলোতে সুন্দর ভঙ্গী খেলে যায়: "আমার গল্প তাহলে তোমার কানেও পৌঁচেছে—? কার কাছে শুন্‌লে, কোবরেজমাসী না মাষ্টার-বৌদি বলেছেন?"

"শুনতে হবে: কেন ? তোমার চেহারাতেই গল্প তৈরী হয়।"

"ছাই চেহারা —" গদ্‌গদ্ শোনাল নিরুপমার গলা।

"চেহারাকে মিথ্যে দুষলে কি হবে বাপু—দেখবে ওর গুণেই একদিন বরের ভীড় লেগে যাবে!"

"বেশ কথা বলতে শিখেছত বৌদি—"

"সহরে এসে কতো ভালো-ভালো জিনিস দেখছি—বেশ কথা বল্‌তে শিখবনা ?"

"আঁট-খোপা কিন্তু আজ করবনা বলে দিচ্ছি—অতো চুলে আঁট-খোপা কে করে ?" নিরুপমা চিরুণীর চুলগুলো আঙুলের ডগায় জড়াতে সুরু করে।

বাঁকা চোখে তাকিয়ে নিয়ে বিরজা বলে: "অতো চুল আর থাকছেনা—তোমার মুখ লেগেছে—রোজ-রোজ কি রকম উঠছে দেখছ ত!"

"আমার নয়, মাষ্টার-বৌদির মুখ লেগেছে! সত্যি কি বিশ্রী দেখায় ওর মাথাটা দেখেছ বৌদি,—"

"কি করবে বাপু—অতগুলো ছেলেপিলে হলে চুল থাকে না কি কারো ?"

"চুল ছিঁড়ে খায়!" খিল্‌খিল্ করে হাস্‌তে থাকে নিরুপমা।

"বিয়ে হয়ে নিক্—বুঝবে তখন!"

নিরুপমা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে—বিরজার চুলের উপর আঙুলগুলো চল্‌তে থাকে। বিরজার কৌতূহল নেই। তবুকি বলে নিরুপমা—অপেক্ষা করে।

"বাবা, তোমরা সবাই মিলে যা ভয় ধরিয়ে দিচ্ছ বিয়ের উপর—" শেষটায় বলে নিরুপমা।

"একেকজন পারে ওম্নি !"

"আচ্ছা, মিতুর বয়েস কতো বলো ত বৌদি—"

মিতু উঠে দাঁড়াল—দু'বার ঠোঁট টিপল—নিরুপমার দিকে এম্নিভাবে তাকাল যেন সে তাকে চেনেনা—তারপর বারান্দা ছেড়ে আবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

"মাঘ মাসে চারে পড়ল !"

"মাষ্টার-বৌদি কেমন মা ছাখো—কোলের বাচ্চার জন্যে ছ'মাসও না কি দুধ থাকেনা ওর বুকে !"

মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বিরজা নড়েচড়ে বসল। নিরুপমার মুখে বলেই কথাগুলো যেন ভালো লাগছিলনা তার—সোনার মা হলে হয়ত উৎসাহ থাকত। শরীর নিয়ে কতো আজেবাজে কথাই বলেছে সোনার মা—শুনতে বিরজার খারাপ লাগেনি—শেষে নিজেও সাহস করে দুচারটে কথা বলেছে। শুনে হাততালি দিয়ে উঠেছে সোনার মা : "গুরু মান বাম্নি—তোর মুখ ফুটিয়ে দিলাম !" কিন্তু নিরুপমা তার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট—সাত আট বছরের ছোট ত হবেই—তাছাড়া মেয়ের বিয়ে হয়নি—এ সব কথা নিয়ে ও মাখামাখি করছে কেন !

"তোমার চুলটা আজ আমি বেঁধে দি—কেমন ?" বিরজা বিন্দু-বিন্দু হাসতে লাগল : "গাঁয়ের মেয়েদের মতো উঁচু খোঁপা করে !"

"মা—তিতু অযুধ খাবেনা বলছে—" মিতু এসে দরজায় দাঁড়িয়ে নালিশ জানাল।

"তোমাকে অযুধ খাওয়ার ভার কে দিয়েছে ?" হেসে ফেলল বিরজা।

বিরজা একটা উত্তর তৈরী করে তোলে কিন্তু বলা হয়না—মিতু এসে কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—তিতুর সঙ্গে এতোক্ষণ টুং টাং কথা বল্‌ছিল, হয়ত তিতু ঘুমিয়ে পড়েছে কাজেই মা ছাড়া এখন ওর আর গতি কি? মুখ গুঁজে নানা রকম সুর তুলে দেয় মিতু। সুরের মানে বুঝে নিয়ে বিরজা বলে: "ছি:—আর নয়—বলিনি?"

বেণীতে হাত থামিয়ে দিয়ে নিরুপমা চোখ তুলে তাকায়: "কি বৌদি?"

"দুধ ছাড়ানো গেলনা ওকে!—এই, পিসিমা কি বল্‌ছে ছাখ!"

"এট্টু খাব—" মিতু মুখ তোলেনা।

নিরুপমা হাস্‌তে হাস্‌তে বিরজার পিঠের উপর গড়িয়ে পড়ে। বিরজা মিতুর মুখ তুলে বলে: "আজই শেষ—আর কোনোদিন না, বলে দিচ্ছি!"

বিরজার পিঠের উপর দু'হাতের ভর রেখে আবার সোজা হয়ে বস্‌ল নিরুপমা: "নাছোড়বান্দা ছেলে তোমার বৌদি—" খোঁপাটা চুলের গোড়ায় জড়িয়ে এনে বললে: "ওসব রূপোর কাঁটা আমি গুঁজতে পারবনা বাবা—"

"চুলের রূপ দেখিয়ে আর কাজ নেই—ও-ই গুঁজে দাও—"

"সাদা-সাদা দেখাবে, কি বিশ্রী না?" আব্দেরে আপত্তিতে নাকী সুর বেরোয় নিরুপমার।

"তিন ছেলের মার বিশ্রী বলে কিছু আছে না কি?"

"বারে বা, পাঁচটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মাষ্টার বৌদি তবে কি?" নিরুপমা বিরজার পিঠে গা ঘষে দেয়: "বাচ্চাগুলো ধূলোয় বালিতে যার যেমি গড়াগড়ি দিচ্ছে—একবার ছোঁয়ও না মাষ্টার-বৌদি—পাছে তার কাপড় নোংরা হয়ে যায়!"

"মিতু—এসো—শোনো—এসো—" নিরুপমা হাত বাড়িয়ে ডাকতে লাগল।

বারান্দায় নেমে এসে মিতু নিরুপমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ওকে টেনে নিয়ে যেন কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল নিরুপমা। ফুলের কেশরের মতো মিতুর পাতলা নরম চুলগুলোকে যেন পেয়ে বসল তার নরম আঙুল।

"তোমার ছেলের গড়ন, বৌদি—ঠিক মেয়ের মতো—দিদির মেয়েটাকে যদি দেখতে ঠিক এম্নি!"

"যতীন তাই বলে, মিতুনি আমাদের বোন—"

"ওর ভালো নাম কিছু রেখেছ বৌদি?"

"ওদের জ্যেঠা-ই ওদের নাম দেন—আমি রাখব কি!"

"বলো ওর নাম জ্যোৎস্না রাখতে!"

"মেয়ের নাম?" বিরজা হেসে চলল।

"হ্যাঃ আমার এক দাদা ছিলেন—পিস্তুতো ভাই—ওই নাম!" নিরুপমা যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল: "বড়দা আর বিনয়কে যা দেখছ তেমন নয়! লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলেন—আসতেন মাঝে-মাঝে ঢাকা থেকে। তারপর স্বদেশী হয়ে গেলেন। কেউ আর তাঁর খোঁজ জানেন না এখন!"

একটু যেন চম্‌কে উঠল বিরজা, তারপর নিশ্চল হয়ে বললে: "হেঁ অনেক ছেলেই ত স্বদেশী হয়ে যাচ্ছে আজকাল! যতীনকে নিয়েও আমার ভয়!"

"দারোগার বাড়িতে কেউ স্বদেশী হয় না কি—কি যে বলো তুমি!" আবার সেই হাসি-হাসি চোখ ফিরে এলো নিরুপমার।

"দারোগা ত আর ঘর আগলে নেই!"

"জানো বৌদি—" নিরুপমা উৎসাহে নড়ে-চড়ে উঠল : "আমরা কিন্তু বেশ মজায় আছি! আমাদের পাড়ায় কোনোদিন পুলিশের হাঙ্গামা হবেনা—দাদা আছেন! নইলে পাড়ায়-পাড়ায় যা চলছে!"

বিরজা খুসী হয়ে উঠল। আর তাই ভুরুকুঁচকে ধমকের সুরে বললে : "কি, চুল বাঁধবেনা তুমি?"

"দাও বেঁধে—" পিঠের কাপড়টা সরিয়ে দিল নিরুপমা।

নিরুপমার হাত থেকে চুড়িগুলো খুলবার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছিল মিতুর। 'আমি খুলে দিচ্ছি–পরবে হাতে?"—নিরুপমা চুড়ি খুলতে লেগে গেল!

"এই—" বিরজা চেঁচিয়ে উঠল : "ও কাজও করোনা! ভাসুর-ঝি আদর করে ওর গলায় হারটা পরিয়ে দিয়েছিল একবার—" বিরজা হাসতে সুরু করল : "শয়তান দৌড়ে পুকুরের ধারে গিয়ে হারটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দিলে! তারপর জেলে এনে কতো কাণ্ড করে হার পাওয়া গেল!"

"এ্যাঁ তাই না কি মিতু—" সুর করে জিজ্ঞেস করল নিরুপমা।

মিতু ঠোঁট চেপে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল। ওর বাহাদুরীতে একসঙ্গে দুজনেরই শরীর দম্‌কা হাসিতে দুলে উঠল।

২

নিরুপমা যেদিন আসেনা তিতুর পাশেই বিরজা শুয়ে থাকে—পড়বে বলে চামড়ার বাঁধাই রামায়ণটা পাশে রাখে—কিন্তু পড়া হয়না। ও-পাশে মিতু শুয়ে-শুয়ে শতসহস্র প্রশ্নে কান ঝালাপালা করতে সুরু করে—হঠাৎ গলা চড়িয়ে দিয়ে তিতুর তন্দ্রা ভেঙে দেয়। বিরজা

শেষে কান পেতে থাকে রাস্তার দিকে—ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল কি না! দেশের গাড়ি দুপুরবেলা—মা এলে এসময়েই আসবেন। ভাসুর চিঠি দিয়েছেন তিতুর জন্যে ওঁরা সবাই বিশেষ চিন্তিত কিন্তু আসবার নামটিও করেন নি কেউ। ভাসুরের যেন খামার-গেরস্তির ঝঞ্ঝাট—তাছাড়া জমিদারের সেরেস্তায় নায়েবী আছে কিন্তু শাশুরী ত বলতে পারতেন আসবার কথা! বিরজা নিজের কথার উত্তর নিজেই তৈরী করে নেয়—শাশুড়ী আসবেন?—ছেলেদের জন্যেই ভারি তাঁর মায়া আর নাতি! মাষ্টার-গিন্নীর মতোই ছিলেন তিনি—সহরে থাকতেন, পুলিশ-পেয়াদার হাতে ছেলেরা মানুষ হয়েছে—গা-তে ফুঁ-টি লাগতে দেন নি! প্রাণভরে হয়ত বাবুগিরি করেছেন—সোনার চন্দ্রহারটা ত বিরজাও দেখেছে! এখনও বা কি! ফুটফুটে বিছানা—ধবধবে থান! এখনো হয়ত সহরেই থাকবার তাঁর ইচ্ছা কিন্তু মোহিনী মুখ ফুটে বলেনা—তাই শাশুরীরও অভিমান, সহরের নামটিও মুখে আনেন না। মোহিনীর উপর খুসী নন তিনি। হয়ত বিরজাকেই মনে-মনে দোষেন। কিন্তু তিনি আসতে চাইলে বিরজা আপত্তি করবে কেন—একা-একা কতগুলো শিশু নিয়ে থাকতে তারও কি ভালো লাগে? তবে ছেলেকে তিনি জানেন। বিরজার আসা-তেও কি কম আপত্তি ছিল মোহিনীর? শাশুড়ীকেই শেষটায় বিরজার পক্ষ নিতে হল—ভাসুরঠাকুর ত হালই ছেড়ে দিয়েছিলেন! "বউ-এর হাতে ছাড়া ও শায়েস্তা হবেনা—তেজী বউ সাধে এনেছি!"—হাসতে হাসতে প্রায়ই বলেন শাশুরী। প্রথম দিন শুনে কি বিশ্রী লজ্জা করতে লাগছিল বিরজার—জা-য়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনর্থক সে কেঁদে ফেলল! জা-ত অপ্রস্তুত—তারপর সব শুনে নিয়ে বললেন: "যাঃ মরা, ভালো কথা বললেও তোর গায়ে

বেঁধে?" তারপর থেকে ও-কথায় বরং মজাই পেয়েছে বিরজা। আর সত্যি বলতে শাশুরী কোনোদিন তাকে হেলাফেলা করেন নি—পণ্ডিত-বাড়ির মেয়ে বলে বরং একটু সমীহই করেন তিনি তাকে। ভালোয় মন্দোয় মিলিয়েই ত মানুষ—শাশুরীর মন্দটুকু ভাবতে যাচ্ছে কেন সে—বিরজা জিভ কাটে—জিভে দাঁতগুলো একটু শক্ত করেই বসিয়ে দেয়। কি যে বিশ্রী অভ্যাস হল তার, মানুষের মন্দটাই সবার আগে মনের উপর উঠে আসে! সেরেস্তাদার পরিবারের মন্দটাই ত বড় করে চোখের উপর রেখেছিল সে এতোদিন! এখন? কেমন আক্কেল হয়েছে?

"এয় রাধে"—চেনা বৈষ্ণবীর আওয়াজ পাওয়া যায় বাইরে। আর সবাই রবিবারে আসে—শুধু ওর বিষ্যুৎবারে ভিক্ষেয় আসা চাই। বিরজা চুপ করে থাকে। বারান্দায় এসে বসবে ও—ঝোলাঝুলি খুলবে—সুপুরি থাকলে পান থাকবেনা, পান থাকলে খয়ের লাগবে, নইলে চুণের ডিবিতে একটু জল। ডাকাডাকি সুরু করবে যখন, বেরোতেই হবে বিরজাকে। যতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়!

"মাগো—"। ডাক আসবেই। বিরজাকে উঠতে হয়।

বেতের ঝাঁপিতে করে তিনমুঠো চাল নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় বিরজা। আজ আর ঝোলাঝুলি খুলে বসেনি বৈষ্ণবী—ঝোলার মুখে পেতলের ঘটিটা দেখা যাচ্ছে—চালে প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে—তিনমুঠোতে একদম পুরো হয়ে যাবে! পুরো হয়ে গেলেই একটা ফল দাও—কাঁচকলা, বেগুন, ঝিঙে, কি একটা সুপুরি! ওটা ওর চালাকি তবে মাসে একদিনের বেশি এ-চালাকি করেনা, বিরজা তাই ওটাকে আর চালাকি মনে করে না। তাছাড়া আজ যে সে বৈষ্ণবীকে একমুঠো বেশি চাল আর পান-সুপুরি দেবে তা ত আগে থেকেই

ভেবে রেখেছিল। তিতুর জ্বর ছেড়ে গেছে বলেই দেবে।

"খোকার অসুখ ভালো হয়েছে মা?" রোগা চোখগুলো আরো রোগা করে তোলে বৈষ্ণবী। তারপর আঁচল দিয়ে চোখগুলো মুছে আনে।

"জ্বরটা ছেড়েছে!"

"ভালো—ভালো!" বৈষ্ণবী বুক ভরে নিশ্বাস টানে।

চালটা রেখে পান আর সুপুরি আন্‌তে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল বিরজা। বৈষ্ণবীর অন্ধ ছেলেটার কথা সে ভুলে গিয়েছিল—মনে পড়ল। লাঠি ধরে মার পেছনে-পেছনে এসে দাঁড়াত ছেলেটা—ভুরু-উঁচিয়ে ডাকত: "তোমার অন্ধ এসেছে মা—"। ক'মাস হ'ল যেন মারা গেছে। ক' মাস হ'ল তার মনে নেই। অন্ধের মা বলতে পারবে। অনেকদিন হয়ে গেলেও বলতে পারবে! অন্ধ বলে ছেলেটাকে কোনোদিন হেলাফেলা করেনি বৈষ্ণবী—হেলাফেলা করতে দেখেছে বলে বিরজার মনে পড়েনা! ছেলেটা মরেছে পর থেকে আরো যেন শুক্‌নো হয়ে গেছে ওর শরীর। দু'দিন কেঁদেছিল বিরজার কাছে—তারপর আর কাঁদেনি। না কেঁদে মা-রা থাকতে পারে? আড়াই বছরের একটি ছেলে মারা গিয়েছিল কবে—নিরুপমার মা আজও কাঁদে—ছেলেরা ব্যথা দিয়ে কথা বললে ওই ছেলেকে ডেকে-ডেকে কাঁদে! গলার ভেতরটা শুকিয়ে ওঠে বিরজার—তিতুর দিকে তাকায়। গলাটা ধুকপুক্‌ করছে ওর—কিন্তু ঘুমিয়ে আছে। মিতু নেই—বারান্দায় চলে গেছে।

"ছি-ছি খোকা ও-কথা বলতে নেই—" বৈষ্ণবী অনুরোধ করছিল মিতুকে।

"বলবইত! দেবনা চাল!"

"ঘ্যাথ—ঘ্যীখ—" বিরজা ছুটে এলো : "হাড় গুড়ো করে দোব তোমার—শয়তান!"

রণে ভঙ্গ দিয়ে দুর্গে দৌড়ুলো মিতু—তিতুর বিছানার পাশে এসে আশ্রয় নিলে।

"ষাট্—বেঁচে থাক—" একটা ফ্যাকাশে হাসিতে বৈষ্ণবী চাঙ্গা হয়ে উঠতে চাইল : "ছেলেমানুষকে গাল দিতে নেই মা—"

"কি বল! ওর বুড়োমির জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলাম!"

হাত পেতে পান-সুপুরিটা নিয়ে বৈষ্ণবী বললে : "শনি-মঙ্গলবারে কলাপাতায় করে চাট্টি ভাত তুমি কাককে দিও মা—ছেলেদের আপদ থাকিবে না!"

"কাকে এসে আপদ নিয়ে যাবে—" নাকে খানিকটা হাসি ঝাড়ল বিরজা।

"দিও—দেখবে!"

"আবার একটা যন্ত্রণায় ফেললে আর কি!"

বৈষ্ণবী কথা বললেনা—ঝোলাঝুলি গুছোতে লাগল। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বিরজা। পুরুষের মতো ছাঁটা চুলগুলোতে পাক ধরেছে—বুড়ো হয়ে যাচ্ছে বৈষ্ণবী। বুড়ো মানুষের কথা ধরতে হয়—বিরজার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছে, অনেক বেশি শুনেছে ও—বিরজা আর কতটুকু জানে! বৈষ্ণবীর কথা রাখবে সে—ক্ষতি ত নেই কিছু—শুধু শনি-মঙ্গলবারটা মনে রাখা।

বৈষ্ণবী উঠে দাঁড়াল। যাবে বলেই দাঁড়াল কিন্তু যাবার আগে কি একটা জরুরী কথা মনে পড়তেই যেন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

"কাল রাত্তিরে বড্ড পুলিশের ঝামেলা গেছে মা পাড়ায়। বৈরাগী মানুষ আমরা, কি করেছি বলো!"

"কি করেছ!" বিরজা প্রতিধ্বনি করলে।

"বলে আসামী এসে লুকিয়েছে তোদের পাড়ায়!"

"আসামী লুকোলে তোমরা জানবে না?" বিরজার মনে হল তার জিভ শুকিয়ে আসছে।

"জানব না!"

"তবে?"

"দু'টি ভদ্দরলোকের ছেলে জগন্নাথপুর যাচ্ছিল—পাড়ায় ঢুকে জল খেয়ে গেল—বলছে ওরাই আসামী!"

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টে দিল বিরজা। কিন্তু বৈষ্ণবী খুসী হয়ে চলে গেল পরও খানিকক্ষণ সে বারান্দায়ই দাঁড়িয়ে রইল। ভঙ্গী করে অবিশ্বাস দেখালে কি, মনে-মনে ত বুঝতে পারছে বিরজা ওরাই রেবতীবাবুকে গুলি করেছে—তারপর পালিয়ে গেছে—পুলিশ খোঁজ পায়নি। কালও আবার বেশি রাত্রিতে বাড়ি ফিরেছিল মোহিনী—সে-ও কি আসামীর খোঁজে গিয়েছিল না কি? কিন্তু বৈষ্ণবী ত তাকে চেনে—গেলে হয়ত বলত। কিন্তু না গেলে তালাসির কথাটাও বা সে বলতে গেল কেন হঠাৎ? জানেনা বিরজা—কিচ্ছু বুঝতে পারে না! মোহিনীকে নিয়ে কি যে হবে বুঝতে পারেনা! কি যে করবে. বুঝতে পারে না!

চার

১

ঢেঁকি-ঘরে মেয়েদের একটা জটলা বসে গিয়েছিল। ঘরটা গিন্নী-ঠাকরুণ প্রায় এজমালি করে দিয়েছেন—যার যখন খুসী এসে মুড়ির ধান ভেনে নেয়—প্রথম-প্রথম দু'একদিন গিন্নীর খোঁজ করে তারপর আর তাঁকে জিজ্ঞেস করবারও দরকার হয়না। কাজে-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন গিন্নী, পুষ্যি ত, ষাট্, একটি-দুটি নয়—তাঁর সঙ্গে আজেবাজে দু'-দশ কথা বলে ওরা সেই ত ঢেঁকি-ঘরে গিয়েই ঢুক্‌বে—তারচেয়ে সরাসরি ঢেঁকিঘরেই চলে যাও, জিজ্ঞাসা-বাদের দরকার নেই। ঢেঁকি আছে বলেই ত আস্‌ছ—ঢেঁকির জন্যে যে সবাই ঘর তুল্‌তে পারেনা গিন্নী তা জানেন। গল্প করো, গুজব রটাও, ধান ভেনে নাও—গিন্নীকে ডাকাডাকি করো না। তাঁর যখন মর্জ্জি হবে মুচকি হেসে তোমাদের কাছে এসে একটু দাঁড়ালেন, তাঁকে খুসী করবার জন্যে যে তোমাদের মধ্যে কথার কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে বরং ওটা দেখতেই তাঁর ভালো লাগে।

যুগল-মিস্ত্রীর বউকে নিয়ে ফণীমোক্তারের দিদি এসেছিলেন সেদিন ও পাড়া থেকে। মাষ্টার-গিন্নী ছেলে-দুলে এসে দাঁড়ালেন—ছেলেমেয়েগুলোর জ্বালায় ঘুম যখন হবেনা, নিরিবিলিতে একটু গল্প করে যাওয়া যাক! নিরুপমা এলো—বুড়োদের মধ্যে কেউ এসে জোটেনি বলেই এলো। বিধবা বলে কি, মোক্তারের দিদির মুখের লাগাম নেই। কিন্তু বেশ লাগে ওঁর কথাগুলো শুন্‌তে, ছিঃ-ছিঃ

নলিনীর জুটতে পারলে তার জুটবেনা, সে কি হয়? বরাত খারাপ-টারাপের দোহাই পাড়েনা নিরুপমা। বড় হয়েছে যখন, বিয়ে তার হবেই আর বাপ-মা তার জন্যে রাস্তা থেকে কুড়িয়েও বর আনতে যাবেন না। কিন্তু এ-আলাপে যুগলের বউ-ও যখন নাক ঢোকাচ্ছে, তার এখন গম্ভীর হয়ে যাওয়াই ভালো।

"টাট্টু ঘোড়ার কথাটা যে চেপে যাচ্ছেন দিদি—" নিরুপমা কপাল থেকে একটা চুল কুড়িয়ে নিয়ে আঙুলের ডগায় জড়াতে সুরু করল।

"লাগাম নিয়ে আসব আরেকদিন—সেদিন হবে!"

"ও ঘোড়া লাগাম পরতে চাইলে ত!" মাষ্টার-গিন্নী বিজলীর মতো চোখে-মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"চরে খাবে লাগাম পরবে না, তাই না কি?"

"চুপচাপ চরে খেতেও দেবেন না?" নিরুপমা অন্যমনস্কের মতো বললে।

"চুপচাপটা দেখলে কোথায়?"—দিদি এবার মুখ ফেরালেন: "কোবরেজের অষুধগুলো না কি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন!"

"দেবীটি ত ও-ই আর দেবা-টি যে কি তা জানেন না বুঝি?"—মাষ্টার-গিন্নী ফণা তুলে দাঁড়াল: "জ্যোৎস্নাবাবুকে ধরিয়ে দিলেন পুলিশে! ব্বানাঃ, পুলিশের লোককে পাড়ায় রাখা না সাপ নিয়ে ঘরে থাকা!"

"বটে!" মুখে ধমক এনেও দিদি আবার কুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

"ও-কথা ঠিক নয় বৌদি! মা বলেন বটে—আমার মনে হয়না! রাঙা-দা ধরা পড়তেনই!"—কেমন যেন একটু কালো হয়ে গেল নিরুপমা।

করে উঠতে হয় তবু নিরুপমা শুনতে চায়, শুনতে আসে, এসে দাঁড়ায়।

মোক্তারের দিদি মুখ তোলেন না, ঢেঁকির পায়ার গর্ত্তে হাত বুলোতে- বুলোতে বলেন: "তোদের নূতন পড়শী না কি টাট্টু ঘোড়া লো নিরু—"

মাষ্টার-গিন্নী খিল্-খিল্ করে হেসে ওঠে।

"তাই যদি হয় আপনি আসবেন মাঝে-মাঝে লাগাম চড়াতে—" নিরুপমাও হাসতে থাকে।

"আপনার কানেও গেছে ও-কথা?" মাষ্টার-গিন্নী একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

"ফুল ফুটলে তার গন্ধ ছড়াবেই—" দোক্তাপাতায় কাল্‌সে মাড়ি বিকসিত হয়ে উঠল মোক্তারের দিদির: "আমাদের রূপসী নিরুর রূপের খ্যাতি সহরময় রাষ্ট্র হয়নি?"

"আপনার দিনে আপনার খ্যাতিও কি কম ছিল?" নিরুপমা ঘাবড়ালোনা।

"খ্যাতি ত বুঝলাম—" মাষ্টার-গিন্নী ব্যস্ত হয়ে পড়ল: "দিন না নিরুর একটি ভালো বর এনে!"

"আমাদের পছন্দে কি আর নিরুর মন উঠবে!"

"ও মা—" বৌ-ঘোমটার নীচে যুগলের বৌ-এর মুখ ফুটল: "কেমন ফুটফুটে বর আনলেন জ্যেঠাইমা—নলুর জন্যে!"

ফণীমোক্তারের বোনের বিয়েতে নিরুপমা গিয়েছিল—নলিনীর বরকে দেখেছে, ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করেছে! বরটি যে ভালো জানে সে—মনে পড়লে তাকে ভালোই মনে হয়। ভালো বরের অভাব কি—হয়ত অভাব তার বেলাতেই! তবে একদিন এসে জুটবে

"খবরটা বেরোলেই দেখবে—" মাষ্টার-গিন্নী দমে গিয়েও বলতে ছাড়লনা।

খানিকক্ষণের জন্যে সবাই চুপচাপ হয়ে গেল। ভাগ্যিস চুপ করে গেল সবাই নইলে কি যে ব্যাপার হ'ত—লজ্জায় নিরুপমা মুখ তুলতে পারছিলনা। বিরজা বৌদি এসে হাজির! কাকে খুঁজে-খুঁজে যেন উঠোন পার হয়ে চলছিলেন—ঢেঁকি-ঘরের জটলা দেখে একটু থামলেন। কোনোদিন ত আসেন না—আজ আবার—আবার ঠিক এম্নি সময়ে, উনি আসতে গেলেন কেন? নিরুপমা বুঝতে পারছিল শুধু সে-ই নয় মাষ্টার-গিন্নীও যেন চোখে-মুখে পাথর বনে গেলেন! শুধু থপ্-থপ্ ঢেঁকির পাড় চলতে লাগল।

বিরজা অবশ্যি দাঁড়াতে আসেনি—তাই দাঁড়ালনা। নিরুকে দেখেই ভেবেছিল একটু থেমে দু'চারটে কথা বলে যাবে।

কোবরেজগিন্নীর সঙ্গে দেখা করবে বলে বাড়ি থেকে বেরোনো তার। যাবে-যাবে ভাবছে অনেকদিন, যাওয়া হয়নি। মা এসেছেন, দুপুরটায় এখন সত্যিকারের অবসর। অবসর মানে বাসার ভাবনা, মিতুর ভাবনা নেই। মিতুকে নিয়ে কোথাও বেরোবার কি উপায় আছে? এটা-কি, ওটা-কি, এটা-এমন-কেন, ওটা-অমন-কেন, এই সাতসতেরো প্রশ্ন করে সর্ব্বক্ষণ জ্বালিয়ে মারবে! আর যদিও বা চুপ করে থাকে তাহলে সেই সর্ব্বনেশে প্রশ্ন: "মা, এরা খেতে দেবেনা?" কী লজ্জা! মুখে হাত চেপেও নিস্তার নেই—কথাটা শুনিয়ে দেবেই। দিদিমার কাছেই থাকে ও ভালো—নাড়ু, মোয়া, সরভাজার গল্প শুনে-শুনে দিব্যি একটা ঘুম দিয়ে উঠবে।

ওরা চুপ করে গেল! কোবরেজের বাসায় ঢুকতে গিয়ে মনে পড়ল বিরজার। কোবরেজগিন্নী-ও বা কি করবেন কে জানে!

রাগ করে ত নিশ্চয়ই আছেন, আর তারি জন্যে বিরজার আসা। মোহিনী বলেছে, যাঁকে দিয়ে আগাগোড়া চিকিৎসে চল্‌বেনা তাঁকে কেন ডাক্‌তে গেলে! বিরজা কি জানত নাকি সামান্য একটু জ্বরে যে ডাক্তার লাগিয়ে ছাড়বে! জ্বর যে এতো কঠিন অসুখ হতে পারে, তা-ও বা কে জানত?

বিরজাকে উঠোনো এসে দাঁড়াতেই দেখে কোবরেজগিন্নী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বয়েসে বিরজার চেয়ে দু-চার বছর বড়ই হবেন তবু মাথায় ঘোমটা টেনে দিলেন।

"আসুন, ঘরে আসুন—" হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন কোবরেজ-গিন্নী!

অবাক হল বিরজা, লজ্জিত হল, কৃতজ্ঞতায় ফর্সা হয়ে গেল। হাসতে চাইল, হাস্‌লও কিন্তু সে হাসি যেন দিশেহারা।

একটা মোড়া টেনে দিয়ে কোবরেজগিন্নী বললেন: "বসুন!"

কেবলই মনে হচ্ছিল বিরজার মানুষটাকে যেন সে এ-রকম জানত না। ঠিক অম্বিকা মোক্তারের বড়গিন্নীর মতো। অবিকল তেম্নি কথা—আসুন, বসুন—গলার স্বরটাও তেম্নি। কিন্তু বড়গিন্নীর চেয়ে চট্‌পটে।

"আপনাদের দেশ বিক্রমপুর, না?" মোক্তারগিন্নীর সঙ্গে এর মিল খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিরজা।

"হেঁ। কি করে বুঝলেন!"

"ঠিক আপনার মতো আমি একজনকে চিন্‌তাম—ওঁর দেশ বিক্রমপুর!"

"একটা জায়গার সব মানুষ কি একরকম হয়!"

"মিশ্‌তে একই রকম।"

"নাঃ।" কোবরেজগিন্নী জোরে একটা নিশ্বাস ফেল্‌লেন।

কেন নয়? বিরজা ভেবে পায় না। সোনার মা, শৈল—ওরাও ত বিক্রমপুরেরই লোক—মিশে কি দেখেনি বিরজা? একই রকম মিশুক সবাই—সবাই একই রকম ভালো।

"আপনারা এদেশেরই? তাই!" গম্ভীর মুখে প্রশ্ন আর উত্তর সাজিয়ে যান কোবরেজগিন্নী।

"কথায় বোঝা যাচ্ছে বুঝি!"

"এ-পাড়ায় থাকতে পারবেন?"

মুখ শুকিয়ে উঠল বিরজার: "কেন?"

"আপনাদের দিশি লোক কেউ নেই—ভালো লাগবে থাকতে?"

"সহরে থাকতে গেলে দিশি লোকই পাব তা কেন!" বিরজার ভয় ভাঙলনা।

কোবরেজগিন্নীর গলা বিষণ্ণ হয়ে উঠল: "পাড়াটা ভালোনা!"

হিম হয়ে গিয়ে তাকিয়ে রইল বিরজা।

"আপ্‌নি নূতন এসেছেন—জানেন না ত আমাদের—আমরা লোক ভালো নই!" কোবরেজগিন্নী হাস্‌তে লাগলেন।

হাস্‌তে গিয়েও বিরজা হাস্‌তে পারলনা।

"দেখতে পাচ্ছেন না, যার যা-খুসী রটনা করে বেড়াচ্ছে!" একটু থেমে যেন ঘোর অনিচ্ছায় আবারও মুখ খুললেন কোবরেজগিন্নী: "আপনার নামে কতো কথাই শুনেছি—আমার নামেও হয়ত অনেক কথা শুন্‌ছেন!"

"অন্যায় করেছি বলেই আমার নামে কথা শুন্‌ছেন!"

"অন্যায় কে না করে বলুন! যারা রটায় তারাও কি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির? আপনি বলে ত বললেন অন্যায় করেছেন—এ-পাড়ায় আছে আর কেউ যে নিজের অন্যায় মেনে নেবে!"

"অন্যায় করলে কেন বলবনা বলুন! অসুখটা ওর বেড়ে গেল, ওর বাবা এসেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন—কোবরেজ-মশাইকে আমি আর খবর পাঠাতে পারলামনা!"

"আমি জানি—" এবার আর কোবরেজগিন্নী হাওয়ায় গুলি ছুঁড়তে চেষ্টা করলেন না—গলার স্বর নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন: "গিন্নীঠাকরুণ একটি বিষের কলস। কি করব, টাকা আছে, লোকজন আছে—উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে গালাগালি করে গেলেও সয়ে যেতে হয়! সয়ে যাচ্ছিও।"

"নিরুর মা আপনাকেও কিছু বলেছে বুঝি?"

"আমাকে!" হতাশায় নিশ্বাস ফেললেন কোবরেজগিন্নী: "আমি ত ওর কাছে ভারি একটা মানুষ! আমাদের কর্ত্তাকে পর্য্যন্ত মুখে যা-আসে বলে দেয়!"

বিরজা অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কে যে কেমন মানুষ কি করে বোঝা যাবে! বেড়ার ওধারে নিরুর মার সঙ্গে কোবরেজগিন্নীকেও ত দেখেছে বিরজা হাসিঠাট্টা করতে! নিরুর মা যদি মন্দই হবেন তবে ইনি বা তাঁর সঙ্গে গিয়ে জুটেছিলেন কেন? অবশ্যি নিরুর মাকে ভালো বলছেনা বিরজা—কিন্তু ভালোও যে তিনি হতে পারেন তা-ওত সত্যি। কোবরেজগিন্নীকেও ত এখন তার ভালোই মনে হচ্ছে। মানুষ যেমি ভালো হতে পারে তেমি খারাপও হতে পারে। মা কি তাকে বলেনিনা, আমার রাগী মেয়েই সবচেয়ে ভালো? বিরজার রাগটা ত আর ভালো জিনিষ নয়!

"ওদের কাছে কখন যে কে ভালো হয়ে উঠবে—কে খারাপ বনে যাবে—" কোবরেজগিন্নী এবার ঠিক স্বাভাবিক গলায় ফিরে এলেন: "তার ঠিক নেই!"

বিরজার কানে কথাটা এমন কিছু অদ্ভুত শোনালনা।

"পরশু বলছিল—" আবারও গলা নেমে এলো কোবরেজগিন্নীর: "দারোগা এসে পাড়ায় ঠাঁই নিয়েছে—আমাদের কি আর সোয়াস্তি থাক্‌বে!"

"কেন?" অত্যন্ত স্পষ্ট শোনাল বিরজার প্রশ্নটা।

"ওদের কোন ছেলে পুলিশে ধরা পড়েছে কাজেই দারোগারা সব খারাপ হয়ে গেলেন!"

"ও!" নিজেকে সাম্‌লে নিল বিরজা: "ও-চাক্‌রিরই ভাগ্যি এরকম, দিদি, কি করব আর!"

"বেশ বলেছো—" কোবরেজগিন্নী অন্তরঙ্গ হয়ে হাস্‌তে লাগলেন। "বল্‌বনা কেন—তা-ই দেখছি!"

"আমিও বলি তোমাদের কবরেজ-মশাইকে, পাশ-করা কতো বড় বড় ডাক্তর বেরোচ্ছে আজকাল, তুমি এ পাচন-সেদ্ধ করতে গেলে কেন? শুনে হাসেন, বলেন, বাপ-দাদার অতবড় বিদ্যেটাকে হেলা করব?"—মুচকি হাসিতে চোখে কৌতুক ফুটিয়ে তোলেন কোবরেজ-গিন্নী: "শ্বশুরঠাকুরের বিশ-পঞ্চাশটা গাঁয়ে দেবতার মতো খ্যাতি ছিল ত—নাম শুন্‌লেই সবাই ধন্বন্তরী বলে কপালে হাত ঠেকাত!"

"এখানেও ত কবরেজ-মশাই-এর খুব নাম!"

"বংশের বিদ্যে আছে বলেই—"

"দেশে এতোগুলো রোগীর ঘর ফেলে আপনারা সহরে চলে এলেন যে!"

"ছোট ভাইকে সব দিয়ে-থুয়ে চলে এলেন উনি—বল্‌লেন, কর্ত্তাদের অশীর্ব্বাদে যে-বিদ্যে আমার আছে তাতে কোথাও গিয়ে আমায় জলে পড়তে হবেনা!"

"হু"—সম্মতির মতো করেই অন্যমনস্কতা ফুটিয়ে উঠে দাঁড়াল বিরজা: "আজ যাই দিদি—মা একা বাসায় আছেন—বুড়োমানুষ—ছেলেদের সামলাতে গিয়ে হয়ত অস্থির হয়ে উঠেছেন!"

"নাকি তুমি অস্থির হয়ে উঠেছ পাঁচমিনিট ছেলেদের না দেখে?—নতুন মা-র জ্বালা অনেক!" কোবরেজগিন্নী প্রায় হাততালি দিয়ে উঠলেন।

হাঁটতে সুরু করেও বিরজা ক্ষাণিকক্ষণ থেমে রইল। সোনার মার মতোই কি শোনা গেলনা কোবরেজগিন্নীর গলা?

২

বাড়ি আসতে-আসতে বিরজা ভাবছিল কোথাও আর সে বেরোবেনা—কারো বাড়ি গিয়ে তার কাজ নেই। সব জায়গায় সেই এক কথা—সেই একই খোঁচা মনকে খুঁচিয়ে দেয়। মোহিনীও চাকরি ছাড়বে না, তারও আর রেহাই নেই! প্রায় একঘরে হয়ে উঠল তারা। নিরুর মা আবার হয়ত ক্ষেপে উঠবেন, কর্ত্তামশাই 'হু'-'হু' করে গজরাতে সুরু করবেন—ওঁদের ছেলে ধরা পড়েছে, চুপ করে থাকতে যাবেন কেন ওঁরা? যতীনকে ধরে নিয়ে গেলে কি রাগ হতনা বিরজার? ওঁদের কি দোষ—মোহিনীকে নিয়েই যতো মুস্কিল হয়েছে তার।

দুপদাপ করে বারান্দায় এসে উঠল বিরজা। দুপাশে তিতু-মিতুকে নিয়ে মা টেকোতে পৈতের সুতো কাটছিলেন।

"তোমার জামাইকে কিছু বলবে, মা?" ঝগড়াটে ভঙ্গীতে বিরজা মাথা দুলিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে আনল।

ভাঙা-ভাঙা হাসিতে মা মুখ তুললেন।

"চাকরিটা ছাড়তে বল। মানুষকে জ্বালাতন করবার চাকরি না হলেও ভাত জুটবে!"

ছোট করে জিভ কাটলেন মা: "আমি বলব?"

"কেন বলবে না? হেনো-তেনো বলে লোকে আমায় জ্বালিয়ে মারবে, বলবেনা কেন তুমি?"

"হেনো-তেনো বলাই ত লোকের অভ্যেস—" মা আবার টেকোতে মন দিতে চাইলেন।

"বেশ, লোকের অভ্যেস নিয়ে থাক' তুমি—" বিরজা ঘরে চলে গেল।

এতক্ষণ মার দিকে লকলক্ করে তাকিয়ে থেকে তিতুর চোখ যেন কেমন অবশ হয়ে যায়—সরু ঘাড়ে মাথার বোঝাটাও ভারি মনে হয়। ঝপ করে মুখটা নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে তিতু একটা ঢোঁক গিলে নাকি আওয়াজে বলে: "তিন দিন ঘরে আটকে রাখবে?"

দিদিমা ভাঙা-গল্প জুড়ে দেন: "পৈতের পর দণ্ডী হয়ে গেছ—ব্রাহ্মণ হয়েছো—শরীরে ব্রহ্মতেজ আছে যে—"

"ব্রেমণ তিপ—" দিদিমার খড়িমাটিটুকু নিয়ে আঙুলের ডগায় ঘষতে ব্যস্ত থাকে মিতু।

"হাঁ—ব্রাহ্মণ—"

"খেতে দেবেনা কিছু?" ভবিষ্যৎ দুর্দশার চিন্তায় তিতুর মন আকুল হয়ে ওঠে।

"হবিষ্যি খাবে ফলফলারি খাবে—দুধ—খাওয়ার অভাব কি?"

"ওকে তুমি আর লোভ দেখিও না মা—" ঘরের ভেতর থেকে বিরজা হেঁকে উঠল: "এখন থেকেই আমার পেছু নেবে খাই-খাই করে!"

দিদিমা টেকো রেখে তাড়াতাড়ি তিতুর মাথায় দু'হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন : "ষাট্! ভালো হয়ে নাও—তোমায় কুমড়োর বীচির নাড়ু করে দোব—ক্ষীরের সেওয়াই দোব!"

"আমায়?" মিতু ঘাড় বাঁকিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে তাকায়—ঠোঁটের ভেতরে জলের রেখা দেখা যায়।

"তোমাকে ছাতুর নাড়ু—আমার মতো দাঁত নেই ত সব ক'টা তোমার!"

"দাঁত হবেনা?"

"হবেনা? মুক্তোর মতো দাঁত হবে!"

"তোমার দাঁত হবেনা?"

"তোমার বোন হয়ে যখন আসবো—তখন হবে!"

"এখন আসবে না!"

"যা—এ" তিতু সুর ধরে মিতুকে থামাতে চায় : "বকর-বকর করছে শুধু!" কপালের রেখাগুলো তার মিলাতে চায়না : "ভিক্ষে করে টাকা পাওয়া যায়, দিদিমা?"

"হাবুল পায়নি? পঞ্চাশ টাকা পেয়েছে!"

"আমিও পাব?"

"কেন পাবেনা?"

"আপনি দেবেন?"

"দোব!"

"মা?"

"মার কাছে কি ভিক্ষে চাইতে হয়?"

মিতু চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বলে : "আমাকে—মা—এট্টা পয়সা—দিয়েছে—কাল!"

আলনাতে কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখছিল বিরজা—দিদিমার সঙ্গে নাতিদের গল্পগুজব কানে হয়ত ভালোই লাগছে—নইলে ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে আসছে কেন তার মন? মন শান্ত না হলে যত্ন করে কাপড়-জামাও পাট করা যায়না। কোবরেজগিন্নীর মনটা ঠাণ্ডা, নইলে ওরকম ফিট্‌ফাট্‌ রাখ্‌তে পারতেননা ঘর। উঠোনের পাশে ডেগ-কড়াই, শুক্‌নো লতাপাতা, মূলশেকড়ের স্তূপগুলোও বা কত ফিট্‌ফাট্‌। আর বিরজার আলনাটা কি হয়ে আছে! একা মানুষ সবদিক গুছিয়ে তুল্‌তে পারেনা বলে হয়ত দায় এড়ান যায় কিন্তু নিজের কাছে কি এ-জবাব চলে? অবসর তার খুবই আছে—আস্‌ল কথা মন নেই। তাছাড়া জান্‌তওনা বিরজা—কাপড়-জামা, তোষক-বালিশ, ট্রাঙ্কতোরঙ্গ যে এত চমৎকার গুছিয়ে রাখ্‌তে হয়, তা-ই জানতনা। এখনও কি সে কোবরেজগিন্নীর মতো কাপড়গুলো কুঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবে—ততো সরু কোঁচানোয় আঙুলই তার রপ্ত নয়। কাপড়-জামার এতো চলন মার আমলে ছিলনা তাই তার যত্নও শিখতে পারেনি মার কাছে। মাত্র ত সেদিন শৈল'র কাছে জামা তৈরী করতে শিখল বিরজা। কতো ধন্না দিয়ে বাচ্চাদের জামা-কাটা-টুকু শিখতে হয়েছে—শৈল তখন লেস্‌ তৈরী শিখছে, শেখাবার অবসর নেই। খানিকটা শিখে নিয়ে নিজের মন থেকেই বাকিটুকু আবিষ্কার করে নিতে হয়েছে বিরজাকে। মিতুর জামাটা তাই ঠিক জামা হয়নি, তবে পরানো যায়! গা ঢাকা ত থাকে, তাছাড়া দুভাঁজ কাপড় গলায় বেঁধে দিতে হয়না—তবেই হল! ছেলেমানুষের জামায় যতীন ছাড়া এতো খুঁত ধরতে আর কে যায়? আর খুঁতও বা এমন কি বেশি? কল্‌কাতা থেকে সরযূ তাকে যে-জামা পাঠিয়েছে —গিলে ঘষে বিরজা তার কুঁচির মতোই ত জামার হাতায় অনেকটা

কুঁচি তুলেছিল—কিন্তু সে-জামার সবটুকু কারিকুরি ত আর তোলা যায়না! এখানকার দরজিরাও তা পারবে না! বিরজার আর কি দোষ?

আলনা-সাজানো হয়ে গেল কিন্তু এতো নোংরা কাপড়-জামায় কি সাজানোটাই ভালো দেখায়? হাবুলেরই কাপড়-জামা বেশি, ময়লা করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তবু ভালো, ময়লা কাপড় পরবার অভ্যাস যে হয়নি ছেলেটার। কিন্তু ধোপা এম্নি কামাই করতে সুরু করলে কি করে চলবে? পনেরো-কুড়ি দিনের আগে তার দেখা পাওয়া দায়—বর্ষায় আর ধান উঠবার সময় ত একমাস-দেড়মাস পাত্তাই মিলবে না তার! সহরতলীর গেরস্ত মানুষ, দুচারটে কাঁচা পয়সার লোভে এ কাজ করে—কাজে তার গরজ মোটেই নেই। বুড়োমানুষ বলে বলতে লজ্জা করে বিরজার নইলে কাজ ছেড়ে দেবার কথা কবেই সে বলে ফেলত। কিন্তু বললেই কি কাজ ছেড়ে দেবে ও? শ্বশুরের আমল থেকে কাজ করছে বুড়ো, হয়ত ফিরে একটা ধমকই দিয়ে দেবে। মোহিনীকেই মানেনা আর তার সঙ্গে ত দু'দিনের পরিচয়। কাঁথা-চাদর-বালিশেরঅর, আলাদা কাপড়চোপড় নিজেই সোডা দিয়ে সেদ্ধ করে নেয় বিরজা—ধোপার জন্যে বসে থাকে না। কিন্তু তাতেও পার নেই—বুড়োর নজর টনটনে—একটা কিস্তিতে কাপড় কম হলে বলে ফেলবে: "দু'খানা কাপড়ের জন্যে দু'মাইল হেঁটে আসব?" বিরজা ব্যস্ত হয়ে যতীনকে ডেকে বলে: "বুড়োকে পান দে যতীন—"

সহরের কতো দস্তুরই শিখতে হচ্ছে বিরজাকে—আর শিখেও নিচ্ছে সে অনায়াসে। মার পাশে দাঁড়ালে সে এখন আলাদা মানুষ। তার দিকে তাকাতে মা যেন হকচকিয়ে যান, যেন সবসময় বুঝতে পারেন না তাকে। বুঝতে না পারারই কথা। কিন্তু অবাক করেছে

সরযূ। চালচলন অবশ্যি তার বদলে গেছে—কিন্তু তাতে যেন তার মন নেই—মন বদলায়নি একটুও। কলকাতাটা ভালো লাগছেনা তার। অবশ্যি আটদশদিনের জন্যে বেড়াতে গিয়ে বিরজা বলতে পারেনা স্থায়ীভাবে থাকতে গেলে তারও ভালো লাগত কি না! কিন্তু নূতন, অন্যরকম বলেই যে ভালো লাগবেনা, সে কি কথা? নূতন একটা কিছু দেখতে-শিখতেও ত আনন্দ! কোবরেজের বাসা থেকে যে সে আজ আলনা-গুছোনো শিখে এলো, তাতে কি তার ভালো লাগছেনা?

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বিরজা—চোখমুখ শান্ত হয়ে গেছে।

"একটা পৈতে কিন্তু রেখো মা—" বিরজা মার কাছে এগিয়ে গেল: "দুর্গাবাড়িতে তিতুর মানত আছে—সেদিন পুরুতকে দিতে হবে!"

"এসেই ত আমি যতীনকে দিয়ে ঠাকুরমশাই-এর জন্যে একজোড়া পৈতে পাঠিয়ে দিয়েছি!"

"আবার তাহলে কার জন্যে সুতো কাটছ?"

"যতীন আর হাবুলের লাগবে না?"

"যতীন? ভালো বামুনই ঠাওরেছ তুমি যতীনকে!" নিজের খুসীতেই বিরজা হাসতে সুরু করল।

পাঁচ

১

ছোট্ট বাসাটা সরগরম হয়ে উঠ্‌ল। সদরে মোকদ্দমার একটা তদ্বির ছিল, যোগেশবাবু এসেছেন—যাবার সময় যতীনকে নিয়ে যাবেন। চিঠি লিখ্‌লে ছেলে যাবেনা তাই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছেন। তিতুর অসুখের খবর পেয়ে যতীনের জন্যে একটু চিন্তা হয়েছিল তাঁর—পিঠাপিঠি মেয়েটা গেছে, কে জানে ওরও কি হবে! কিন্তু ভাবনা হলেও উপায় ছিলনা, তিতুর অসুখের মধ্যে যতীনকে আস্‌তে বলা যায়না—বল্‌লেও যতীন মাসীমাকে একা ফেলে যাবার ছেলে নয়। অসুখবিসুখ চুকে গেছে এখন—এখন আর তার যেতে বাধা নেই। তাছাড়া মোহিনীর নতুন বাসা-টাও দেখা হয়নি, শাশুড়ীঠাকরুণের সঙ্গেও দেখা নেই অনেকদিন—তারপর মোকদ্দমার তদ্বির—সব মিলিয়ে যোগেশবাবু যাত্রার একটা সুগোল কারণ তৈরী করে নিয়েছেন। যতীনের মা-ও একবার আস্‌বে বলেছিল—মা, ভাই, বোন্‌, সবাইকে একসঙ্গে দেখ্‌তে পাবে তাই। বোনদের বাড়ীতে শঙ্কর কিছুতেই যাবেনা, মা-কে নিয়ে যেতে এসেছে এবার এখানে, নইলে তার দেখা পাওয়া ভার। বিরজাও জানে। টোলের দোহাই পাড়ে শঙ্কর কিন্তু বিরজা জানে, বড়লোক বোনদের বাড়ীতে সে আস্‌বেনা। বড়লোক! দিদির অবশ্যি অবস্থা ভালো কিন্তু ভাতকাপড়ের অভাব নেই বলেই কি মোহিনী বড়লোক? শাশুড়ী-ঠাকরুণের টাকা আছে কিন্তু বড়লোক বল্‌বার মতো টাকা কই—বাসা

কিন্‌তে ছেলেকে তিন শ' টাকা দিয়েছেন তাতেই ঢি-ঢি পড়ে গেছে। কিন্তু মোহিনী যে ফিরিয়ে দেবার কড়ারেই যার কাছ থেকে টাকা এনেছে, তা কি কেউ জানে? বাতিকে ধরেছে শঙ্করকে। ও পণ্ডিতমূর্খ হবে। সাতকথা বল্‌লে এককথার জবাব দেয়—এবয়েসে এমন গাম্ভীর্য্য মানায় না—পাগল-টাগল হয়ে যাবে না কি কে বল্‌বে! দাদামশাই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, যার একটা ভয়ই আছে শঙ্করকে নিয়ে। তবে শঙ্করের অষুদ যতীন। মামাকে একমুহূর্ত্ত চুপচাপ থাক্‌তে দেয়না সে। বেশ হয়েছে! যখনই হাততালি দিয়ে যতীন হাস্‌তে সুরু করে, বিরজা শুনেই বুঝ্‌তে পারে শঙ্করের গরীবানার দেমাকে ঢিল পড়ছে। বিরজা ছেলেমানুষের মতো মজা পায়।

তাছাড়া এ'ক'টা দিনে যেন বিরজা সত্যি ছেলেমানুষের মতোই হয়ে গেছে। দু'দুজন অভিভাবক তার মাথার উপর—কোনো দায়িত্বই আর তার নেই। মা আছেন।—খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তার কি মাথাব্যথা? ছেলেদের দেখাশোনা—এমন কি মোহিনীকেও একআধটু শাসন, যোগেশবাবুই করছেন। বিরজা নির্ঝঞ্ঝাট। ছুটি নিয়ে আরাম করছে সে। অনেকদিন পর ছুটিটা বেশ লাগছে! কারো জন্যে ভাবতে হয়না—এর চেয়ে বড় স্বস্তি আর কি?

দু'ভায়রাভাই খেতে বসে গল্প জুড়ে দেন--কোনোসময় হয়ত মা নিজের হাতে তৈরী এটা-ওটা নিয়ে খুশী-খুশী মুখে এসে ওঁদের পাশে বসেন—ঘোমটার আড়ালে বিরজার কান খাড়া থাকে—চোখের দৃষ্টি কড়া হয়ে ওঠে—ঠোঁটের আশেপাশে ছোটছোট রেখার ঢেউ খেলে যায়। কী ভীষণ জোরে-জোরে যে হাসেন যোগেশবাবু—কথা বলতেও তাঁর জোর শব্দ করা চাই—স্বভাবের মতোই স্পষ্ট তাঁর হাসি

আর কথা—মিনমিনে কোনোদিকেই নন। পেট না ভরলে চেঁচিয়ে বলে উঠবেন, ডাল-তরকারী-ঘণ্ট-ঝোল একটু এদিক-সেদিক হলে আর রক্ষে নেই—সবার সামনে বলা চাই : "কি রান্না শিখেছ বোন—সহরে এসে এমন একটা বিদ্যে ভুলতে বসেছ?" বিরজার হাত-পা কাঁপতে সুরু করে—লজ্জায় ত বটেই, তবে উত্তর দিতে যে পারছেনা তার জন্যেও খানিকটা। মোহিনীর সামনে কি করে সে যোগেশবাবুর মুখের উপর উত্তর দেবে? একা থাকতেন উনি, বিরজা বলতে পারত : "বিদ্যে আমার ঠিকই আছে হালদারমশাই, আপনার জিভের তার নেই!" যোগেশবাবুকে ভয় করে, সমীহ করে বিরজা কিন্তু তাঁর খোসমেজাজেরও খবর রাখে সে—জানে, তখন একটু মুখ আলগা করলেও ক্ষতি নেই। বিয়ের আগে যোগেশবাবু ঠাট্টা করতেন বিরজাকে : "তোমার পাত্র আমি পছন্দ করব, বোন—ভয় নেই, নিজে কালো-কুচ্ছিৎ বলে কালোকুচ্ছিতে আমার নজর যাবেনা!" সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠলেও বিরজা পাশ কাটাতে চেষ্টা করত : "আচ্ছা হালদারমশাই, কালো বামুন না কি—" বিরজার কথা লুফে নিয়েই যোগেশবাবু বলে উঠতেন : "কূট বুদ্ধির হয়। আমি কি লোকটা ভালো, মনে করছ?" পাথর-গড়ানো শব্দে হেসে উঠতেন তিনি।

"তোমাকে দিয়ে দারোগার কাজ হবেনা, মোহিনী—" বিরজার নালিশে যেন উল্টো ফল ফল্‌ল; যোগেশবাবু মোহিনীকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইলেন : "তোমার মতো ভালোমানুষকে দিয়ে ও কাজ হয়না। ও আমাদের মতো লোকের কাজ—পেজোমি-হারামাদি দেখেছোই বা কি, জানবেই বা কতটুকু!"

চুপচাপ হাসতে থাকে মোহিনী, খানিকক্ষণ গরসের উপর হাত চলেনা।

"দিনের পর দিন বজ্জাত হয়ে চলেছে মানুষ—ন্যায্য কথায় মন নেই, সালিসীতে মন নেই, মাম্‌লাবাজিতে রণপা—আদালতে ভীড় দেখেছ?"

"আপনিও ত ভীড় বাড়াতেই আদালতে যান—"

"দরকার হতনা, যেতামনা আমি আদালতে। ওরা চুরি-জুচ্চুরি করবে, বুক ফুলিয়ে চলবে আর আমি চোখ বুঁজে সয়ে যাব? যোগেশ হালদার তেমন পাত্র নয়, মোহিনী!"

"বাঁটোয়ারার মামলা কি মিটবে কোনোদিন?"

"না মিটুক—কিন্তু ন্যায্য গণ্ডা ছাড়তে যাব কেন বলো!"

"কোন্‌দিন খুন-জখম হবেন আর কি!"

"দেখছ?" যোগেশবাবু কপালের উপর বাঁহাতে একটা বিঘৎ মেপে দেখান: "এ কপালে খুন লেখা নেই—খুঁজলে রাজটিকা পেতে পারো!"

"ভালো, রাজসরকারে কর্ম্ম জুটে যাবে।"

"আমি স্বকর্ম্মেই আছি—তোমার কর্ম্মের কথাই হচ্ছে—জোব্বা-জাব্বা পড়লেই কি তোমায় দারোগা বলে মানায়! বলেছি ত ও কাজ তোমার নয়। আদালতের হাকিম-টাকিম হলে হয়ত মানাত তোমাকে—ঠাণ্ডামানুষ!"

"দারোগার কাজটাও গরম ছিলনা, হালদারমশাই! তবে আজকাল স্বদেশীতে একটু গোলমেলে হয়ে উঠেছে!"

"কাজটা গরমই, মোহিনী, নইলে দারোগার কুলগৌরব বাড়েনা। মহকুমার সুরেন দারোগাকে ত চেনো—আমার সঙ্গে তাঁর খুবই প্রণয়—ওঁর নামে গাঁয়ের ছেলেবুড়ো পালাবার পথ পায়না!"

"কেউ কেউ হয় ও-রকম।"

"ও-রকমই হতে হয়—তা যদি না পারো—এ কাজে কি ফয়দা ?"

নাক সিঁটকে মোহিনী মাথা নাড়তে সুরু করে: "বাড়াবাড়ি করতে মন সরেনা, হালদারমশাই! অধর্ম্ম হয় পাছে, ভয় হয়!"

লম্বা টানে হেসে ওঠেন যোগেশবাবু—কথাটাও ভালো করে বলতে শেখেনি মোহিনী!—"আরে আমিও ত বামুনেরই সন্তান! ভাবছ কি তোমায় অধর্ম্ম করতে বলছি? অপরাধীর শাস্তি যদি অধর্ম্ম হয় তাহলে স্বয়ং কৃষ্ণও অধর্ম্ম করেছেন বলো!"

"আমি বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিঁড়ে ফেলি, কি করে ভাবছেন?"

"তা ভাবছিনে—ভাবছি দায়-সারা কাজে দারোগার উন্নতি হয়না!"

"ছেলেপুলেগুলোর খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হয়ে গেলেই ত হ'ল—উন্নতির কি দরকার?"

যোগেশবাবু সজোরে একটা ঢেঁকুর তুলে টান-টান হয়ে বসেন: "দরকার হয়। ওসব বামনাই ছাড়ো, মোহিনী! গাঁয়ের মানুষ হয়ে আমার চোখ খুলে গেছে—আর সহরে বসবাস করে তুমি চোখ বুঁজে আছো? বিষয়ী লোকের বৈষয়িক হওয়াই ধর্ম্ম!"

মুখ টিপে হাসতে থাকে মোহিনী—কথা বলেনা।

পরিবেশনে অতি বেশি মনোযোগ দেখা যায় বিরজার—অতি বেশি শান্ত, চুপচাপ মনে হয়। মন তার অনর্গল কথা বলে চলছে বলেই হয়ত। কেউ ত আর বলবার নেই মোহিনীকে—বলুন হালদারমশাই। বিরজা নিজে বলতে পারে কিন্তু সংসারের সে জানেই বা কতটুকু আর শুনবেই বা কেন মোহিনী তার কথা! এখন জবাব দিক—হালদারমশায়ের কথার জবাব দিক না মোহিনী, দেখব কি জবাব দেয়। দেবে কি—জবাব নেই। ছোটবেলা থেকে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করে কষ্টিপাথর হয়ে গেছেন হালদারমশায়, ওঁর

এক দাঁতের বুদ্ধি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কারো নেই! হালদারমশায়ের নাম শুনলেই ত কেশববাবু যোড়হাত কপালে ঠেকান—বলেন—ওরে বাবা, দাদা আমার বিশ্বকর্ম্মা! আর সরযূ ত ওঁর কাছে কচি খুকীই বনে যায়। সাধে কি আর দিদি পাথরের মতো নিঃসাড় হয়ে গেছেন? হালদারমশায়ের সামনে মুখ খুলবেন সাধ্যি কি তাঁর! বিরজাই যা একটুআধটু সাহস করে এগোয়। তাই বিরজাকেই পছন্দ করেন তিনি সবার চেয়ে বেশি। "আপনি ওঁকে বলে যান হালদারমশাই—" বিরজা বলেছিল একসময়ঃ "ও-চাকরি ছেড়ে দিতে!" "চাকরি ত চমৎকার—ওকথা কেন বলছ?" —হালদারমশাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মুষড়ে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছিল বিরজাঃ "ও-চাকরিতে ছেলেপুলে মানুষ করা যাবে না কি কোনোদিন?"—আর কথাটা বলতে পেরে সে যেন দায়মুক্ত হয়ে গেল, যা বুঝবার বুঝুন গে হালদারমশাই। এখন দেখা যাচ্ছে হালদারমশাই উল্টো বুঝেছেন; যাক্ গে—তবু ত তিনি মোহিনীকে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিলেন। দারোগাগিরি যে তার কাজ নয়, একথাটা ত শুনতে পেল সে। বুঝুক এখন মনে-মনে, নিজেকে বুঝতে শিখুক। নিজের থেকে নিজেকে ঠিক বোঝা যায়না, পরের কাছ থেকেও নিজেকে খানিকটা জেনে নিতে হয়।

"শক্ত যদি হতে না পারো—" আসন ছেড়ে যোগেশবাবু উঠে দাঁড়ালেনঃ "তাহলে কাজ ছেড়ে দাও, মোহিনী! বড় শক্ত দিন আসছে! পাঁচসালের হাঙ্গামা ফুরিয়ে গেছে ভেবেছ? ফুরোয়নি!"

মোহিনী মাথা নাড়ে।

আঁচাতে গিয়েও যোগেশবাবু কথা ছাড়েন নাঃ "ছেলেগুলোও যেন আজকাল কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছে! আমাদের গাঁয়েরই মহেশ

সেনের মেজো ছেলেটি, বলা নেই কওয়া নেই, একদিন চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। পাত্তা পাওয়া গেলনা আর। এখন কাণাঘুষো শুনছি স্বদেশী দলে নাকি গেছে!"

অন্যমনস্ক হয়ে মোহিনী হাস্‌তে থাকে: "আপনার বাড়িতে ডাকাতি করবে বলে ওরা চিঠি দেয়নি?"

"উদ্ধব সা-কে দিয়েছে। আমাকে দেবে কেন! কি বা আছে আমার!"

"লোহার সিন্দুক ত আছে—ওরা তারই লিষ্ট রাখে!"

"বন্দুক চালাতে পারবনা, কলকব্জার ব্যাপার—সেই হয়েছে মুস্কিল—" যোগেশবাবু একটু দমে গেলেন: "নইলে একটা বন্দুক মঞ্জুর করিয়ে নিতাম। তবে সড়্‌কি চলে ঠিক—কেদার ওস্তাদের সাকরেদ আমরা—এক-আধটা বন্দুক সড়্‌কি হাতেই রুখতে পারি।"

"না-না, সড়্‌কিতে ওদের রোখা যায়না হালদারমশাই!" মোহিনী আবার মুখ টিপে হাস্‌তে সুরু করে।

চুপচাপ ঘরের বারান্দায় উঠে আসেন যোগেশবাবু। মোহিনীর আঁচানোর অপেক্ষা করেন। তরপর মোহিনী এগোতে থাকলে জোর করে একটা ঢেঁকুর তুলে ঘরের ভেতরে ঢুকে যান।

রান্নাঘর গুছিয়ে তবে স্নানে যেতে হবে বিরজাকে—এখনকার কাজটা অবসরেরই সামিল—দু-পাঁচ মিনিট এদিক-সেদিক হলে কিছু ভাববার নেই। চুপচাপ ওঁরা ঘরে ঢুকে গেলেন, মা আছেন ওখানে—সংসারের কথা চলবে এখন খানিকক্ষণ, শঙ্করের কথা উঠবে—শঙ্করকে বিয়ে করাতে চান মা, তার পরামর্শ হবে। বিরজার তাতে উৎসাহ নেই। এইমাত্র ওঁরা যে কথাগুলো বলে গেলেন তার সাড়াতেই তার সমস্ত মন ভরে আছে। যতীনকে নিয়ে তার যে-ভয়, তাহলে তা মিথ্যে

নয়! বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে ছেলেরা—স্বদেশীর দলে চলে যাচ্ছে—মা-বাপ ভাইবোনের মায়া নেই—কোথায় যাচ্ছে তার ঠিকঠিকানা নেই—ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে! যতীনের গাঁয়ের একটি ছেলেও গেছে—যতীন কি চেনে তাকে? নিশ্চয়ই চেনে—হয়ত যতীনের বন্ধুই সে। এখন চুপচাপ আছে যতীন, একদিন বাড়ি ছেড়ে পালাবে। হয়ত এখান থেকেই পালিয়ে যাবে—মিতুর কথা, মাসীমার কথা একটুও মনে পড়বেনা তার! বিরজার গলার ভেতরটা বুঁজে আসে! শত্রু—শত্রু এসে সব জন্ম নিচ্ছে শাস্তি দেবার জন্যে! 'নিমাই সন্ন্যাসের কথা মায় যেন জানে না—জানলে পরে শচীরাণী প্রাণে বাঁচ্‌বেনা'—একটা অস্পষ্ট সুর বিরজার গলার ভেতর ভেঙে-ভেঙে উঠে আসে—ভারি হয়ে যায় চোখ, চোখের উপর আঁচল বুলিয়ে আনে। মা-মাসীর শত্রু ছাড়া ওরা আর কি? ব্যথার কাঁটা। দিদি হয়ত ব্যথা পাবেন না তত—দিদির মায়ামমতাই কম—মেয়েটা মরবার পর দু'দিনের বেশি না কি কেউ তাঁকে কাঁদতে দেখেনি। বিরজা ভেবে পায়না, কি করে এমন হয়। মা কি করে নিজেকে সাম্‌লে নেয় এতোটা? হালদার-মশায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে শক্ত করে তুলছেন দিদি! অবশ্যি শক্ত হতে পারাটা এক হিসাবে মন্দ নয়, কিন্তু কি করে তা পারে মানুষ?

দৌড়ে এসে মিতু ঘরে ঢোকে—হাত দুটো পেছনে—উবু হয়ে মার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হাস্‌তে সুরু করে দেয়।

"কি হলো?" বিরজা বেশি গরজ দেখায়না।

পেছন থেকে ডান হাতটা সাম্‌নে এনে মিতু মুঠো খুলে ধরে: "মেছো দিয়েছে—"

"টাকা?"

তাড়াতাড়ি মুঠো বন্ধ করে মিতু একটু সরে দাঁড়ায়।

"দেখি-দেখি—যাস্‌নে—মিতু—"

থাকবার আর ভরসা ছিলনা মিতুর। টাকা-টা নিয়ে যাবে মা—তিতুকে দিয়ে দেয় কি না কে জানে—ওর অনেক পয়সা আছে—তবু হয়ত নিতে চাইবে।

বিরজার ভয় হ'ল। একবার একটা চাবি গিলে ফেলে কি দুশ্চিন্তাতেই না ফেলেছিল সবাইকে মিতু। ভাগ্যি—অসুখ বিসুখ কিছু করেনি—চাবিটা বেরিয়ে গিয়েছিল পরদিন। এই টাকা আবার কখন মুখে পুরে গিলে বসে কে বলবে! হয়ত গলায় আটকে গিয়ে ফুলে উঠবে গলা—লাগবে হাঙ্গামা! টাকা-টা ওকে দিতে গেলেন কেন হালদারমশাই? জানেন না ওর দস্যিপণা! সমস্ত শরীরে একটা যন্ত্রণা বোধ করে বিরজা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

২

মা বলেছিলেন, কি হবে সবাইকে নিয়ে একমাস থেকে এলে? ছেলেদের ইস্কুল ছুটি হয়ে গেছে—চাকর ত একজন আছেই, ঠিকে ঠাকুরও পাওয়া যায়—মোহিনীর কোনো অসুবিধে হবে না। তিতুটা হাড্ডিসার হয়ে গেছে—গাঁয়ের জলহাওয়ায় গায়ে ওর একটু মাংস লাগ্‌বে। বিরজা রাজি হয়নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—চলে গেলেই যেন ভাল ছিল। জনপ্রাণী নেই—বাসাটা খাঁ-খাঁ করছে। ক'টা দিন সবাই থেকে গিয়ে আরো শূন্য করে দিয়েছে বাসাটা। নইলে নেই ত মাত্র একজন—যতীন। যতীন ত কতোবারই বাড়ি গেছে—এমন ফাঁকা মনে হয়নি ত বিরজার। সেই ভয়েই কি এমন

ফাঁকা লাগছে—বাড়ি ছেড়ে যদি পালিয়ে যায়! কুডাক ডেকে উঠছে তার মন! কিন্তু মাসীমাকে কিছু না বলে চ'লে যেতে পারে যতীন? অসম্ভব। কেউ তা পারে বলে কিছুতেই মনে হয়না বিরজার। আজই প্রথম যেন সে বুঝতে পারছে—সবাইকে নিয়ে থাকতেই তার ভালো লাগে। এমন যদি হ'ত সব আত্মীয়-স্বজন এক সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে থাকছে! কিন্তু কোথাও এমন হয়না। বাপের ভিটেয় হয়ত সব ক'টা ভাই একসঙ্গে থাকে কিন্তু বোনরা থাকতে পারেনা—বোনদের বর রাজি হবে কেন?—তাদেরও ত বাপের ভিটে আছে, ভাইরা আছে! তাছাড়া একসঙ্গে থাকার অসুবিধেও কি কম, মনকষাকষি হয়—ঝগড়া বিবাদ লেগে যায়—যে স্বস্তির জন্যে একসঙ্গে থাকা, তা আর থাকে না! হয়ত তারই জন্যে শ্বশুরের ভিটেয় পড়ে থাকবার মন ছিলনা বিরজার—সহরে চলে এসেছিল হাবুলকে কোলে নিয়ে। মোহিনী, সে আর হাবুল—আর কেউ ছিলনা তখন। উঃ কী ভীষণ একা যে লাগত তার! মার চিঠি, ভাসুরের চিঠি, হালদারমশায়ের চিঠিগুলোকে সোনার টুকরো বলে মনে হ'ত—মনে হ'ত ওগুলো চিঠি নয়, মানুষগুলো যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন! তিতুর জন্মের পর, ঐটুকু একটা শিশুকেও মানুষ বলে, সঙ্গী বলে মনে হ'ত! ওর সঙ্গে কথা বলা যায়, হাসাহাসি করা যায়, ধমক দেওয়া যায়, খাওয়ানো-শোওয়ানো খেলাদেওয়া এম্নি অনেক কাজই করা যায় ওকে নিয়ে! তারপর যতীনকে পাঠিয়ে দিলেন যোগেশবাবু—মিতু হলো—তখন আর একদণ্ডের জন্যেও একা মনে হয়নি বিরজার। তার চারপাশে যারা, তারা সবাই তারই মনের মতো—ভালো লাগতে লাগল তার—দূরে সরে যেতে সুরু করলেন মা আর শাশুড়ী, ভাসুর আর হালদারমশাই।

কিন্তু খুব দূরে সরে যাননি তারা—তা যদি হবে তাহলে শাশুড়ীর অসুখ-বিসুখে ব্যস্ত হয়ে টাকা পাঠাতে বলে কেন সে মোহিনীকে? পূজার ছুটিতে ছেলেদের নিয়ে বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা বা হয় কেন তার? আর আজই বা মা আর হালদারমশাই চলে গেলেন পর খালি-খালি লাগছে কেন মন? কেন তার মনে পড়ছে প্রথম সহরে আসবার দিনের ছবিটা?

গাঁ থেকে আট মাইল পথ রেলষ্টেশন। সুদিনে সোয়ারি, বর্ষায় নৌকো। সোয়ারিতেই এসেছিল বিরজা—মাঘের শেষদিকে। ক্ষেতের আলপথে খানিকটা, উঁচু সড়কে অনেকটা। সর্ষে, তিল, খেসারি, কলাই ছিল ক্ষেতে—কাপড়ের ঘেরটোপ সরিয়ে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখেছে বিরজা—চারার নমুনা, ফুলের রঙ দেখেই চিন্‌তে পেরেছে কোন্‌টা কি হবে। খালের ধারে, ঝিলের ঘাটে বৌ-ঝিদের দেখে মনে হয়েছে সবাই যেন চেনা-চেনা। তার ছোটবেলাকার সই আচার্য্য-বাড়ির সুরবালার বিয়ে হয়েছিল এদিককারই এক গাঁয়ে—কোনো পুকুরের ধারে, কলার ঝোপের আড়ালে সুরোকে কি দেখতে পাওয়া যায় না? যদি দেখা হয়ে যায়—হতেও ত পারে, ঘোমটা সরিয়ে কোথাও দাঁড়িয়ে সোয়ারির মানুষটাকে দেখতে চাচ্ছে সুরো! তখন সোয়ারি থামাবার জন্যে মুখ বাড়িয়ে পেছনে তাকিয়ে চোখের ইসারায় অতুলকে ডাকবে বিরজা। মোহিনীর পিসতুতো ভাই অতুল—বিরজাকে পৌঁছিয়ে দিতে চলেছে—ঘামে জল হয়ে দৌড়ুচ্ছে সোয়ারির পেছনে-পেছনে—শুধু কি তাই—সোয়ারির দোলায় ঢক্‌ঢক্ করে দই বমি করে দিচ্ছে যখন হাবুল—অতুল এসে ওকে কোলে নিয়েই পাল্লা দিচ্ছে সোয়ারির সঙ্গে! আপন দেওর নেই বিরজার কিন্তু থাকলেও সে অতুলের চেয়ে বেশি

হতনা তার কাছে! ভাসুর অতুলকে ছাড়বেন না, নইলে যতীনের মতো অতুলকেও কাছে এনে রাখত সে। ছেলেটার লেখা-পড়া হ'লনা —মামার বাড়ির খিদমত করেই জীবন গেল! মামাতো ভাইদের কাছে কি পাবে ও—কি দেবেন ওঁরা ওকে? পাওনাগণ্ডার কথা উঠলে ভাসুর হয়ত ক্ষেপে যাবেন, মোহিনী মুচকি হেসে বল্‌বে: 'অতুল? ওর খাওয়াপরার অভাব কি?' ওঁদের কে বল্‌তে যাবে অতুল যে ঐটুকু থাক্‌বেনা চিরকাল, তারও বিয়ের বয়েস হবে, বিয়ে করবে, ছেলেপুলে হবে! কে নেবে তখন সে-ভার? আর নিতে চাইলেও বা কি, কেমন লাগবে অতুলের তখন, তার বৌ-রা চাইবে কেন ভাসুরদের গলগ্রহ হয়ে থাক্‌তে?

মেঝেতে পাটি বিছিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল বিরজা—রামায়ণটা পাশে ছিল, খোলা হয়নি। ঘুম হবেনা জানে সে তবু কোনো কাজে আর হাত উঠছিলনা। বিকেল হয়ে যাচ্ছে তবু উঠবার তাড়া নেই। বারান্দায় তিতু-মিতুকে নিয়ে হাবুল ইস্কুল তৈরী করে বসেছে—যতীন নেই, সে-ই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। তিতু-মিতুর উপর এখন তারই একাধিপত্য। তার কথায় আর ইচ্ছায় সায় দিলে ওরা তার কাছে বসে গল্প করতে পারবে আর তা নাহলে চিমটি কেটে এক-এক করে ওদের তুলে দিয়ে বাসা থেকে সট্‌কে পড়বে। ফিরে আস্‌বে জাম খেয়ে ঠোঁট আর মাড়ি কালো করে। নয়ত আছাড় খেয়ে হাঁটু-কনুই রক্তে রাঙিয়ে। রামচন্দ্রের উদাহরণ শুনিয়ে বড় ভাই-এর গুণ শেখাতে চায় হাবুলকে বিরজা। হাবুল বলে, ও আমি জানি। জানিস্ বলেই বুঝি ভাইদের চিম্‌টি কাটিস্? হাবুল হাসে, পরে একদিন দেখা যায় তিতু-মিতুকে সামনে বসিয়ে 'মধুসূদন দাদা'র গল্প বল্‌তে সুরু করেছে। তিতু বলে: 'কৃষ্ণ ত ঠাকুর, সে কি করে দাদা হয়?'

'দেবতারা সব হতে পারে—' গুরুমশাই-এর ভঙ্গীতে হাবুল তিতুকে বোকা বানিয়ে দিতে চায়। তখন তিতু চুপ করে থাকে ত ভালো নইলে দাদার মহৎ আদর্শ ময়লা কাপড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে হাবুল তিতুকে চিম্‌টি কেটে দেয়। এখন পর্য্যন্ত আজ ওরা চুপচাপই আছে—মিতুটা ঘুমুচ্ছে হয়ত—নইলে ত্ব'একবার সাড়া পাওয়া যেত—দম টেনে নিয়ে চেঁচিয়ে ছুচারটে বেখাপ্পা কথা না বললে মিতু আর থাকল কোথায়?

ভালো লাগছে না। সত্যি, এতোটা যে একা মনে হবে, ভাবেনি বিরাজা। নিরুপমা-টা এলেও গল্প করা যেত খানিকক্ষণ, অনেকদিন ও আসেনি। মার সঙ্গে দেখা করতে একদিন গিন্নী ঠাকরুণ এসেছিলেন—কিন্তু ওকে আর দেখা যাচ্ছেনা। গিন্নীঠাকরুণকে সেদিন আবার আরেক অদ্ভুত চেহারায় দেখতে পেল বিরজা! "বামুনকন্যা—তোমার কাছে অন্যায় করেছি আমি, বৌ—আমাদের জ্যোৎস্না এসবের মধ্যে নেই তবু কে যেন ওকে ধরিয়ে দিয়েছিল, ছাড়া পেয়েছে! আমি ভেবেছিলাম আমাদের দারোগার হাত আছে এ ধরপাকড়ে। কি রকম অন্যায় ভেবেছিলাম, ত্যাখো একবার! এ অপরাধের কি আর মাপ আছে আমার—তুমি যদি মাপ না কর!" হড়হড় করে বলে যেতে লাগলেন গিন্নীঠাকরুণ—শেষটায় হাতযোড় পর্য্যন্ত করলেন! বিরজা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল—কি যে বলবে আর কি করবে, বুঝতে পারলনা। মা ত ঘোমটা টেনে দিয়েই খালাস—মার ওই এক সম্বল—ঘোম্‌টা। কিন্তু বিরজাকে ত কিছু বল্‌তে হবে এখন? তারপর যেন হঠাৎই মনে হল, সরল হওয়ার চেয়ে ভদ্র হওয়াই ভালো। 'আপনার কি আর দোষ—সবাই ভাবত এরকম।'—বললে বিরজা, চোখেমুখে বেশি বেশি খুসী

ফুটিয়েই বল্‌লে। গিন্নীঠাকরুণের সঙ্গে বিবাদ মিটে গেছে। কিন্তু নিরুপমা এমন চুপচাপ কেন? মেয়েটাকে বোঝা যায়না। সবাই যা বলে তা সে নয়—নষ্ট হয়ে যায়নি ও, তবে ভীষণ খোলামেলা—ও বয়েসে মেয়েরা এমন হয়না। বিরজা এমন ছিলনা, সরযূত নয়ই—মালতী—বিরজার ননদ, ছেলেবেলায় সহরেই ছিল, সে-ও নিরুপমার মতো নয়। শরীরটা যখন অন্যরকম হতে সুরু করেছিল, কেমন যেন একটা আতঙ্কই হত বিরজার আর সে-আতঙ্কই শেষটায় লজ্জা হয়ে দাঁড়াল মনে। লজ্জাটা মার এত বেশী যে শিখতে না চাইলেও খানিকটা না শিখে উপায় ছিলনা। নিরুপমার লজ্জা নেই আর হয়ত একটু বোকা—মনে যা আসছে বলে ফেল্‌ছে—ওই ওর দোষ। তারজন্যেই এতো বদনাম ওর! নইলে বিয়ের সখ কার মনে না আসে, বড়সড় হয়ে উঠ্‌লে পুরুষের দিকে তাকাতে ভালো লাগেইত মেয়েদের—অচেনা কোন পুরুষের গলা শুন্‌লেই কান পাততে ইচ্ছে করে! সবারই হয় এমন—ওটা অপরাধ হলে অপরাধ—কিন্তু হয় সবার। তবে শাসন করতে হয় মনকে—বোকা বলেই নিরুপমা নিজেকে শাসন করে চলেনা।

দুপ্‌দাপ্‌ আওয়াজ হল—বারান্দার ইস্কুল ভেঙ্গে গেছে। আরো আগেই যে ভাঙ্গেনি বিরজার কপালগুণ বল্‌তে হবে। নাকি সুরে তিতুরই প্রথম প্রবেশ। ক্ষিদে পেয়েছে। ক্ষিদের আর কি দোষ—সন্ধ্যে হয়ে এলো—বিরজা তবু শুয়ে আছে!—রামরাম! কাঁঠাল-দুধ-মুড়ি যে দিতে হবে ওদের, তা-ও তার মনে নেই। ও-বেলা কাঁঠালটা ভাঙ্গেনি, এ-বেলার জন্যেই রেখে দিয়েছে বিরজা—ভাঙ্গা কাঁঠালে মাছি বসে—তা ওদের দেওয়া যায়না। উথ্‌লতে মুড়ির চাল করে দু-টিন মুড়ি ভেজে দিয়ে গেছেন মা—ফুলের মতো মুড়ি,

মার হাতে ছাড়া ও-মুড়ি হয়না। বিরজা মন দিয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি দেখে নিয়েছে, এবার—টিন ফুরোলে দেখ্‌বে চেষ্টা করে। চেষ্টা সে বরাবরই করছে কিন্তু মনে হয় হাতে হাতে অনেক তফাৎ।

বই-পাটি-বালিশ তুলে রেখে বিরজা রান্নাঘরে এলো। তিতু পেছনে, বারান্দা থেকে মিতুও জুটে গেছে। একটা কাগজের নৌকা ভেঙ্গে গড়বার মিছিমিছি চেষ্টা করছিল ও এতোক্ষণ বারান্দায় বসে।

বাসনের ঝাঁক থেকে বাটি তুল্‌তে গিয়ে জিজ্ঞেস করল বিরজা: "হাবুল কইরে?"

আসনপিঁড়িতে নিশ্চল থেকে তিতু বল্‌লে: "বেরিয়ে গেছে।"

মিতু চেঁচিয়ে উঠ্‌ল: "তিতুর জন্যে গাধার তুপি তৈরী করছিল হাবুল—"

"এই—হাবুল নয়, দাদা—" ধমক দিল বিরজা।

"আমার জন্যে কি রে—তোর জন্যে তৈরী করছিল—" তিতু চোখমুখ সিঁটকোল।

আবার গলাবাজির জন্যে তৈরী হয়ে উঠ্‌ছিল মিতু—কিন্তু পরিবেশন সুরু হয়ে গেছে। দুধের বাটি পড়েছে, কাঁঠাল আর মুড়ির টিন নিয়ে এক্ষুণি এসে মা বস্‌বেন। মিতু চুপ করে গেল।

"আম নেই মা?" তিতু করুণ চোখে তাকাল।

"পোকে-খাওয়া টক না কি সব আম—নবা বলেছে শুনিস্ নি? আম আনতে আমড়া নিয়ে আসবে—বেশি বলতে গেলে—" বিরজা হাসতে লাগল, কিন্তু হাসির আড়ালে কোথায় যেন তিতুর চোখগুলো বিঁধে গিয়ে খচখচ করতে লাগল জায়গাটা।

"কাঁতাল মিস্তি নয়—" মিতু সুযোগ বুঝে আপত্তি জানাল।

"দুধচিনি সমান না হলে তোমার মিস্তি কিছুতেই হয়না—" বিরজা

কাঁঠালের কোয়া চিপে চিপে রস গড়িয়ে দিতে লাগল মিতুর বাটিতে।

"মা—মা—" সদর-বেড়ার ওধার থেকেই চেঁচাতে স্থরু করেছে হাবুল।

কি হ'ল? বিরজা চোখ খাড়া করে বারান্দায় নেমে এল।

"বিপিন এসেছে—" হাবুল খুসীতে রাঙা হয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল।

"বিপিন?"

"বিপিন শীল—মৌচাক কাটতে এসেছে! নবার সঙ্গে কথা বলছে বাইরে দাঁড়িয়ে!"

আসবার কথা ছিল, এসেছে—বুকের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠল বিরজা। মৌচাকের ভাবনায় এখন আর মন ছিলনা তার। তবে একসময় ওটা নিয়েও কম অস্বস্তি হয়নি। রান্নাঘরের পাশেই সজনে গাছটায় ঝুলে চলছিল চাকটা—এখন ত হাতেই আদ্ধেকটা নাগাল পাওয়া যায়। কখন গিয়ে মিতু চাকের উপর হাত বাড়িয়ে দেয়, সে ছিল এক বিষম ভাবনা। বুক-সমান খোপ-বেড়ায় ওদিককার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে তবে বিরজা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

চুল যেমনই কাটুক বিপিন, চাকের নাকি সে ওস্তাদ কাটিয়ে; ওস্তাদি-টাই সে দেখাবে পয়সা-টয়সা চায়না কিছু। একটি হুলও বিঁধবে না তার হাতে—পরে পরখ করে দেখতে পারো। সহরে আর ক'টা মৌচাক হয়—গাছ-লতা কেটে সাফ করে দিচ্ছে সব—সহরের লাগোয়া তাদের ফুলতলীতে বছরে না হোক তিন-চারটে চাক ত সে-ই কাটে! ও-কাজের মন্ত্র জানা থাকা চাই। মন্ত্রটা পাবার জন্যে হাবুল আবেদন জানিয়েছিল—আজে-বাজে সাতসতেরো গল্প জুড়ে বিপিন

আবেদনটাকে আমল দিতে চায়নি। তবে নবা ওর পেছনে জুটে গেছে, আদায় করে নেবে। নবা শিখে নিলেই ত ব্যস—ওর কাছ থেকে জেনে নেবে হাবুল।

"কাটবে ত কাটবে—" বিরজা বিরক্ত হয়ে উঠল: "কোথায় বেরিয়েছিলি তুই—"

জবাব না দিয়ে হাবুল বিরজার পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল: "দাও আমারি দুধ-কাঁঠাল—"

"ঈঃ, দুধ-কাঁঠাল যেন বাবুর জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে—" কথার ধারেই সবটুকু রাগ চুকিয়ে ফেলে বিরজা। সন্ধ্যার আগে বাসার বাইরে কোনোদিন থাকেনি হাবুল। যতীনের যাবার পর থেকেই এ-অভ্যাস তৈরী হচ্ছে তার। বিরজার চোখ এড়ায়নি।

৩

মৌচাক-কাটার উত্তেজনা ছেলেদের চাইতে বিরজার কিছু কম হলনা। ওদের ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। বিপিন বললেই ত হলনা, মৌমাছি উড়বেই। কখন কার গায়ে এসে হুল ফুটিয়ে দেয় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কোন এক ছেলের বাসায় জামরুল পাড়তে গিয়ে গেলো বছর তিতু বোলতার হুলে মুখ হাড়ি করে ফিরে এল। তারপর রাত্তিরে উঃ সে কি যন্ত্রণা—এক ফোঁটা ঘুমুতে পারেনি ছেলেটা সারারাত—মধু মাখালে জ্বালা কমত কিন্তু ঘরে এক রত্তি মধু নেই! মৌচাকটাকে সে বাড়তে দিয়েছে কি সাধে? ছেলেপুলের ঘরে একটু মধু থাকতে হয়—বাজারের মধু ত চিনি-গোলা!

ঘরে বন্দী হতে হাবুল কিছুতেই রাজি হয়নি। "দূরে দাঁড়িয়ে দেখলে কি হবে?"—গোঙরানি স্থুরু হয়েছিল তার।

"দরজায় দাঁড়িয়েই ত দেখা যায়, বাইরে আসবার দরকারটা কি আছে, শুনি?"

তিতু-মিতুর বিদ্রোহ দু'বাটি মধু কবুল করে ঠাণ্ডা করা হয়েছে।

বিরজাকে বাইরে থাকতে হচ্ছে বিপিনকে সাহায্য করবার জন্যে। একা নবার সাহায্যে কাজ হয়ত চলবেনা। মশাল ধরে থাকতে হলে নড়াচড়ার তার উপায় নেই। ধরো তখন মশালটা নিভেই গেল—অন্তত কুপিটা এগিয়ে দেবারও ত একজন লোক চাই! তাছাড়া হুল খেয়ে যদি নবা পিটটান দেয় তখন ত যেতে হবে বিরজাকেই।

উত্তেজনাটা এসেছে বিরজার বিপিনের ভঙ্গী দেখে। কাপড়টায় মালকোঁচা এঁটে দিয়ে—একটা ছেঁড়া লাল শাড়িতে মস্ত পাগড়ি তৈরী করেছে মাথায়। ফাজিল মুখটা তার গম্ভীর হয়ে উঠেছে ভীষণ। ডাকাতের মশালের মতো দাউ-দাউ করছে হাতের মশালটা—নবা জড়সড় হয়ে দা' আর মালসা হাতে তার পেছনে-পেছনে। মশালের আলো লেগে সমস্ত চাকটা ঝিক্‌মিক্ করে উঠল—মৌমাছির ঢেউ-এ আলো পড়েছে মনে হল বিরজার। নবার পা আর চলেনা, কিন্তু সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিপিন। আশ্চর্য্য, মৌমাছিগুলো ত উড়ছেনা! নীচের দিকে মোমের চাকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে বিপিন—সর্ব্বনাশ! কেচে ফেলে দিচ্ছে মৌমাছিগুলোকে—যেন ওগুলো কিছু নয়! মশালটা নবার হাতে গুঁজে দিয়ে দা আর মালসা হাতে তুলে নিলে বিপিন—চোখের পলকে সব করে যাচ্ছে সে। মোমের চাকটুকু কেটে মাল্‌সা ভরতি করে কেমন বুক ফুলিয়ে চলে আস্‌ছে!

হাবুল বেরিয়ে পড়ল বারান্দায়।

"ওদিকে যাবে না—খবরদার—ভীষণ উড়ছে ওরা।" বাহাদুরীর হাসিতে বিপিনের গম্ভীর মুখে চিড় ধরল।

মালসা থেকে ভোঁ করে একটা মৌমাছি উড়ে গেল—আরো ক'টা মধুতে হাবুডুবু খাচ্ছে।

মোমের খোপেও মাছি আছে কি না কে বল্‌বে! বিরজা মালসাটার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে বল্‌লে: "মোমটা নিংড়ে দিয়ে যাও, বিপিন! ওই মাছিগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া যায়না ?"

বিপিনের মুখে হাসিটা বড় হয়ে ফুটে উঠল: "ওগুলোর মরণদশা—ডানা ভেঙে গেছে!"

উনিশ শ' চব্বিশ

এক

পেছনে ফিরে তাকালে নিজেকে আজ কী অদ্ভুতই না মনে হয় মোহিনীর! পেছনের বারোটা বছরেই এতো পরিবর্তন, আর তার আগে তাকালে ত নিজেকে চেনাই যায় না! সে যেন আরেক জন্ম, আরেক পৃথিবী। ছোট ছেলে বলে বাবার কাছে আদর ছিল তার দাদার চেয়ে বেশি, আর চেহারার গুণে গাঁয়ে খাতির ছিল সবার থেকে বেশি। বাবা দারোগা বলেই অবশ্যি সে দারোগাগিরি পেয়েছিল কিন্তু সাহেব তার চেহারারও তারিফ করেছিলেন। মাকে নিয়ে সে তীর্থে বেরিয়েছিল যখন, কাশীর এক সাধু মাকে বলেছিলেন: 'মা, এই তোর ছেলে, ও ত রাজ-চক্রবর্ত্তী হবে!' সাধু তার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন! রাজচক্রবর্ত্তী!—তার মানে রাজার চাকর! যাক্, এ-চাকরগিরি ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছে মোহিনী। অবশ্যি সবারই ইচ্ছা ছিল চাকরিটা সে ছেড়ে দিক—দাদা বুঝিয়েছিলেন দারোগা-পুলিশ খুন জখম হচ্ছে কাজ নেই ও-চাকরির—বিরজা ত অষ্টপ্রহরই ভন্-ভন্ করেছে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। শুধু মা, মা চুপ করে ছিলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল না। দারোগার যে কী প্রতাপ তিনি দেখেছেন—তিনি জানতেন কাশীর

সাধুর বাক্য মিথ্যে হয়নি—তাই তিনি মনে-মনে রুষ্টই হয়েছিলেন। দাদার বা বিরজার কথায় মোহিনীর মন টলতনা—নিজেরও তার একটা কথা ছিল, তাতেই কাবু হয়ে গেছে মন। অধর্ম্ম হবে—এ-চাকরিতে তার অধর্ম্ম হবে—ছেলেগুলো বাঁচবে না—রামানন্দ বনিকের ছেলের কেস্‌টার পরই তার মনে হ'তে লাগল। ত্রৈলোক্য পোদ্দারের বাড়িতে ডাকাতি হ'ল—বিয়ে বাড়িতে—স্বদেশী ডাকাতি—কাকপক্ষীটিও কোনো আসামীর খবর জান্‌লনা কিন্তু পোদ্দাররা সনাক্ত করলে রামানন্দর ছেলে রমেশকে। বনিকের জ্ঞাতিশত্রুরাও চোখ টিপে দিলে, ইচ্ছে ছিল রামানন্দের জমিদারি আর তেজারতি উকীল-মোক্তার আর হাকিম-পুলিশের গহ্বরে গড়িয়ে যাক। আসামীর গন্ধ পেয়ে কেস্‌ সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পুলিশ। মোহিনীর ডাক পড়বে জানা কথা—ডাক পড়বার আগেই সে ছাড়পত্র পেশ করে দিলে। পারিবারিক অসুবিধে, কাজেই মহামহিম সম্রাটের কাজে সে ইস্তফা দিতে বাধ্য হচ্ছে। সহযোগিরা টিপ্পনি কাটতে ছাড়লেনা—স্ত্রীবুদ্ধির তাড়া! মাথাওয়ালা গোয়েন্দা-পুলিশ মন্মথবাবু ছাড়া সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। রমেশের সঙ্গে মোহিনীকে জড়িয়ে দেখবার খানিকটা চেষ্টা যে মন্মথবাবু না করেছেন এমন নয়। কিন্তু রমেশের বিরুদ্ধেই প্রমাণের এতো অভাব যে সেখানে মোহিনীকে টেনে নিয়ে যাওয়া নেহাৎই স্থূলবুদ্ধির পরিচয়—মন্মথবাবুর মতো বুদ্ধিমান মানুষ তা আর কি করে পারেন! কাজেই দারোগাদের দপ্তর থেকে কেসটা মুছে যাবার আগেই মোহিনীর নামটা মন্মথবাবুর মন থেকে পুরোপুরি খসে পড়ল।

সহর বলে কি—পাড়াগাঁয়ের নেশা তার সহজে টুটে যায় না। মোহিনীকে নিয়ে ক'টা দিন কি গরমই না ছিল সহর! ভাগ্যিস

ছেলেপুলেসহ বিরজাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল সে, নইলে কেঁদেকেটে বিরজা তাকে আর স্থির থাকতে দিতনা। অদ্ভুত মানুষ,মোহিনীর এক তিল নিন্দে শুনলে কিছুতেই ওর মাথা ঠিক থাকবেনা। কিন্তু মানুষ মানুষের নিন্দে রটাবেনা, একি হতে পারে? তাছাড়া মোহিনী যে নিন্দের কাজ মোটেই করেনি তেমন সাধুসন্নেসিও ত সে নয়। চাকরি-ছাড়ার ব্যাপারে না-হয় তার মিথ্যে নিন্দেই হয়েছিল, কিন্তু প্রথম বয়েসে, দারোগাগিরির প্রথম অবস্থায় কতো অন্যায় কাজইত সে করেছে! সেসব কাজের কুৎসা যদি মানুষের মুখে-মুখে চলতে সুরু করে, কি করতে পারে সে? বিরজা-ও বা কি করতে পারে? মোহিনীর অন্যায়ের কাহিনী বিরজার কানে আসেনি বলেই কি তা সব মিথ্যে হয়ে যাবে? পরিষ্কার হয়ে যাবে মোহিনীর মন? উঁহু। বরং মিথ্যে কুৎসায় নিজেকে জড়িয়ে-মাখিয়ে নিয়েই তার মন পরিষ্কার হতে সুরু করেছিল। যে অপযশটুকু তার পাওনা যে-ভাবেই হোক তা পাওয়া হয়ে গেল! যোগফলে গোল নেই—হলইবা হিসেব গোলমেলে। চোর-চৌকিদার একই লোক—কথাটা কানে আসত মোহিনীর, রেবতীবাবুর দলের লোক—তা-ও সে শুনতে পেত—হাসতে ইচ্ছা করত তখন তার। অদ্ভুত এই মানুষগুলো, নির্ব্বিবাদ হ'তে গেলেও ওদের হাতে নিস্তার পাওয়া যায়না! কিন্তু সহযোগিরা ততদিনে সন্দেহ থেকে ঈর্ষায় প্রমোশন নিয়েছে: 'জোত জমি আছে ভায়া দেশে-গাঁয়ে, চাকরের কাজ কেন করবে বলো?' প্রাণের ভয়ে চাকরিটা তেতো লাগছে ওদের—কাজেই চাকরি যে ছাড়তে পারে তাকে ওরা ঈর্ষা না করে কি আর করে! কিন্তু জোতজমির উপর এক বিন্দুও ভরসা করেনি মোহিনী। রোজগার তাকে করতেই হবে—ছেলেদের ভাসিয়ে দেওয়া যায় না

ত আর! কেশবের মতো দোকানদারি বিদ্যে তার নেই—তা থাকলে সহরটা জমে উঠছে যখন—ভেবেচিন্তে একটা দোকান খুলে দেওয়া যেত। কুণ্ডদের মনোহারি দোকানের মতো। বলরাম সাহার কাপড়ের গদির মতো একটা ব্যবসা ফেঁপে উঠলে ত তিনপুরুষেরই চিন্তা থাকেনা। কিন্তু ও-লাইনই তার নয়। চাকরি। চাকরিই করতে পারবে মোহিনী—কিন্তু সরকারি চাকরি ছাড়া চাকরি আর কোথায়? সরকারের দুয়ার তার জন্যে আর খোলা নেই। ক'টা মাস কি দুশ্চিন্তায়ই যে গেল মোহিনীর! এখনও ভাবতে গেলে সমস্ত বুকের ভেতরটা যেন খালি হয়ে আসে।

দাদা অবশ্যি চিঠি দিয়েছিলেন, দরকার নেই আর চাকরিতে—গাঁয়ে চলে এসো—বামুনের কোনোরকমে দিন চলে যাবে। বামুনের একমুঠো চালে দিন চলে সত্যি কিন্তু মোহিনী কি আর বামুন আছে এখনো? চাকরি তার হবে সে জানে—দুদিন আগে আর পরে। নানাদিকে মানুষের কাজকর্ম্ম বেড়ে চলেছে অথচ লেখাপড়া জানা তেমন লোক নেই—এণ্ট্রান্স ফেল লোকদের নিয়ে পোষ্টঅফিস টানাটানি করছে—মোহিনী ত কলেজ পাশ করা, তার উপর আইনও জানে সে। চাকরির তার অভাব কি? টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে বালেশ্বরে গিয়ে যুদ্ধ করাই ত একমাত্র চাকরি নয়—ফোর্টিনাইন রেজিমেণ্টে ঢুকে যুদ্ধের রসদ বয়ে বেড়ানোও একটা কাজের মতো কাজ নয়। স্বস্তি পাবার জন্যেই কাজ করা, রোজগার করা—স্বস্তি হারাবার জন্যে নয়।

বেশি সুপারিশ ধরতে হলনা—পুলিশ সাহেবের দু'ছত্র গুড কণ্ডাক্টের সার্টিফিকেট—রাজ-এষ্টেটে ম্যানেজারের কাজ হয়ে গেল মোহিনীর। রাজ-এষ্টেট্ মানে জমিদারি—এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বড়

জমিদার—কোনো এক পুরুষের রাজা উপাধি ছিল, উপাধিটা মানুষের সঙ্গ না পেয়ে এখন তালুকের সঙ্গ নিয়েছে। সহরের আশেপাশে যে মহাল, এতোদিন তা নায়েবের তত্ত্বাবধানেই ছিল—কিন্তু নায়েব ব্যাপারটা নেহাতই সেকেলে—পুলিশ-জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট্-শোভিত সহরের সঙ্গে তার খাপ খায়না, কাজেই নায়েব নাকচ হয়ে ম্যানেজারের আবির্ভাব হ'ল। পুলিশ-সাহেবের খাতিরের লোককে ম্যানেজারি দিয়ে কল্‌কাতা-প্রবাসী জমিদার হয়ত সেদিন বজবজের বাগানবাড়িতে এক গ্লাস বেশি ঢেলে স্বস্তি-উদ্‌যাপন করেছিলেন।

পুলিশ-সাহেবের ছ'ছত্রের মতো আরেকটা দাওয়াই ছিল মোহিনীর! জমিদার-সাহেবের সঙ্গে কেশবের পরিচয় ছিল প্রগাঢ়। সরযূ চিঠি দিলে, আপনি কল্‌কাতা চলে আসুন। মোহিনী গেল। দেখতে পেল, কেশব শুধু কাটাকাপড়ের দোকানদার নয়, জমিদার-সাহেবের এক গেলাসের ইয়ার। চাকরি হয়ে গেল কিন্তু বৌবাজারের একটি কাঠের দোতলায় একটা বিশ্রী সন্ধ্যা কেশবকে বকশিস দিতে হল। প্রস্তাবেই কেমন যেন জড়সড় হয়ে পেছিয়ে গিয়েছিল মোহিনী—গোঁফে পাক চড়িয়ে কেশব বলেছিল: "এ তোমার ঢাকাসহর নয়, দাদা---লক্ষ্ণৌর অপ্সরা!" মৌজের ঝিমুনিতে মোহিনীকেও কেশব ইয়ার করে তুল্‌তে চেয়েছিল।

চাকরি নেওয়ার পর্ব্বটাতে রীতিমত মুষড়ে পড়েছিল মোহিনী। কেন যেন মনে হচ্ছিল এ-রোজগারের গায়েও অন্যায় মাখা থাকবে—এ টাকা খেয়ে ছেলেগুলো তার মানুষ হবেনা! আশ্চর্য্য, তিনটি ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে কেশব এ কি করে চল্‌ছে! আসবার সময় তাই বলে এসেছে মোহিনী: "এ ভালো নয় কেশব, একটা বয়েসে করেছ, করেছ—মনে রেখো এখন বয়েস হয়েছে!" মোহিনীরও ত

পরিচয় ছিল এরকম জীবনের সঙ্গে, সে ত উঠে এসেছে এখন অন্যরকম জীবনে। মানুষ সব কিছুই করতে পারে, আবার না করেও থাকতে পারে। নিজেকে শাসন করতে পারাই আসল কথা। ঢাকায় যখন এফ্-এ পড়ত মোহিনী, রোজ বিকেলে নদীর ঘাটে কামানটার কাছে গিয়ে বসে থাকত—ওসব মেয়েরা নদীতে স্নান করতে আসত তখন—একটি মেয়ের সঙ্গে ত তার ভাবই হয়ে গিয়েছিল! কিন্তু—বারোটি মাত্র টাকা তার খরচ হয়েছিল, একজোড়া ইয়ারিংএর দাম—কোনোদিন মেয়েটি টাকা চায়নি তার কাছে —শুধু আসতে বলত। বাড়িতে জানাজানিও হয়েছিল খানিকটা। দাদা কিছু বলতেন না, দেখা হলে শুধু মুখ নীচু করে হাসতেন। গাঁয়ের মোহন মাঝি—ঢাকায় পৌছিয়ে দিত যে তাকে—কেবল মোহনই একদিন বলেছিল: "তোমার বংশের মানইজ্জত বলে একটা কিছু আছে মিতা—," ওতেই সমঝে গিয়েছিল মোহিনী—আর কাউকে কিছু বলতে হয়নি। তারপর আরেক অধ্যায়। মোহনের বোনটার উপর একটা অসম্ভব টান হল তার। ঢাকার সেই মেয়েটির মতোই চোখ তার—নাক আর ঠোঁটের গড়নও প্রায় এক। মেয়েটারও কি যেন হয়েছিল, ছুটিছাটায় মোহিনী বাড়ি এলে—এবাড়ি ছেড়ে ও কিছুতেই যেতে চাইত না। বৌঠানকে বলতেও শুনেছে মোহিনী: "ছোটঠাকুরকে গিলে খেতে চাস না কি আবাগী?" আবাগীর আর কি দোষ—ওকে দেখতে না পেলে অভাগারও কি বুকটা খালি-খালি মনে হতনা? কিন্তু সবই কাটিয়ে উঠেছে মোহিনী। নিজেকে শাসন করতে হয়েছে। আর আজ ত শাসন করবার মত অস্ত্রই তৈরী হয়ে গেছে তার—হাবুল, তিতু, মিতু—তাই আর ভয় নেই। মিতুর পর মেয়েটা বেঁচে থাকলে হয়ত আরো নির্ভয়

হতে পারত মোহিনী। তার নিজের মেয়ে! বড়খুকীর ত বিয়ের বয়েস হয়েছে। কেশবকেও এখন ফিরতে হবে।

মনে-মনে একটু দুঃখও হয় মোহিনীর, আগে আগেই যে সে বুড়িয়ে গেল। দশটা বছরও তার ফূর্ত্তির বয়েস ছিলনা। ঢাকার জীবন থেকে হাবুলের জন্ম পর্য্যন্ত—এই আট-ন' বছর। তারপর থেকেই কেমন একটা ভাটার টান এসেছে শরীরে। মনও খিঁতিয়ে গেছে ক্রমে। অনেক সময় তাই বিরজা তাকে ভুল বুঝেছে—হতেও পারে বৌঠানের কাছে কিছু শুনেছিল বিরজা। শুনলেও অবশ্যি মুখ ফুটে সে-কথা বলেনি সে কোনোদিন—মোহিনীর যে চেহারার গৌরব আছে তা নিয়েই রাগের মাথায় বিদ্রূপ করেছে। "সুন্দরী নই বলেই ত যতো ঘেন্না—জানি, জানি আমি সব!"—সব জানার ধমক দিত বটে বিরজা কিন্তু সবটুকু জানা আর বলার পেছনে তার কল্পনা ছাড়া আর কিছু ছিলনা! স্ত্রী সুন্দরী হলে মোহিনী খুসী হত নিঃসন্দেহ—কে না তাতে খুসী হয়—কিন্তু বিরজাকে নিয়ে সে খুব অখুসী হয়েছে তা-ওত নয়। একটি মেয়েকে যখন নিজের কাছে চেয়েছিল মোহিনী, যে মেয়ে তাকালে মায়ায় বুক ভরে ওঠে—ছুঁতে গেলে শিউরে উঠে যার মুখ গোলাপী হয়ে যায়—তেমি যে কোনো মেয়েকে যখন কামনা করছিল তাঁর মন, তখনই ত বিরজার সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল! বিরজাকে নিয়ে তবে তার অসুখী হবার কি আছে? কিন্তু বিরজার নিজেরই যেন তৃপ্তি নেই—সে ভাবে, তাকে পেয়ে মোহিনী খুসী হয়নি!

মেয়েদের মনে একটা কাঁটা বিঁধে থাকা কিন্তু ভালো—মোহিনী মনে মনে হাসতে সুরু করে। রূপের অভাবটা বিরজা গুণ দিয়ে ভরাট করে দিয়েছে। সবসময়ই ভয় ছিল ওর, কখন পেছনে পড়ে যায়! ও-বাড়ির গিন্নীঠাকরুণ যেমন পেছনে পড়ে গেছেন—বৌঠান পেছনে

পড়েছেন—যোগেশবাবু আজ বেঁচে থাকলে যতীনের মা-ও যেমন পেছনেই পড়ে থাকতেন। ওদের হাত খালি—স্বামীর কাছে, ছেলেমেয়েদের কাছে হাতে তুলে দেখাবার মতো কিছু নেই। সেরেস্তাদার পরিবারে যা-কিছু হয়ে চলেছে, সবতাতেই কর্ত্তা মশায়ের হাত—ছেলেমেয়েরা তাই কর্ত্তামশাইকেই জানে, মাকে জানে না। কিন্তু মোহিনীর ছোট সংসারে তা নয়—এখানে মোহিনী পেছনে সরে দাঁড়িয়েছে—সরে দাঁড়াতে পেরেছে। দশভুজার মতোই বিরজার হাত দশদিকে ছড়ানো। রোগা হয়ে যাচ্ছে ও দিনদিন আর দিনদিন খাটুনির জেদ বেড়ে চলেছে।

"হাবুলের চিঠি ত আজও এলোনা—" বিরজা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোহিনীর কাছে দাঁড়ায়। খুব দেরি হলেও আসতে দশটা বাজে পিওনের। এখন এগারোটা।

"পরশু ত মাত্র এসেছে চিঠি—" আবারও হুঁকোয় বসে যায় মোহিনীর ঠোঁট।

"কোথায় পর্শু—গেলো সপ্তাহে একটা এসেছিল—"

"যতীনেরই শুধু দোষ দিতে—কলকাতা গেলে সবাই যতীন হয়!"

"কি দরকার ছিল ওর এম-এ পড়বার?—না, ছেলেকে লায়েক করে তোলা চাই!"

"ছেলে বড় হবেনা? চিরদিন তুমি আঁচলে বেঁধে রাখবে!"

"তার জন্মে কি দুধের ছেলেদের ধরে সাতসমুদ্দুরের পারে পাঠিয়ে দিতে হবে? আর ফিরে আসবে ওরা কিমাকার হয়ে!"

"বেলুড়-মঠে তোমার হাবুল যাবে না—ভয় নেই!" হুঁকো ছেড়ে মোহিনী মুখ টিপে হাসতে সুরু করে।

"কেন যাবেনা? আমিই ত বলেছি ওকে দক্ষিণেশ্বর যেতে—কালিঘাটে গিয়ে স্নান করতে!"

"যোগেশবাবুর আদ্ধেক সম্পত্তি ত দান-খয়রাত করেছে যতীন—অবশ্যি যোগেশবাবুর ছিল—আমার কি বা আছে, দানবিক্রি বা করবে কি!"

"টাকার মায়া নেই যতীনের—" বিরজা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে: "কারো উপরই ওর মায়া নেই! মাসী-মাসী করত—এখন কোথায় মাসী, কোথায় কে!"

"তুমি কি চেয়েছিলে ও চিরকাল মাসী-মাসী করুক—ওর ঘর-সংসার হবেনা, ছেলেপুলে হবেনা?"

"ঘরসংসারে ত ওর ভারি টান!"

"ধর্ম্মে মতি থাকলে ও-টান আর কি করে হবে!" মোহিনী তার চোখে অধার্মিকের কৌতুক ফুটিয়ে তোলে।

"ওকে ধর্ম্মে মতি বলে না কি!—ছত্রিশজাতে মাখামাখি! দেশের বামুনরা ওকে একঘরে করেছে, বলেনি দিদি?"

মোহিনী চুপ করে যায়। জাতবিচার সেও কোনোদিন করেনি আগে। এখন যেন একটু দুর্ব্বলতা আসছে—মনে হয়, প্রবীণদের অসন্তুষ্ট করে যেন লাভ নেই। কিন্তু বাইরে সে-দুর্ব্বলতার আভাস নেই—এখনও মহালে গেলে কায়েত পেয়াদার হাতের রান্নাই সে খায় তবে আগে যা হতনা এখন তা হয়, মনটা খুঁতখুঁত করে।

মোহিনীর দুর্ব্বলতা আঁচ করে নেয় বিরজা—আগেকার দিনে ওটা তার মোহিনীর বিরুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল। কিন্তু এখন আর নয়। শত্রু এখন পরাজিত—আর মাথা তুলবার আশঙ্কা নেই, কাজেই সব রকম অস্ত্রই সম্বরণ করে নিয়েছে সে। সাত পা হাঁটলে যার সঙ্গে

সখ্য হবার কথা সাতাশ বছর তার সঙ্গে চলতে হয়েছে, তারপরও অস্ত্রের ঝোলাঝুলি বইতে হবে না কি ?

নাভিতে তেল মাখতে সুরু করে মোহিনী—বিরজা নড়েনা। রান্নার কাজ চুকিয়ে গোপীকে সে জল আনতে পাঠিয়ে দিয়েছে—মোহিনীর জন্যে স্নানের জল। পাঁচ মিনিটে নিয়ে আসবে সে জল—কোনো কাজ ওকে আর দু'বার বলতে হয়না, কাজে ফূরতি আছে, নবার মতো নয়। ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র কি সব শিখতে লাগল নবা, শরীরটা ওর নষ্ট হয়ে গেল! নইলে গোড়ায় ও মন্দ ছিলনা! বেঁচে আছে কি না এখন কে বলবে—বাড়ি গেল যে সেবার আর ফিরে এলনা! বেচারি! হাবুলকে বলত—বাবু হাকিম হলে আমি তাঁর খাস আর্দ্দালি হব!

মহিমের ভিটে আর খানাডোবা নিয়ে ছোট একটা পুকুর হল—কিন্তু জলটা যেন তেমন ভালো হলনা। বিরজার পাকা ঘাটলার সখ ছিল—গাছের গুঁড়ি ফেলে যে ঘাট তা ভারি জংলী হয়—শামুক-গুগ্‌লি ঢোঁড়া সাপের আড্ডা—পানা-লতাপাতার ভীড়—স্নান করতে খুঁতখুঁত করে মন। ডোবাতেই ঘাটলা হল। তবে ঘাটলায়ও মুস্কিল কম নয়, সিঁড়ির শ্যাওলায় পা পিছলে যেতে চায়—ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে বিপদ। রক্ষা যে ছেলেরা সবাই বড় হয়ে গেছে, জলে ডোবার ভয় কারো নেই। গাঁয়ের জমিদারের দিঘীতে বিরজা দেখেছিল ঘাটলায় তুলসীমঞ্চ থাকে। গোপীকে দিয়ে দুটো তুলসীর চাড়া আনিয়ে তাই সে ঘটলার পিলারের উপর পুঁতে দিয়েছিল। কিন্তু তুলসীপাতার খোঁজ পড়ে কারো সর্দ্দিকাশি হলে—আর বছরে দু'বার, শ্রীপঞ্চমীতে আর ষষ্ঠির ব্রতে। শ্রীপঞ্চমীতে ছেলেদের উৎসাহেই বিরজার উৎসাহ—কিন্তু ষষ্ঠিব্রতের উৎসাহটা তার নিজের! ছেলেবেলায়

জিজ্ঞেস করত মিতু : 'আমাদের ভাইফোঁটা হবেনা মা ?'—কথাটা এখনও মনে পড়ে, বুকের কোথায় যেন একটা নিশ্বাস পাকিয়ে ওঠে বিরজার, চোখে আঁচল বুলিয়ে আনে—মেয়েটা যদি বেঁচে থাকত !

এখনও তা-ই মনে পড়ল বিরজার—মেয়েটা যদি বেঁচে থাকৃত ! ভুরু কুঁচকে চোখের দৃষ্টিটাকে সোজা রাখতে চেষ্টা করে—ভারি পা দুটো টেনে আবারও সে রান্নাঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

মোহিনীও যেন তখন নিঝুম দুপুরে ডুবে যায়। মাথায় তেল মেখে চলেছে সে অনেকক্ষণ—টাকের জন্যে নয়, অন্যমনস্ক হয়ে থাকবে বলে যেন তার অনেকক্ষণ ধরে তেল মাখা দরকার। মনে হয়, চারদিকটা যেন খালি হয়ে যাচ্ছে তার—কি যেন ছিল, থাকবার কথা ছিল যেন কার-কার—তারা কেউ নেই। যেন একটা পরিচিত জায়গা থেকে খানিকটা তফাতে সরে এসে দাঁড়িয়েছে সে একা ! কিন্তু কোথায় এসে দাঁড়াল সে ? দেখতে গেলে ত জায়গাটাকে অপরিচিত বলে মনে হয়না ! শুধু যোগেশবাবু নেই, মা কাশীবাসী হয়েছেন আর মেয়েটা চলে গেছে। আবার তেম্নি বিরজা ত অনেকখানি চোখের কাছে এগিয়ে এসেছে—যে পরিচর্য্যা আর যত্ন জীবনে সে আশা করেনি, বিরজার হাতে তা-ই সে পাচ্ছে। এখুনি ঘাটলায় গিয়ে দেখবে, দু'টিন ভরা দিঘীর ফট্‌ফটে জল, চাতালের উপর আমগাছের ছায়ায় ঢাকা আছে অথচ নিজে বিরজা এ-পুকুরেই স্নান করে ! বিকেলবেলা দুধের সরে ঘষা এক খল স্বর্ণসিন্দূর থাকবেই। রাত্রিতে মশারি ফেলতে যদি ভুলে যায় মোহিনী, তবু ভোরে উঠে দেখতে পায় মশারি ফেলা আছে। নিজের জন্যে ভাবনার বালাই আর নেই মোহিনীর। তার কাজ শুধু মাসের শেষে কয়েকটা টাকা নিয়ে আসা—আর সব কিছুই বিরজার কাজ। হাবুলকে মণি-অর্ডারে টাকা

পাঠানো, তিতুর কলেজের বেতন, মিতুর স্কুলের বেতন—ওদের বই-এর টাকা—হাতখরচ, সবই বিরজার হাত দিয়ে হচ্ছে। দুধের হিসেব, ধোপার কাপড়ের হিসেব, মুদির হিসেব—বাজার খরচ—সব। পুকুর কাটতে মাটির ঝুড়ির হিসেব—ঘাটলার ইঁটের হিসেব পর্য্যন্ত। তারপর ঘরদোর ভেঙে গড়া হল—পাকা ভিটে হল থাকবার ঘরের, ছেঁচাবাঁশের বেড়ার ছাউনি হল। ঢেউ টিনে গরম হবে—তাছাড়া কাঠের পাটাতন লাগবে—সে অনেক খরচা—তার চেয়ে এই ভালো!—বিরজা বলেছিল। ভালো সত্যি—দেখতে অনেকটা মোহিনীর কাছারীর বাংলোটার মতো, শুধু পাকা দেয়াল নেই। ইস্কুলে পড়বার সময় তিতু বলেছিল—'মা, আমাদের দোলপূজা হয়না? —এ-পূজোটা কিন্তু বেশ!'—শুনে বাইরের ছোট মতো বাগানটুকুতে নিজের হাতে ইঁট আর মাটি দিয়ে দোল তৈরী করে দিয়েছিল বিরজা—দু'বার পূজোও হয়েছিল, গান-বাজনা আর আবীর খেলার ধূম লাগিয়ে দিয়েছিল তিতু! মিতু একবার কোথায় কার গাছে জলপাই পাড়তে গিয়ে তাড়া খেয়ে এলো—কেঁদে নালিশ জানাল মার কাছে—বিরজা খুঁজে-খুঁজে যোগাড় করল জলপাই-এর চারা—পুকুরের ধারে পুঁতে কতো যত্নে বাড়িয়ে তুলল গাছটাকে—এখন তাতে জলপাই ধরছে! শুধু কি জলপাই—আম-কাঁঠাল-লিচু- নারকেল-কুল গাছ নেই? মোহিনী বলেছিল একদিন: "বাসাটাকে বন করে ফেলবে না কি?" খুরপি হাতে নিয়ে একটা বনসেগুনের চারা তদ্বির করছিল বিরজা—সদর রাস্তার ধারের সেগুনগাছ থেকে কবে একটা বীজ উড়ে এসে পড়েছিল দোলের পাশে—মাত্র ক'দিন আগে বিরজা চারাটা দেখতে পেয়েছে। চার পাশের জংলা সাফ করে দিতে দিতে বলেছিল বিরজা: "বাসা কি তোমার একার? ওদের—

ওদের ছেলেদের—তারও ছেলেদের নয়?" মোহিনী চুপ করে গিয়েছিল—চুপ করে ভাবতে সুরু করেছিল স্বপ্নের মতো ধোঁয়াটে একটা ছবি ঃ

হাবুল বিয়ে করবে—তিতু-মিতু, ওরা-ও বিয়ে করবে একদিন—ছেলেপুলে হবে সবার—তারাও হাঁটবে, কথা বলবে, বড় হবে, বিয়ে করবে। অনেকগুলো মানুষ—কে কেমন হবে জানেনা মোহিনী—জানতেও পারবেনা, বেঁচেই থাকবেনা সে ততদিন! তবু ওরা আসবে, কারো-কারো মুখে হয়ত মোহিনীর মুখেরই আদল, কারো চেহারায় বিরজার ছাপ, কেউ হয়ত একেবারে আলাদা। তবু কোথাও একটা কিছু মিল থাকবে—তাদেরই ত সন্তান ওরা—মিল থাকবেই কিছু-না-কিছু। মোহিনী বেঁচে না থাকলেও, ওরা বেঁচে থাকবে। সবাই মোহিনীরই সন্তান—কতোগুলো মানুষ! অতোগুলো মানুষ পেছনে তাকিয়ে দেখতে পাবে মোহিনীকে, বিরজাকে—মাত্র দুটি মানুষকে! ভাবতে কেমন যেন লাগে মোহিনীর, আশ্চর্য্যই লাগে। চোখের উপর দেখতে সুরু করে ছোট-বড় কতগুলো মানুষের ছায়া—মুখের চেহারা স্পষ্ট বোঝা যায়না কিন্তু ওরা ভীড় করে এসে দাঁড়ায়—অদ্ভুত! হবে—এম্নি একরকম হবে কিন্তু কোনোদিন মোহিনী ভাবতে পারেনি তার জীবন থেকেও যে এম্নি সুন্দর ছবি ফুটে উঠতে পারে! কোনো শৃঙ্খলা ছিলনা তার জীবনে আর তাই কোনো আশা-ও ছিলনা। কিন্তু শৃঙ্খলা এসে গেল—বিরজাই এনে দিল। বিরজাকে প্রথম দেখে মনে হয়নি ঐটুকু একটা মেয়ে এমন কিছু করতে পারে। ভয়ে-ভয়েই থাকত ও মার গা-ঘেঁষে—যা-খুসী বলত মোহিনী, যা-খুসী করত। চাকরি পেয়েও মোহিনী ভাবত জীবনটা বুঝি ফুর্তি আর ইয়ারকি করেই

কাটিয়ে দেওয়া যাবে—তাছাড়া জীবনের আর কোনো মানে খুঁজতে যায়নি সে। চোখের উপরই ত দেখল সে গাঁয়ের জমিদার রমানাথ মল্লিক এক রাত্রির জুয়োর আড্ডায় ঢাকাতে এক তালুক বিক্রির টাকা উড়িয়ে দিয়ে এলেন—এখন সারাদিন ছিপ ফেলে দিঘীর ধারে বসে থাকেন আর সন্ধ্যার পরে একটি করে ত্রিশ-ডিগ্রীর বোতল নিয়ে বসেন। তাছাড়া মামলাবাজ তারিণী ঘোষ সারাটা জীবন টাকার থলে কোমরে বেঁধে মাকুর মতো মহকুমাসহরে আর গাঁয়ে ছুটো-ছুটি করে গেলেন। নাগাড়ে দু'দিন তাঁকে কেউ গাঁয়ে তিষ্ঠোতে দেখেনি। তারপর পাশের বাড়ির সুরেশ, কীর্ত্তন গাইতো—ভালোই গাইতো কিন্তু আর কোনো কাজ নয়, পথে-ঘাটে হাটেবাজারে অষ্ট-প্রহর রাধাবিনোদিনীকে নিয়ে গুণগুণানি!—গলা থেকে কীর্ত্তনের সুড়সুড়ি তাড়াতে এখন গাঁজা ধরেছে সুরেশ। এম্নি সব। সহরে এসেও মোহিনী এর চাইতে ভালো ছবি দেখতে পায়নি—বাড়িঘরদোর আছে সবার কিন্তু কি করে যে আছে, কি করে যে হয়েছিল লোকগুলোকে দেখে বুঝবার উপায় ছিলনা। আদালতে-ফৌজদারিতে দিনের বেলায় ভীড়—আর রাত্রিতে ভীড় বাজারের মেয়েমানুষদের পাড়ায়। কোনো সঙ্কোচ নেই—কারো কাছে যেন কারো লজ্জা নেই—যেন কোনো অপরাধই কেউ করছেনা। তার আগে না কি আরো চমৎকার—ছেলেবয়েস বলে মোহিনী দেখেনি, দেখলেও বুঝতে পারেনি—থানা-ইন-চার্জ্জ রামচন্দ্র সেন তাঁর পুরু ঠোঁট ঝুলিয়ে টেবিলের কাগজে চোখ রেখে গল্প করেছিলেন একদিন—'বোষ্টমপাড়া দেখছ ত সহরতলীতে?—ওটা কেন? বাবুদের একটি করে বোষ্টুমি থাকত।'—তারপর চোখ থেকে চশমা খুলে সাদা চোখে সুরু করতেন: "ও গেল সাধারণ বাবুদের খবর! হাকিম আর হুকুম-ওয়ালারা কাড়াকাড়ি

সুরু করতেন লেডীডাক্তারকে নিয়ে! বেচারী লেডীডাক্তার যদি ভালোমানুষ হতেন তাঁর যন্ত্রণাটা আন্দাজ করো একবার!' একটু আড়ালে গিয়েই মন্মথ মোহিনীকে বলেছিল: 'স্থর-টিও ও দলেরই ছিলেন মোহিনী—ওরকম ঠোঁট যাঁর, বুঝতেই পারো!' মোহিনীর মজা লাগছিল—ভাবছিল—জিজ্ঞেসও করেছিল মন্মথকে: 'আজকাল ও-রকম হয়না?'

ও-রকম ঠিক নয় তবে অন্যরকম কত কিছুই ত হয়েছে! এসহরটাতে বাগানবাড়ি ছিল গাঁয়ের এক জমিদারের। বৈষ্ণব জমিদার—ঝুলন-রাস-দোলের লাল তারিখগুলো পালন করতেন। কোনো বছর কীর্ত্তন-ওয়ালী, কোনো বছর মণিপুরের লাইছাবি মেয়ে আমদানী হত। ষ্টেশনের ধারে নির্জ্জন ডাক বাংলোতে একটি মণিপুরী মেয়ের সঙ্গে একটা রাত্রির কথা মনে পড়ে মোহিনীর। কথাটাই মনে পড়ে—কঙ্কালের মতো—রক্তমাংসের স্নিগ্ধ স্বাদ নয়। একটা ফাঁকা কথা—মাঠের হাওয়ার মতো হু-হু করে ওঠে তার দু'কানের পাশে—তারপর মাথার ভেতর ঢুকে যায়। মগজে তাড়া দেয় ওর ফাঁকা আওয়াজ - মোহিনী চটপট করে ওঠে দাঁড়ায়।

কি আশ্চর্য্য—এতোক্ষণ বসে-বসে তেল মেখে চলেছে সে! আর আকাশ-পাতাল ভীড় করে আসছে মাথায়! খড়মের আওয়াজ তুলে ঘাটের দিকে এগোলো মোহিনী। খোয়া আর সুরকি-তে তৈরী ঘাট-বরাবর সরু একটা রাস্তা—দুধারে উঠোনের সবুজ ঘাস। বর্ষায় কাদা হয় বলে বিরজা উঠোনো লাল সুরকির ছক কেটেছে। থানইঁট ফেলে কাজ চলত আগে—কিন্তু পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে না পারলে বিরজার চোখে ঘুম নেই।

দুই

সন্ধ্যার পর বাইরে আর কোনো কাজ নেই। বিকেলের কাছারী সেরে মোহিনী টাউনহলে যায়—হাকিমবাবুদের টেনিস খেলার মাঠে বা ক্লাব-ঘরে গিয়ে একটু বসে। তেমন খাতির কেউ দেখান না, তবে ভদ্রতার সম্বন্ধটুকু বরাবরই থাকে। অবশ্য টেনিস খেলার উৎসাহ থাকলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিলের দুটি অকর্ম্মণ্য ছেলের মতো মোহিনীও নিজেকে হাকিমবাবুদের প্রিয় বয়স্য করে তুলতে পারত, কিন্তু কোনোদিন কোনোরকম খেলায় উৎসাহী হবার মতো সুযোগ যেন এলনা তার। ঢাকায় থাকতে সে ডন করত—কিন্তু ডনের শরীর দারোগাগিরিতে ঢুকেই যেন মজে গেল। ক্লাবে আসে মোহিনী হাওয়া খেতে—জালি-বেড়ায় টেনিস কোর্টটা আটকা পড়লেও মাঠটা মস্ত বড়—হাওয়া থাকে। বেশি হাওয়ার উৎপাতে যেদিন বেড়ার উপর ত্রিপল চড়ে মোহিনী সেদিন কোর্টের ঘের ছেড়ে ক্লাবঘরের বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে।

টাউনহলের সুয়োরাণী এই ক্লাবঘর আর দুয়োরাণী পাব্লিক লাইব্রেরী। পাব্লিক লাইব্রেরী মানেই অবশ্যি পাব্লিক যার খোঁজ রাখবেনা। পাঁচটি আলমারী—তা-ও তিনটি তিনজন বদান্য ইংরেজ রাজপুরুষের দান। বদলী হবার সময় কেউ সেক্সপীয়র, মিল্টন, ম্যাকলে, ডিকেন্স দিয়ে আর কেউ বা নির্জ্জলা কোনান ডয়েল আর রাইডার হ্যাগার্ড দিয়ে লাইব্রেরীটির পিঠ চাপড়ে গেছেন। তবু ওঁরা বস্তুটার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পাব্লিকের কাছে ওটা বরাবরই নিরাকার ছিল। মাত্র ইদানীং তারা সহরতলীর

জগন্নাথ-মন্দিরের মতোই লাইব্রেরীটাকে মাঝে-মাঝে স্মরণ করে কিন্তু তা-ও ওর বই-এর দৌলতে নয়—ইংরেজি-বাংলা দু'টি খবরের কাগজের দরুণ। যুদ্ধের 'সত্যবাণী', তারপর এই নন-কোঅপারেশন আন্দোলন দুচারজন উকীল-মাষ্টার-কেরাণী আর কলেজের ছাত্রকে খবরের কাঙাল করে রেখে গেছে। খবরে মোহিনীও একটু-একটু উৎসাহী, একটা-কিছুতে উৎসাহী হতে হয় তাই। স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজটা রাখে মোহিনী, দুপুর বেলাকার পাতলা ঘুমটুকুর মাসী-পিসী ও কাগজটার অক্ষরে-অক্ষরে লুকিয়ে আছে বলে। কিন্তু আরো একটু ভাবতে গেলে মোহিনী স্বীকার করবে, দেশ-বিদেশের খবরগুলোর জন্যে তার একটা আন্তরিক টান আছে—লাইব্রেরীর একটিমাত্র বাংলা বই-এর আলমারী থেকে বেছে-বেছে সে একটি ভ্রমণ কাহিনীই বার করেছিল প্রথম—জলধরবাবুর 'হিমালয়'। আলমারীতে দুতিনখানা ভ্রমণকাহিনী আছে—দু'তিনবার করে পড়েছে মোহিনী। ঘুমের সঙ্গী হিসেবে একবার, মনের সঙ্গী হিসেবে আরেকবার আর হয়ত তৃতীয়বার পড়ে ভাবতে সুরু করেছে, সব ছেড়ে- ছুঁড়ে দিয়ে পৃথিবীর রাস্তায় বেরিয়ে পড়া-টা মন্দ কি! মার সঙ্গে তীর্থভ্রমণের দিনগুলো মোহিনীর চোখে ছায়াবাজি করে গেছে।

সন্ধ্যার একটু আগে মোহিনী লাইব্রেরীর ছোট ঘরটাতে গিয়ে ঢোকে। ঘরটা ছোট কিন্তু এমনি অন্ধকার যে মাথার উপরে ঝোলান চৌদ্দ-লাইটেও তেমন ফর্সা দেখায়না। লাইব্রেরিয়ান ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে গুড়গুড়ি টানেন—সত্যি বলতে, এ-কাজের পারিশ্রমিক তাঁর ওই তামাকটুকুই—কারণ দশটা টাকা এলাউন্স তামাকের খরচা-তেই যায়। আদালতের কাজের শেষে বিকেলের বৈঠকখানা তাঁর লাইব্রেরী-ঘর। আগে কাকে নিয়ে যে বৈঠক বসত তা মোহিনীর জানা নেই

—তবে শ্যামবাবু তাঁর লালচে গোঁফের ফাঁকে কালো-পচা দাঁতগুলো দেখিয়ে একটু রসিয়ে গল্প করেছেন—'হাকিমবাবুদের বাড়ি থেকে আর্দ্দালি-চাপরাশি মারফৎ চিরকুট আসত—মেয়েলি হাতের লেখা, সঙ্গী বলতে ও-ই ছিল আর কি !' পাঁচ-সাত সেকেণ্ড ধরে সমস্ত শরীরে নিঃশব্দে হেসে শেষটায় সুস্থির হয়ে আবার বলতেন : 'তৃতীয় মুন্সেফের স্ত্রী-ত সেদিন আমায় মুস্কিলেই ফেলে দিয়েছিলেন—চেয়ে পাঠালেন 'শ্রীকান্ত'—নামটা খেয়াল করিনি, ভাবলুম বুঝিবা শ্রীমন্ত—লিখে পাঠালুম 'কমলে কামিনী' বলে একটা বই আছে, শ্রীমন্ত বইটা আমাদের নেই। কি লজ্জা—উনি ফের লিখে পাঠালেন শরৎ চাটার্জ্জির শ্রীকান্ত—প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব ! শরৎ চাটার্জ্জি—নামটা প্রথম শুনলুম—কতো লেখকই যে আজকাল হচ্ছে !' 'ভ্রমণের বই না কি ?'—জিজ্ঞেস করেছিল মোহিনী। 'কি জানি মশায়, এবার বুকলিষ্টে ঢুকিয়ে দিয়েছি নামটা !' এম্নি সুখদুঃখের আলাপ আজকাল মোহিনীর সঙ্গেই হয় শ্যামবাবুর। গুড়গুড়ির নলটা-ও তিনি এগিয়ে দেন তাকে। নলের মুখ সম্বন্ধে মোহিনীর খুঁতখুঁত আছে কিন্তু তামাকের সুঘ্রাণে ঘৃণা দমন করতে হয়—পাঁচ আঙুলে নলটাকে জড়িয়ে ধরে আঙুলের ফাঁকে সে ঠোঁট লাগায়।

ক'মাস ধরে লক্ষ্য করছিল মোহিনী বার লাইব্রেরীতে পাত্তা না পেয়ে কয়েকজন জুনিয়র উকীল টাউনহল-টাকে দল বেধে আক্রমণ করেছেন—টেনিস-ক্লাবের আইনকানুনের বেড়ায় আটকে গেছেন, ওটা বড় শক্ত ঠাঁই—এজলাসের কৌলীন্যে আটঘাট বাঁধা—তাই বাধ্য হয়ে লাইব্রেরীতেই তাঁরা ঝুঁকে পড়েছেন। শ্যামবাবু বিরক্ত হন—নিরিবিলিতে একটু তামাক খেতেন তাতেও বাদ সাধলেন এঁরা। কি যে হট্টগোল, চেঁচামেচি সুরু করে দেন—মক্কেল নিয়ে

গলাবাজির সাধ এখানে এসে রাজনীতিতে মেটাতে চান। তাতে শুধু বিরক্তিই নয়, রীতিমত ভয়ের কারণ, আছে শ্যামবাবুর। গান্ধীও আলিভাইরা আর সি-আর-দাস এসে ক'বছর আগে যে কাণ্ড করে গেলেন সহরটাতে—এখন তবু শান্ত হয়ে এসেছে চারদিক—কিন্তু এ শান্ত হওয়ার শান্তিটুকু এবার আর এই নাবালক উকীলরা পেতে দেবেন না। ওঁদের কি—বাপ-শ্বশুরের ঘাড় ভেঙে ওকালতির মুখোস পড়েছেন, সরকারের মুখের দিকে ত তাকিয়ে থাকতে হয় না। কিন্তু ট্রেজারীর চাকরিটি ঠুস্ হয়ে গেলে শ্যামবাবুর কি উপায়টা হবে! চশমার পেছনে এই গুরুতর প্রশ্নে পাকিয়ে উঠেছিল শ্যামবাবুর চোখ। মোহিনী তার আর কি জবাব দেবে! স্বদেশী ঘাটাঘাটি তাকেও কম করতে হয়নি—যতীন মাষ্টারি ছেড়ে চাষীদের নিয়ে মেতে উঠল—একবার এখানে এসে সে কি তর্ক তার মোহিনীর সঙ্গে! প্রজাদের না কি বিগড়ে যাবার অধিকার আছে! চুপ করে শুনতে হল মোহিনীকে। তিতু বললে, ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে ন্যাশন্যাল ইস্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হবে। এষ্টেটের খবর শুনবার জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেট ঘনঘন তলব করতে সুরু করলেন। মোহিনী দিশেহারা হয়ে উঠল! তিনমাস ইস্কুলে গেলনা তিতু—চরকা কিনে দিয়ে তবে ওকে ঠাণ্ডা করল বিরজা। তবু এ-সময়টাতে যে মোহিনী দারোগার কাজ করছেনা তারজন্যে নিজেকে অনেকটা হাল্কাই মনে হচ্ছিল তার। প্রজারা একটু মাতামাতি করছে করুক—মন তার ডেকে বলছিল, সব থেমে যাবে! মনের ও-ডাক মিথ্যে হয় না, থেমে ত গেল সব ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও তার ধারণা-টা সত্য বনে গেল! সাহেব যাবার সময় লম্বা সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন মোহিনীকে—বুদ্ধিমান, দূরদর্শী কর্ম্মক্ষম আরো কতো কি সব বলে। মোহিনী ওসব কিছুই নয়—

আসলে কোনো ঘটনা, বা ব্যাপার তার মনের গভীরে ঢুকতে পারেনা —মনটাই তার ওরকম চিরদিন, ছুঁয়ে যায় সব, জড়িয়ে যায় না। সন্নেসি সে হ'তে পারত—একেক সময় কথাটা মনে আসে আর মনে মনেই হেসে ওঠে মোহিনী! কিন্তু কি যেন একটা নেই বা আছে যার জন্যে কোনোদিন আর লোটাকম্বল নিয়ে বদরিকার পথে যাত্রা করা হয়ে উঠলনা। হয়ত বিরজা—বিরজার জন্যেই হয়ত যাওয়া হলনা।

"তা উকিলবাবুদের আড্ডাতে আপনাকে জড়াবে কেন উপর-ওয়ালারা?"—এই একই কথায় রোজই একবার করে শ্যামবাবুকে সান্ত্বনা দিতে হয় মোহিনীর।

"ভাববেন ওঁরা, ওসব কথায় আমারও সায় আছে!"

"তা সায় একটু থাকলই বা—দেশের স্বাধীনতা কথাটা ত খারাপ নয়!"

"খারাপ আমি বলছি না কি মশাই" চোখ-নাক-মুখ খিঁচে চাপা গলায় বলে ওঠেন শ্যামবাবু: "ভালো কথা বললেই ত বিপদ আজকাল—"কথার শেষ দিকে স্বর চড়ে ওঠে।

"তাহলে উকিলবাবুদের বলে দিন বারান্দায় গিয়ে বসতে—ঘরে কেন?" আড়মোড়া ভাঙে মোহিনী।

"যাবেন না—শুনুন—"শ্যামবাবু করুণকণ্ঠে ডেকে ওঠেন: "আপনিই কথায়-কথায় বলুন না ওঁদের একদিন!"

"বেশত বলব একদিন।"

কৃতজ্ঞতা দেখাতে গিয়ে একটু ম্লান হয়ে ওঠেন শ্যামবাবু: "কিন্তু বড্ড মুখর ওঁরা—"

"গালাগালি শুনতে আমার আপত্তি নেই শ্যামবাবু—দারোগা যে

ছিলাম তার চেয়ে বড় গালি ত আর হতে পারে না!"

খুসী হয়ে শ্যামবাবু কল্কে পাল্টাবার জন্যে মালীটাকে ডাকাডাকি করতে সুরু করেন। কিন্তু মোহিনী আর দাঁড়াতে চায়না। লাইব্রেরীতে আসা-ও এবার হয়ত তাকে ছাড়তে হবে—এখন থেকেই একটু একটু অভ্যাস করা ভালো।

উকিলবাবুদের মানানো গেল। শ্যামবাবু যে ভীরু-প্রকৃতির লোক তা তাঁরা জানতেন না। কাজেই মোহিনীর কথায় ত্রুটী না খুঁজে আসরটা তারা বারান্দায়ই সরিয়ে নিলেন। কথা একটু বেশি বলেন কিন্তু আসলে লোক এঁরা মন্দ নন। সহরে একটু-একটু করে ভালোমানুষ তৈরী হচ্ছে তাহলে! আঠারো উনিশ বছর আগে, মোহিনীর ত মনে পড়েনা, কেউ কারো কথা মানতে চেয়েছে। সি-আর-দাশের কথায় সহরের আশীভাগ লোক উঠল বসল—এ সহরের জীবনে আর কোনোদিন তা হয়নি। একবার পাদ্রী সাহেবের মেয়ে তাঁর বাংলার মাষ্টারকে বলেছিলেন—সহরের ভদ্রলোকের ছেলেরা খুনে-ডাকাত হয়ে নষ্ট হ'য়ে গেল! সহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল কথাটা—আর যায় কোথায়? বিকেলে দিঘীর ধারে বেড়াতে বেরিয়েছেন মেম—জেলাস্কুলের ফার্ষ্টক্লাশের একটি ছেলে তাঁর গাউন ধরে টান দিয়ে ছুটে পালাল! ইস্কুলের ছেলের এই কীর্ত্তি! এখন কেউ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারবেনা এ-কথা। কিন্তু এরকম হত পনেরো-কুড়ি বছর আগেও। শ্যামবাবু তাঁদের পাল্লায় পড়লে তাঁর চেয়ারের পায়াগুলো হয়ত তাঁর পিঠেই ভাঙত। শিক্ষিত হচ্ছে সহরটা—ভদ্র হয়ে উঠছে। মনে-মনে খুসী হয়ে ওঠে মোহিনী। নিজে সে বেশি লেখা-পড়া করেনি অথচ লেখাপড়া-কথাটা তার মনে কোথায় যেন আলো জ্বালিয়ে দেয়। যতীন যতোই দোষ করুক আর অপরাধ

করুক, তাতেও তার লেখাপড়া জানারই পালিশ থাকবে। যতীনের মা বলেন, সম্পত্তি সব উড়িয়ে দিল যতীন—মোহিনীও হয়ত সায় দিয়ে আফশোষ জানায়—কিন্তু ভাবতে গেলে স্বীকার করবে মোহিনী, টাকা উড়ায় মানে ত চরকা-তাঁত কিনে গরীবদের বিলোয়!

নিরিবিলি হওয়ার স্বস্তি ফিরে পেয়ে শ্যামবাবু আজকাল মোহিনীকে একটু বেশি মাত্রায় আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তার মানে মোহিনী উঠতে চাইলেও তিনি উঠতে দেন না, এমন কি চেয়ার থেকে উঠে দু'হাতে তাকে টেনে ধরেন। নিরুপায় হয়ে মোহিনী আসা-টাই কমিয়ে দিয়েছে—অনেকদিন তাই কাছারী থেকে সে সরাসরি বাসায়ই চলে যায়।

বাসায় ফিরে হাতমুখ ধুয়ে মোহিনী বারান্দার অন্ধকারে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে। খানিকক্ষণ পরেই রুটিন মাফিক হুঁকোটা হাজির করে গোপী। সতরঞ্চির উপর শীতলপাটি বিছিয়ে জিজ্ঞেস করেঃ "বাতিটা দিয়ে যাব?" যেদিন বই থাকে, বাতির দরকার হয়—নইলে ওম্নি একসময় পাটিতে শুয়ে পড়ে মোহিনী।

ঘরের এক কোণে ছোট একটা টেবিলের উপর থেকে মিতুর বই-কাগজ-পত্র নাড়াচাড়ার খসখস শব্দ আসে—গুনগুনানিও আসে বই পড়ার। পড়াশুনোতে ওর ঝোঁক আছে—হাবুলের মতো এতোটা-নয়, তবু আছে। কিন্তু তিতু একেবারে আলাদা। পড়ার বই ছাড়া আজে-বাজে বই-এ সে খুব রাজি। বাসায়ই আসেনি এখনো—শুধু আড্ডা, ঘোরাফেরা আর বাজে বই নিয়ে সময় নষ্ট করা! অনেকটা তার নিজেরই মতো হয়ে উঠছে তিতু—তাই তাকে কিছু বলতে গিয়েও মোহিনীকে হঠাৎ থেমে যেতে হয়। তাছাড়া পরীক্ষা পাশ করে যাচ্ছে যখন—কিছু বলতে যাওয়াও

বা কেন? শুধু তিতুকে নিয়ে কেমন যেন একটা অস্বস্তি মাঝে-মাঝে মোহিনীর মাথায় ঘোরাফেরা করতে সুরু করে। অশান্তই হয়ত হবে তিতু—একসময় মোহিনীও যেম্নি অশান্ত ছিল। বিরজা বলে কারো সঙ্গে ওর মিল নেই—ও একটা দৈত্য—আতঙ্কে গলা বুজে আসে বিরজার তবু বলে, 'বেশিদিন ও কিছুতেই বাঁচবেনা!' ছটফটে ও অনেক বেশি—কিছু মানতে চায়না—পৈতেটা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—তাই ভয় পেয়ে গেছে বিরজা—তাই হয়ত বলে, কারো সঙ্গে ওর মিল নেই। ও জানেনা—মিল আছে। হঠাৎ মোহিনীও হয়ত বলবে, মিল নেই—কিন্তু তার ভেতরের একটা অস্পষ্ট চেহারার সঙ্গে বুঝিবা তিতু হুবহু মিলে যায়। তাতে তার আনন্দ কি অস্বস্তি ঠিক বুঝতে পারে না মোহিনী। তাই একটু থিঁতিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে সুর মিলিয়েই বলে, ছেলেটা অদ্ভুত!

"বাবা, তিতু কবিতা লিখেছে—" মিতুর ভারিক্কি গলার নালিশে মোহিনীর তন্দ্রা ভেঙে যায়।

"এই এলো—আর এসেই কবিতা লিখ্‌তে লেগেছে—" সুর চড়ে যাচ্ছে মিতুর।

মোহিনী উঠে এসে হাসিমুখে বলে: "কবিতা? কবিতা কেন?"

"কিসের!" খোলা খাতা বন্ধ করে নিঝুম হয়ে যায় তিতু।

"কিসের! তুমি কবিতা লেখোনা? 'ধূমকেতু'-তে তোমার কবিতা ছাপা হয়ে আসেনি?"

"সে আরেক তিমির চৌধুরী—আমি হতে যাব কেন?" হাসিতে চোখ চিকিয়ে ওঠে তিতুর।

"ধূমকেতু আবার কি?" মোহিনী খাটের উপর গিয়ে বসে।

"স্বদেশী কাগজ ধূমকেতু।"

"ও, অনেকদিন আগেই উঠে গেছে!"

"কিন্তু কবিতা লিখেছ ত তুমি—নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' নকল করে!"

"নকল করে মানে?"

"সবাই ত বলছে তাই!"

"সবাই'রা যেমন মানুষ তেমনই ত বলবে! ওরা ভাবে, নকল ছাড়া লেখা যায় না!"

মোহিনী হাসতে থাকে—সে জানে এ দৃশ্যে তার শুধু সাক্ষীগোপালের ভূমিকা। মিতু একা ঝগড়া করতে আরাম পায়না বলেই তার ডাক পড়ে। খাটের উপর আবছা অন্ধকারে বসে মোহিনী তিতুর দিকে তাকিয়ে থাকে—দেখতে ঠিক তার মতো নয় তিতু তবে নাক আর ঠোঁটের গড়ন একই রকম আর চুলগুলো। থোলো-থেলো চুল কপাল, কান আর ঘাড় ডুবিয়ে রেখেছে—আশ্চর্য্য, কলেজে পড়বার সময় বাব্‌রির ধরণে মোহিনীও এম্নি চুল রাখত। তিতু-ও তা-ই! আশ্চর্য্য!

মিতু চুপ করে গিয়ে আবার বই-এ ঝুঁকে পড়েছে—আর অগোছাল বই-এর স্তূপে কি যেন খুঁজে চলেছে তিতু। মোহিনীর এখন আর কোনো ভূমিকা নেই। চুপচাপ সে উঠে যায়—বারান্দায় এসে আবার দাঁড়ায়। আকাশটা ঝিকঝিক করছে তারায়। একদম ভরাট। তাকালে ভালো লাগে—নিখুঁত মনে হয় চারদিক। লিচুর কলমটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে ত—ডালে-পাতায় বেশ খানিকটা অন্ধকার জড় করেছে মাথায়। ওর পাশেই চাঁপা গাছটা ছিল—এসময়ে ফুল ফুট্‌ত—বিরজা কেটে ফেল্‌লে। সাপ আসত না কি গাছটার নীচে, বিরজা দেখেছিল একদিন! 'বাড়িতে সাপ ডেকে

আনতে সুগন্ধে আমার কাজ নেই বাপু!' সবার প্রাণটুকু নিয়ে ভয়ে-ভয়ে আছে বিরজা—যোগেশবাবু আর মেয়েটা যাবার পর থেকেই যেন ভয় ওর আরো বেড়ে গেছে।

গোপীর এসময়ে পনেরো-বিশ মিনিট ছুটি—রাস্তার ধারে গোয়ালার ঘরে গিয়ে একটু আড্ডা দিয়ে আসে সে। গান গেয়ে না কি নাচেও ওখানে—তিতু বলছিল। তিতু ওকে খাতির করে খুব—বলে, মুখ-গুমরো নয় বলেই লোকটা ভালো—ফুরতি আছে। রান্নার কাজ এখনও শেষ হয়নি বিরজার—রাত্রিতেও ওর ঘটা করা চাই। অনেক বাসায়ই রাত্রিতে শুধু ভাত ফুটিয়ে নেয়, দুপুরেই মাছ-তরকারীর ঝামেলা চুকিয়ে রাখে। কিন্তু বিরজার তাতে মন ওঠেনা—সদ্য রান্না ছাড়া কারো পাতে কিছু ও দিতে রাজি নয়। গোপী পান্তার জন্যে কান ঝালাপালা করে—কিছুতেই গোপীকে ও পান্তা দেবেনা—গরম ভাতে জল ঢেলে নেয় গোপী, কি আর করবে!

মোহিনী রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি দেয়—অবসর হয়ে আসুক বিরজা। ছেলেদের কাছে আসুক—পাঁচদশ রকমের একটু কথাবার্ত্তা হোক—মোহিনী দেখে শুনে আরাম পা'ক। উঁকিতেই সবটুকু ইচ্ছা বুঝিয়ে দিতে চায় সে। বিরজাও বোঝে। হাতের কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে হাত মুছতে মুছতে মোহিনীর সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আজ মোহিনী অবাক্ হল, এমন গা ঘেঁষে ত কোনোদিন আর ও দাঁড়ায়নি এসে! কি হল? কি বলতে চায় বিরজা?

সভয় দৃষ্টিতে এক পলক শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বিরজা ফিসফিস করে বলে: "তিতুকে নিয়ে যে কি উপায় হবে ভেবে পাচ্ছিনে!"

মোহিনী কথা বলেনা—ঠোঁট শুকিয়ে ওঠে তার।

"ও-বাড়ির কিরণটা আসে—আমি ত ভেবেছি ওম্নি—তিতুর সঙ্গে মাখামাখি করতে যে আসে বুঝতে পারিনি—ঠোঁট টিপে-টিপে হাসে, ওদিন তিতুর গায়ে কি একটা ছুঁড়ে দিলে—চিঠিই হবে, চোখে পড়ে গেল আমার!"

মোহিনী মুখ নামিয়ে ফেলে—এবারও কিছু বলেনা।

"মা-মাসীর চেয়ে এক কাঠি উপরে উঠেছে মেয়েটা—তিতুকে নষ্ট করে ছাড়বে!"

"ওকে আসতে বারণ করে দাও—" হাতের আন্দাজে একটা কিছু বলে মোহিনী উঠোনে নেমে পড়ে। মনে হয়, বিরজা তারপর যে কথাগুলো বলবে তা যেন আগে থেকেই তার পেছু ধাওয়া করেছে।

"ধেৎ—" ধমক দিয়ে বিরজা ঘরের ভেতর চলে যায়। নিজেকেই হয়ত ধমক দিল সে, মোহিনীকে নয়। কেনই বা মোহিনীকে বলতে গেল কথাটা—বলে কিছু লাভ নেই। তাই বলবেনা ঠিকই করে নিয়েছিল একবার কিন্তু হাবুলের চিঠি এসেছে আজ—হাবুলের কথা ভাবতে ভাবতে যতো ভালো লাগছিল, ততই আরেক দিকে মনটা কালো করে তুলছিল তিতু। কি সর্ব্বনাশা বুদ্ধিতে যে ওকে পেয়ে বসে এককেসময়! কোন্ এক মুসলমান বন্ধুর বাড়ি গিয়ে 'খানা' খেয়ে এসেছে একদিন! বিরজার নিজের যে তাতে খুব একটা আপত্তি আছে তা নয়—কিন্তু আত্মীয়-স্বজনরা শুনলে কি বলবে! এম্নিতেই ত পায়ে ধরে কাউকে প্রণাম করেনা—তার জন্যে মার কাছে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিল বিরজা। বাবা-কাকা-দাদার বয়সীরা ঠাট্টা করতেন তাকে: "ছেলেদের যে সাহেব তৈরী করে তুলেছিস, তুই!" তবু হাবুলকে দিয়ে খানিকটা মুখরক্ষা। লিখেছে, 'মা যোগী-মহাপুরুষরা এখনও অনেক আছেন। আমার এক মহাপুরুষের সঙ্গে

পরিচয় হয়েছে—ভোলানন্দ গিরির মতোই জ্ঞানী, সর্ব্বদ্রষ্টা। তিনি আমার কপালের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। আমার মনোবাসনা ত বড়লোক হওয়া…।' হাবুলটা এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেছে—ছেলেমানুষের মতোই সোজা, সরল মন! বলে, বড়লোক হবে! বড়লোক হয়ে আমার কাজ নেই, ওমি বেঁচে থাকলেই আমার সব হ'ল!

মোহিনী ফিরে এসে আবার দরজায় মাথা-ঢুকিয়ে দিলে: "হুঁ—শোনো—ওকে, তিতুকে কিছু বলোনা কিন্তু।"

বিরজা উত্তর দিলনা, চুপচাপ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে মোহিনীর পাশ কাটিয়ে শোবার ঘরে চলে এল।

উঠোনের সরু পথটুকুতে পায়চারি করতে লাগল মোহিনী। অন্ধকার থাকাতে যেন ভালোই হয়েছে, কেউ তার চোখ-মুখ দেখতে পাবেনা। তিতু যদি সত্যি তার মতোই হয়, কি করতে পারে সে? তার মতো হয়ে সে যদি আর না থামে—যেখানে এসে থেমে গিয়েছিল মোহিনী সেখানে যদি না থামে তিতু তখনও কি তার কিছু করবার নেই? শাসন করা যায়—একটা এষ্টেট দেখাশোনা করছে যখন মোহিনী, শাসন সে করতে জানে। কিন্তু তাকে কি কেউ শাসন করেছিল? শাসন করেনি। তার দিকে তাকাবারই কেউ ছিল না, কে আর শাসন করবে! নিজেকে নিয়েই মা ব্যস্ত ছিলেন, ছেলেদের কি হল-না-হল কে তার খবর রাখে! বিরজা! বিরজাই থামিয়ে দিয়েছিল তাকে—শাসন করে নয়, অনুযোগ করে নয়—শুধু নিজের উপস্থিতি দিয়ে মায়া-মমতার, স্নেহের চোখ বুলিয়ে।

বিরজার মতো মা ছিলনা তার, তিতুর আছে। কিন্তু বিরজার চোখেও একটা আতঙ্কই দেখতে পেল মোহিনী—এই আতঙ্ক দিয়ে কি

মা ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারে নিজের কাছে ?

মোহিনী পথ খুঁজে পায়না। তাই তাকে ঘনিষ্ঠ হতে হয় তিতুর কথায়। কি এমন অন্যায় করছে তিতু? কলেজের প্রফেসর-প্রিন্সিপাল, বন্ধুবান্ধব কেউ ত ওকে খারাপ বলে জানে না! একটি মেয়েকে ভালো লাগে বলেই কি ও খারাপ হয়ে যাবে ? হতেও ত পারে বোন নেই বলেই বোনের ক্ষুধা মিটাতে চায় ও কিরণকে দিয়ে। চিঠি দেওয়া ? কথা বলবার সুযোগ নেই বলেই হয়ত চিঠি দিতে হয়। তিতু নষ্ট হয়ে যাবে, মোহিনীর মনের একটা ক্ষণিক উন্মাদনারই ভাগী হবে ও -ওর মনে আর কোনো গুণ থাকবেনা, বিরজার মনের ছোঁওয়া একটুও থাকবেনা, তা কি হতে পারে? তিতুকে ওভাবে কেন ভাবছে বিরজা ? এ-কথাটাই আবার সে জিজ্ঞেস করবে ওকে।

অন্যমনস্ক থেকেও মোহিনী এসে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকেই তার খেয়াল হয় বিরজাকে যে একা পাওয়া যাবেনা। ছেলেদের সঙ্গে আলাপে জমে গেছে তাদের মা। কৌতূহলী দর্শকের মতো খাটের উপর চুপচাপ বসে পড়ে মোহিনী।

"ক্লিওপেট্রা—ক্লিওপেট্রা নাটক পড়ে তুই ত বুঝবিনে কিছু! না মা—তুমি দাদাকে ও-বই আনতে লিখোনা—" কথার ঝাঁটায় মিতুকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে তিতু বই ঘাঁটতে সুরু করে।

"তুমি ?" মিতুর মুখ গরম হয়ে ওঠে : "তুমি স্যাট্‌কেস্ দিয়ে কি করবে ? কাপড়জামা ময়লা করে বাইরে ফেলে রাখে—তার আবার স্যাট্‌কেস্ !"

"তাই ত স্যুটকেস কেন—ট্রাঙ্কই ত ভালো !" পাখা নেড়ে হাওয়া খায় বিরজা !

"ট্রাঙ্ক!" তিতু ফিক করে হেসে ফেলে : "স্যুটকেস্ যে কি তা

তুমি জানোনা বলেই বলছ! ও কি আর কুলীর বোঝা? হাতে করে দিব্যি নিয়ে যেতে পারবে! তাছাড়া—" তিতু ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল্লে: "ঘরটা ভালো দেখায় না কয়েকটা স্যুটকেস না থাকলে।"

"ঈস্ বাবুগিরি দেখানো হচ্ছে—" মিতু ফোঁস করে ওঠে।

"বাবুগিরি করতেও জানতে হয়—তোর মতো পণ্ডিতকে দিয়ে বাবুগিরিও হবেনা—জুতো কিনে ফেলে রাখিস, পায়ে দিতে জানিসনে—বুঝতে পারিস ত!"

মিতু ভুরু কুঁচকে মারই শরণ নেয়: "দাদাকে লিখবে ত চিঠি কাল? আসবার আগেই চিঠি পৌছবে ত?"

"তোর বই-এর নাম তুই-ই লিখে দিস বাপু—ও-নাম আমার মনে থাকবেনা।" বিরজা জোরে জোরে পাখা নাড়ে: "গরমে মরে যাচ্ছি! তুই কি করে গেঞ্জিটা গায়ে রেখেছিস রে তিতু!"

"ও, মনে ছিলনা—" গেঞ্জিটা খুলতে-খুলতে তিতু হাসতে থাকে।

"ছাখো—শোন কথা! গরম লাগছে যে তা-ও ওর খেয়াল নেই!"

"কিসের খেয়াল নেই! খেয়েদেয়ে আবার বেরোবার মতলব, তা জানো না বুঝি?" মিতুর লড়ায়ে গলা শান্ত হলনা।

"কি করে জান্‌বে মা? তোর মতো সবজান্তা ত নন!"

"মা তোমার আদুরে ছেলেকে বল—ভালো হবে না কিন্তু—" মাকে শাসানি দেয় মিতু।

"তিন বছরের ছোট হয়ে তুই তিতুর সঙ্গে এম্নি ঝগড়া করতে পারিস না কি!"

"ওর ঝগড়া নয় কার সঙ্গে—ক্লাশের একটি ছেলের সঙ্গে ওর ভাব আছে? ওর বন্ধু আছে কেউ?"

নিঃশব্দ হাসিতে মোহিনী দৃশ্যটা উপভোগ করে চলছিল। এবার কথা বলতে হ'ল—বড্ড একা পড়ে গেছে মিতু—ওর পক্ষে কেউ নেই।

"পড়াশুনো ছেড়ে নাটক পড়ছে বুঝি মিতুবাবু—" মোহিনী যেন নেশার আমেজে বিন্দু বিন্দু হাসতে স্নুরু করে।

"ইস্কুলে 'মুকুট' নাটকে পার্ট করেই ওর মাথা গরম হয়ে গেছে—"

"তোমার ত নাটক না করেও মাথা গরম—কোথায় কোন্ গানের জলসা হচ্ছে আমি ত তা খুঁজতে বেরোই না!"

থাক্—ওদের কথা আর না—ঝগড়ায় মাতিয়ে তুলে আর কাজ নেই ওদের। মোহিনী অন্য কথায় চলে আসতে চায়। হাবুলের কথায় মন আর মাথা যেন খানিকটা বিশ্রাম পায়—খানিকটা ঠাণ্ডা আলো ছড়িয়ে পড়ে চোখের সামনে। ভবিষ্যতের একটা ঠাণ্ডা ছবি। লেখাপড়া করার গুণটা যতীনের কাছ থেকেই পেয়েছে হাবুল—যতীনের মতোই এম-এ পাশ করে সে ঠিক বেরিয়ে আসবে। ভালো পাশ করলে ত কথাই নেই—কলেজে চাকরি বাঁধা। প্রফেসর! দেড়শ টাকা মাইনেটাই সব নয়—ও-চাকরির সম্ভ্রম, খ্যাতি আর খাতির কতো! এখন ত প্রফেসররাই সহরের সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি—উকিলরা আর নন। অসহযোগ আন্দোলন ভেস্তে গিয়ে উকিলদের সম্মানের দাগও যেন খানিকটা নীচে নেমে গেছে। হাবুল তাই ল' পড়তে চায়না। আর একটা বছর। ভালোয়-ভালোয় পাশ করে আসুক হাবুল—ভালোয়-ভালোয় হাবুলকে এনে দাও ঠাকুর! কয়েক মুহূর্তের জন্যে প্রার্থনার মতো ব্যাকুলতা জেগে ওঠে মোহিনীর মনে। চোখ বুঁজে আসতে চায়—অম্নি ধড়ফড় করে জেগে উঠে বলে: "হাবুল এসে তোমাদের পড়াশুনোর হিসেব তলব করবে কিন্তু!"

"আই-এ পরীক্ষা দু'মাস পড়েই দেওয়া যায়!"

মোহিনী অবাক চোখে তিতুর দিকে তাকিয়ে রইল।

"ক'টা আর বই? দু'মাস-ই ঢের সময়!" তিতু আবারও বলে।

মোহিনীর যেন হঠাৎ মনে পড়ে—সত্যি কথা! তিতু সত্যি কথাই বলছে! পর-পর পরীক্ষা পাশ করে যাচ্ছে ও—কিন্তু কোনোদিন ওকে বেশি পড়াশুনো করতে দেখেনি মোহিনী—হাবুলের মতো ত নয়ই, এমন কি মিতুর মতো-ও নয়। মনে পড়ে, টাউনহলের মাঠে একদিন প্রিন্সিপাল মোহিনীকে বলেছিলেন: "একটু পড়াশুনো করতে বলুন তিমিরকে—আই-এ-তে ও স্কলারশিপ পাবে!" কিন্তু মোহিনী বলেনি—ছেলেদের পড়াশুনো করবার জন্যে শাসন করা দূরে থাক সামান্য পীড়াপীড়িও সে করতে পারে না। পড়াশুনোর জগতের সঙ্গে তার বেশি পরিচয় নেই, তাই তা নিয়ে সরাসরি কথা বলতে কেমন যেন তার সঙ্কোচ হয়—মনে হয় অনধিকার চর্চা। তবে বিরজা ওদের ছেড়ে দেয়না। "তোরা শঙ্করের মতোই মুখ্যু হবি—একটা উপাধি পর্য্যন্ত হলনা ওর! বাবার নামে কালি দিয়েছে শঙ্কর! তোরা-ও তা-ই দিবি!"—বিরজা তিতুকে বলেছে অনেকদিন। তিতু জবাব দিয়েছে: "যতীনদাকেও তা-ই বল্‌তে তুমি!"—"ও-বিদ্যে নিয়ে যতীনের কি হল? মুখ্যুই রয়ে গেল। চাষাভূষো ছাড়া আর কার কাছে খাতির আছে ওর? জাত মানে না —ধম্ম মানে না—" নিজের কথায় নিজে থেকেই বিরজা হাসতে সুরু করে। "জাতের নামে বজ্জাতি দেখ জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া—" কবিতা বলতে থাকে তিতু। "তোর কি! তুই ত বলবিই! জাত দিয়েই আছিস তুই!"—বিরজা থেমে যায়। কিন্তু থেমে যায় তখনকার মতো। যে-কোনো ছুতোনাতায় আবারও পড়ার কথা খুঁচিয়ে তোলে। বিরক্ত হয়ে তিতু দু'চারদিন পড়ায় ভীষণ মনোযোগ

দেয়। বিকেলে বাসা থেকে বেরোয় না—বন্ধুরা ডাকতে এলে শরীর খারাপ বলে ওদের বিদায় করে দেয়। তখন আবার বিরজাকেই বলতে হয়ঃ "বিকেলবেলা বই নিয়ে কে বসে থাকে রে!" হয়ত বিরজার সন্দেহ হয়, বই নিয়ে তিতু বসেই থাকে—বসে থাকে কিরণের অপেক্ষায়।

মেয়েদের জন্যে আকর্ষণ তৈরী হয়ে উঠছে তিতুর মনে—তিতু বড় হয়ে উঠেছে! হাবুলেরও হয়ত আছে এ-আকর্ষণ, তারা জানেনা বলেই যে নেই তা কি হতে পারে? ছেলেরা বড় হয়ে উঠেছে! ছেলেরা বড় হয়ে উঠেছে, তবু ত মোহিনীর মনে এ-আকর্ষণ একেবারে ক্ষয়ে যায়নি। বিরজার মুখে শুনে-শুনেই নিরুপমার উপর একটা আকর্ষণ এসেছিল মোহিনীর—সে-খবর হয়ত নিরুপমাও জানেনা। দশ বছর হয়ে গেল নিরুপমার বিয়ে হয়েছে—দু'টি ছেলে একটি মেয়ে নিয়ে মাঝে-মাঝে বাপের বাড়ি এলে বিরজার কাছেই সবসময় বসে থাকে। মোহিনী কথা বলে—ডালভাতের কথা, পিরোজপুরের ওর শ্বশুরঘরের লোকজনের কথা। খবরের কাগজ পড়বার চেয়ে একতিল বেশি উৎসাহ দেখায়না সে। এমন কি কুশল প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেনা। তবু মোহিনী বুঝতে পারে হৃদ্‌পিণ্ডের কাজটা যেন একটু জোরে জোরে চলেছে—যেন সমস্ত শরীরে ঝিমুনি ধরে গেছে হঠাৎ। এখনও এ আকর্ষণের বেড়া ডিঙিয়ে আসতে পারেনি মোহিনী। ছেলেরা বড় হয়ে উঠছে—তবু।

মোহিনী খাট থেকে উঠে দরজার দিকে এগোতে থাকে। ছেলেরা চুপচাপ পড়ায় বসে আছে। যেন চুপিচুপিই সে গুপীকে ডেকে বলে খাবার জায়গা করতে।

তিন

মিতুকে তিতু ছেলেমানুষ ভাবে বলেই হয়ত তিতুর উপর ওর যতো রাগ। তিতুর সাহিত্য-সভায় যেই মিতুর নাটক করবার ডাক পড়ল ওম্নি ওর তিতুর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেল। তিতু চালাক ছেলে, ওভাবেই মিতুকে হাত করে নেয় সে—তার বাইরের খবর মিতু যাতে বাড়ি এনে না পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করে ফেলে। তখন আবার মিতু তিতুর ওকালতি করতেও এগিয়ে আসে। মোহিনী দেখেশুনে মজা পায়। দাদার সঙ্গে এধরণের সম্বন্ধ ছিলনা তার—এতো মেশামেশি, এতো ঝগড়া কল্পনাও করতে পারতনা সে। বড় বলে দাদাকে শ্রদ্ধা করতে হয়, তা-ই সে জান্‌ত— দাদাও জানতেন ছোটভাই বলে তাকে ক্ষমা করতে হবে। কোনোদিন দুজনের এক জায়গায় এসে দাঁড়াবার উপায় ছিলনা। তবু খারাপ লাগতনা তার। হাবুল ঠিক সে-ধরণ পেয়েছে। কিন্তু তিতু-মিতুর ধারা আলাদা। তবে দেখতে এদের খারাপ লাগেনা মোহিনীর। অনেক বাপমায়ের চোখেই হয়ত খারাপ লাগবে—মাষ্টারবাবুর ছেলেরাইত অন্যরকম—ছোটরা বড়দের পায়ে ধরে প্রণাম করে—তুই-তুকারির চল নেই ওবাড়িতে। কর্ত্তামশাই-এর ছেলেরাও বা কি—কারো সঙ্গে কারো কথাই হয়না একরকম—তৃতীয়-পুরুষে কথাবার্ত্তা চলে। ভাবতে গেলে কেমন যেন খটকা লাগে মোহিনীর—মনে হয় বড্ড সেকেলে। সে নিজে যা করেছে তা-ই যে ছেলেদের করতে হবে তার কি মানে আছে? সে বরং মনে-প্রাণে চায় ছেলেরা অন্যরকম হোক। অন্যরকমই হচ্ছে ওরা—তিতুও ঠিক তার মতো নয়—ভাবতে গেলে মোহিনী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

টাউনহলে পনেরোদিন ধরে বায়োস্কোপ চলছে। তক্ষশিলার কাহিনী নিয়ে নাকি ছবি দেখান হচ্ছে আর তারি লোভ দেখিয়ে মিতুকে জুটিয়ে নিয়েছে তিতু। তার আগে তিতু তার মাকেও টেনে নিয়েছিল: "শরৎবাবুর বই দেখান হচ্ছে মা—'আঁধারে আলো' —সবাই দেখছে তুমি দেখবে না?" ইচ্ছা তেমন ছিলনা বিরজার, তবে সবাই দেখছে বলেই গিয়েছিল দেখতে। 'তোমার পরশ অমৃত সরস নয়নে তোমার দিব্য বিভা।'—ছবি থেকে শিখে-আসা কবিতাটা মুখে নিয়ে ফিরেছে ক'দিন তিতু। বিরজা বলেছে—"ছবির মেয়েটা কলকাতার মেয়েদের মতোই সুন্দর!"—তারপর গল্পটার কথা মনে পড়তেই মুচকি হেসে বলেছে: "ওদের কাশীই চলে যেতে হয়!" —শেষে মোহিনীর দিকে তাকিয়ে বলেছে: "দেখে আসুক ছবিটা!" দেখতে গিয়েছিল মোহিনীও। শ্যামবাবু যে শরৎবাবুর কথা বলেছিলেন তাঁরই লেখা গল্প। শরৎবাবু কে? বেশ গল্প তৈরী করেন ত তিনি! মোহিনী যেন নিজেরই ছবি দেখে এল অনেকটা। শরৎবাবু এসব ঘটনা কি করে জানলেন? তার ঢাকার ঘটনার মতো ঘটনা কি আরো হয়? অবাক হয়ে গিয়েছিল মোহিনী। তিন চারদিন নাগাড়ে ছবিটার টুকরো-টুকরো ঘটনা তার চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেছে—আর আবছা আলোয় মাঝে-মাঝে এসে উঁকি দিয়েছে ঢাকার বুড়ীগঙ্গার পারে একটি মেয়ের মুখ। ছবির মেয়েটির সঙ্গে তার মুখের মিল আছে কিনা বুঝবার উপায় নেই তবু এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে সে। আর একটু অস্বস্তিও বোধ করেছে মোহিনী বিরজার ওই কথাটা ভাবতে গিয়ে: "দেখে আসুক ছবিটা।" বিরজা কি জানে, শুনতে পেয়েছিল তার ঢাকার কাহিনী? কিন্তু কোনোদিন ত জিজ্ঞেস করেনি তাকে—রাগ করে

গাল দিয়েছে কিন্তু এ-নিয়ে টু-শব্দও করেনি কখনও! মোহিনী ভাবত, বিরজা জানেনা! জানে ও সব, বৌঠান-দাদা-মোহন সবাই জানে যখন, বিরজা কেন জানবেনা। নিজেকে লুকিয়ে রাখবার কথা আগে কোনোদিন মনে হয়নি তার—ভেবেছে দরকার নেই—আজ মনে হয় দরকার ছিল। যে-পথে চিরদিন চলা যায়না, সে-পথে বুক ফুলিয়ে হাঁটবার কোনো মানে নেই। নিজের ভালোমন্দ সবটুকু বাইরে টেনে এনে বাহাদুরী করা যায় কিন্তু দুনিয়ার তাতে কি লাভ-টা হল? আড়ালে-আবডালে কিছু লুকিয়ে রাখে যদি মানুষ, তাতে কারো কোনো ক্ষতি নেই। ভুলটাকে বাইরে টেনে এনে তার গলায় ফাঁসী পরাবার চেষ্টা করলেই কি সব চুকে-বুকে যায়? তা নয়, ওটাকে মনের ভেতর লুকিয়ে রেখে সেখানেই যদি ক্ষয় করে ফেলতে পারো তাহলেই তুমি নিজে বাঁচলে, দুনিয়াকেও বাঁচালে।

বারান্দায় আজ সত্যিকারের একলা বসে আছে মোহিনী। ঘরের ল্যাম্পেও সলতে নাবানো। রান্নাঘর থেকে বেরোবার জন্যে তাড়াহুড়ো করছে বিরজা। তিতুর কথা-টা সবিস্তারে বলবার এমন সুযোগ আর ও পাবেনা। তার ভূমিকা করে গেছে আগেই—অবসর হয়ে এসে মূল কাহিনী সুরু করবে। কোন্‌দিক নেবে মোহিনী তা-ই ভাবছিল। হয়ত বিরজার কথায়ই সায় দিয়ে যেতে হবে কিন্তু তাতেই কি তিতুর জন্যে তার দুর্ব্বলতা নেই এমন কথা বলতে পারে মোহিনী?

কিন্তু কেন? বিরজার কথায় সায় দিতে হবে কেন তাকে? তার স্বভাব নিয়ে বিরজা কথা শোনাতে পারে সেই ভয়ে? কিন্তু সরাসরি কোনো কথা ত বলবেনা বিরজা—মোহিনী তা জানে।

তবে? তবে ভয়টা কিসের তার? আসল কথা বিরজাকে পাশ কাটিয়ে যাবার শক্তিই তার নেই। কোনোদিনই ছিলনা। বউ হয়ে যেদিন ও এসেছিল, তার রূপ ছিলনা সত্যি কথা কিন্তু সমস্ত শরীরে বয়েসের মোহ ছিল। মোহিনীর যেন ওটারই দরকার ছিল—রূপের যে কোনো মানে আছে তা তার মন জানতে চায়নি! দরকার! দরকারটাই সত্যি। সবসময় এই দরকারই—নানারকম দরকার—মিটিয়ে এসেছে বিরজা। তারি জন্যে মোহিনীর মন কৃতজ্ঞ। ভালোবাসা নয়, স্ত্রৈণতা-ও নয়—কৃতজ্ঞতা। তাই বিরজাকে পাশে ঠেলে দেওয়া যায়না। তার চেয়ে আপন ভাবা যায়না আর কাউকে।;

মোহিনী চমকে উঠল। ভারি, রুক্ষ গলায় কে যেন তাকে ডাকতে সুরু করেছে: "মোহিনী আছ নাকি—ও মোহিনীবাবু—"

সাড়া দিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার আগেই আহ্বায়ক নেপথ্য ছেড়ে দৃষ্টিপথে চলে এলেন। কবাটের আড়াল থেকে ল্যাম্পটা তুলে এনে সল্‌তে উস্কে দিয়েই মোহিনী অবাক হয়ে গেল: "আরে—সুরেশ! কি আশ্চর্য্য, ক'দিন ধরে তোমার কথা মনে পড়ছিল হঠাৎ!"

চেয়ার ছেড়ে দিয়ে শীতল-পাটিতে বসে পড়ল মোহিনী—সুরেশ স্বচ্ছন্দচিত্তে চেয়ারটা দখল করে বল্‌লে: "আমার কথা? সত্যি আশ্চর্য্য!"

"কি করে এমন হয়? কতোদিন দেখা নেই—দেখা হবার কথাও নেই—অথচ তোমাকে মনে পড়ল আর তুমি এসে হাজির!" মোহিনীর চোখে তখনও বিস্ময় কেটে যায়নি।

"ঠাকুর যেমন মনে করান—ঠাকুরই এনে হাজির করান!"

গালের গর্ত্তের দরুণই হয়ত সুরেশের কথার শব্দগুলো নিটোল হতে পারছিলনা।

ঠাকুর! হঠাৎ যেন মনে পড়ল মোহিনীর—ঠিক, ঠিক—বুকের উপর যোড়হাত ছুঁইয়ে সুরেশই ঠাকুর কথাটা বল্‌ত। অনেক শুনেছে সে—অথচ ভুলে গেছে। কিন্তু সত্যি কি ভুলে গেছে? তা-ত নয়। অজান্তেই ও-কথাটা আজকাল তার মনের উপর উঠে আসছে—কোনো দেবদেবীর নাম নয়—শুধু ঠাকুর—অজান্তে উঠে আসছে কিন্তু সুরেশের কাছেই জেনেছে সে এ-নাম।

মোহিনী চুপ করে আছে বলেই চুপ করে রইলনা সুরেশ: "চপলা—আমার বড় মেয়ে—দিয়ে যেতে এসেছিলাম জামাই-র বাসায়। মোক্তারী পাশ করে এখানেই বসল অতুল। অতুল চক্রবর্ত্তী—একটু দেখো ওকে মোহিনী! তোমরাই ত সহরের মুরুব্বি-মাতব্বর!"

"আমরা?" মোহিনী আন্তরিক বিষণ্ণতায় হাসল একটু: "তবে এষ্টেটের কাজকর্ম্ম বেড়ে যায় যদি—কিছু মামলা পাবে তোমার জামাই! কিন্তু এখন সময়টা বড্ড খারাপ—"

"খারাপ আমাদের—সবার নয়—সবার নয়—" এক ঝলক হাসি না কি চীৎকার উঠল সুরেশের মুখ থেকে, বোঝা গেলনা: "নাও—তামাক কই?"

গুপী নেই জেনেও মোহিনী একবার ডেকে চেষ্টা করে দেখল: "রোজ এসময়ে ওর বেরোনো চাই"—গুপীর উদ্দেশ্যেই খানিকটা বিরক্তি বর্ষণ করে শেষটায় হতাশ হয়ে যেতে হল তাকে।

"তামাকের বৈঠকটা কোথায়—আমি সেজে নিচ্ছি—"

"তুমি কি সাজবে—" সুরেশের সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী উঠে দাঁড়াল।

"বোসোনা—তামাক সেজে খেলে জাত যাবে না আমার!" ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে সুরেশ ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

মোহিনী বসে রইল বাইরে। পাগলাটে হয়ে গেছে সুরেশ। গাঁয়ে যারা থাকে তারা সবাই যেন এমনি পাগলাটে হয়ে যায় শেষটায়। সুরেশ না-হয় গাঁজা খেত কিন্তু গাঁয়ের স্কুলের হেডমাষ্টার মুকুন্দ ঘোষাল—একদম উন্মাদ—কি যে বলে তার মাথামুণ্ডু নেই! গত বছর ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে এলেন—সে কী পোষাক—ছেঁড়া, কোঁচানো একটা চাপকান, উই-এ-খাওয়া শামলা মাথায় আর পায়ের গোড়ালি দেখা যায় এম্নি খাট একটা প্যাণ্টুলন! এক বেলা খেতে বলেছিল মোহিনী। শুক্ত মুখে দিয়েই আরামে চেঁচিয়ে উঠলেন: "বাঃ—চমৎকার! শিরোমণিমশাই-এর মেয়েদের হাতের গুণই আলাদা! জানো ত মোহিনী, তুমি আমার ভায়রা-ভাই হতে—ঠাকরুণের দিদির সঙ্গে আমার বিয়ের আলাপ চলেছিল প্রায় একবছর!"—বদ্ধপাগল! হালদারমশাই-ও বা কি—শেষটায় মামলা ছাড়া ওঁর মাথায় আর কোনো পদার্থই ছিলনা। মামলা করতে গায়ে জ্বর নিয়ে ছুটে এসেছিলেন মহকুমা-সহরে—রক্তঅতিসারে ধরল সেখানেই—বাড়িতে আর ফিরে যেতে পারলেন না। দাদাও—শোনা যাচ্ছে—না কি অদ্ভুত হয়ে গেছেন। গুম্ হয়ে বসে থাকেন—কারো সঙ্গে কথা নেই—রোগা হয়ে যাচ্ছেন দিনদিন! তার মানেই মাথা ঠিক নেই। আর সুরেশকে ত দেখছে এই! কোন্‌টা উড়নি কোন্‌টা পৈতে বোঝা যাচ্ছে না—দড়ির মতো ওই উড়নি গায়ে ঝুলিয়ে রাখা-না-রাখা সমান। পঞ্চাশ ঘর শিষ্য আছে সুরেশের—অভাবের কথা নয়—ওর স্বভাবই ওরকম হয়ে গেছে! অথচ যখন কীর্ত্তন গাইত তার কাপড়-উড়নির চেহারাই ছিল আলাদা। গলার

কণ্ঠীটাও আর এখন নেই।

"সময় খারাপ নয়?—" মোহিনী বলতে থাকে: "সহরেও আমরা রেঙ্গুনের চাল খেয়েছি, সুরেশ!—ও চাল সেদ্ধ করে দিলে গরুতেও খায়না—"

"গাঁয়ের হাটেও সে-শ্রীমূর্ত্তি দেখা গেছে—নধর গোরাচাঁদ—" গলায় ফুর্ত্তি জমে আসে সুরেশের। তারপর এক হাতে হুঁকো আরেক হাতে কল্কেতে ঢুলুনি দিতে দিতে কুঁজো হয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

"ঘরটি কিন্তু সাজিয়েছে বেশ মোহিনী—" এবার লালা-মেশান আওয়াজ শোনা যায় সুরেশের গলায়।

কেমন একটা অস্বস্তিতে মুখে যেন তেতো স্বাদ পায় মোহিনী—কথা বলতে ইচ্ছা করেনা। "দেখে বেশ ভালো লাগল—" সুখাসন তৈরী করে বস্‌ল সুরেশ।

"কি আর এমন—" মোহিনী একটা তেতো ঢোঁক গিল্‌ল: "সহরের দশপাঁচটা বাড়ি দেখে এসো, কেমন ফিটফাট!"

"সে-ই ত বলছি—" কল্কেতে ফুঁ চালায় সুরেশ: "সহরে তোমরাই আছ ভালো—খাও দাও, হরেকরকম ফুর্ত্তি করো! খাসা আছ! আর আমরা—"

"তোমরা কি খাওনা বলছ!" মোহিনী ফাঁকা গলায় হেসে ওঠে।

"খায় ত গরুতেও! তা-ই কি বলছি?"

"তবে?"

"হাট ভেঙে গেছে—জমছে না!"

"এখানেই কি জমছে বলতে চাও?"

"খুব! নিজেকে হাল্কা লাগে কতো! দু'দিন এসেছি তাতেই

মনে হয় উড়তে পারব !"

মোহিনী চুপ করে যায়। সেই গাঁজা-খোর সুরেশ—কথার ছিরি-ছাঁদ নেই। কে বলবে তামাকের সঙ্গে গাঁজা মিশিয়েছে কি না। জিভ ওর আলগা হয়ে উঠছে হয়ত মৌতাতের গন্ধেই !—আর হুঁকোতে টান পড়লে কি বলতে সুরু করবে কে জানে ? সব কথাই ত শুনছে বিরজা—শুনতেই থাকবে—চেপে দেবার উপায় নেই। অস্বস্তিতে ঘাড় গুঁজে রাখে মোহিনী। হঠাৎ ও-এসে জুটল কেন আজ ! দেখাশোনা ছিলনা ভালোই ছিল !

সুরেশ তামাক টানতে সুরু করে এবার : "গন্ধেই জিভে জল এসে গিয়েছিল—মশলার তামাক—খাসা চিজ !"

"বাড়ি যাবার সময় নিয়ে যেও খানিকটা—মেখে-চটকে ওরাই তৈরী করে দেয়—" মোহিনী মুখ তুলে অর্দ্ধমনস্কতায় বলে যায়।

"তামাক-হুঁকো-শীতলপাটি এই সহরের এ-তিন খাঁটি—" সুরেশের মুখে পদ্য গড়িয়ে চলে।

"সত্যি আর সবই মেকি—" হাসবার চেষ্টায় মোহিনী বিনীত দেখায়।

"উহুঁ। মেকি বলতে যাব কেন ? দেখছি নেশায় বুঁদ হয়ে আছে সহরটা—জমজমাট নেশা !"

"কি করে তুমি দেখতে পেলে তা-ই ত ভেবে পাচ্ছিনে !"

"তুমি-ও যে নেশায় আছ—তুমি কি করে বুঝবে বলো ! তিনশ পঁয়ষট্টি দিন গাঁয়ে বসবাস করে এলে বুঝতে !"

তা-ই কি ? উহুঁ। মোহিনীর ত মনে হয় গাঁয়েই যেন সে ভালো থাকত ! ভাবতে বেশ লাগে—ছুটিতে বাড়ি এলে পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরা—কি চমৎকার মাছ—লাল রুই, রূপোলি কাৎলা, কালো

কালবোস! তারপর বাজারে গিয়ে ঘড়া-ঘড়া দুধ কেনা, দু-পয়সা দেড়পয়সা সের! এক জ্বাল দিয়ে তুললেই আধইঞ্চি পুরু সর। বাড়িতে রান্নার ধুম—নেমন্তন্নের ধুম—ঠাট্টা-ইয়ার্কি, হৈ-হুল্লোড়। সন্ধ্যায় সুরেশের কীর্ত্তন! আর জ্যোৎস্না রাত্রিতে পুকুরের ও-পারে মাদারের বেড়ার ধারে এসে কে দাঁড়াত? সুরেশের কীর্ত্তনের রাধা-ই কি? মোহনের বোন—রাধি বলে ডাকত ওকে সবাই—মোহিনী শুধু বলত রাধা! রাধা! মন জপে চলেছে অবসরে-অবকাশে ওই সাধারণ মেয়েটির সাধারণ নাম। সব কিছুই সাধারণ ছিল—অসাধারণ কিছুই নয়—তবু কী ভালো-ই না ছিল সব—কী ভালোই যে লাগত!

"ওহে বনমালী তোমার বনমালা কই—যে-চূড়াতে রাধার নাম সে-চূড়া বা কই—" হঠাৎ বিশ্রী ভাঙা-গলায় সুর তুলে সুরেশ হুঁকোটা মোহিনীর দিকে এগিয়ে ধরে।

বিশ্রী গলাতেও চমকে ওঠে মোহিনী—চমকে ওঠে ঠিক এক্ষুণি সে রাধার কথা ভাবছিল বলে। কি করে সুরেশ জানতে পারল তার মনের কথা? মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায় মোহিনীর—মাথা নামিয়ে হাতে হুঁকো তুলে নেয়। মুখ ঢাকতেই যেন তারপর হাতের তেলোয় হুঁকোর ছেদা-টা মুছে নিয়ে তাড়াতাড়ি তাতে ঠোঁট বসিয়ে দেয়। পাঁচ-সাতটা টানের শেষে মনে পড়ে তার, এ-তামাক খাবেনা বলেই সে ভেবেছিল। কিন্তু টানের স্বাদ পরখ করে দেখা যায় সন্দেহটা মিথ্যে। গাঁজা-টাজা কিছুই মেশায়নি সুরেশ।

"তুমি ত ভাই এখন সহরের মানুষ—" সুরেশকে এবার সত্যিকারের বয়স্ক ও গম্ভীর মনে হল: "এক ফোঁটা গাঁয়ের গন্ধও নেই! বেশ! দেখে চোখ জুড়োল!"

কোথায় যেন একটা ভয় নড়ে উঠে মোহিনীর ভেতরটা কাঁপিয়ে

তুলল। শক্ত ঠোঁটে হুঁকোটাকে জড়িয়ে ধরল সে।

"আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো মোহিনী—এখেনে, সহরে যাতে থাকতে পারি!"

মোহিনী মনে-মনে শপথ করলে মাকে যেম্নি সে কাশীতে টাকা পাঠায় সুরেশকে এবার ঠিক তেম্নি মাসে-মাসে অন্তত পাঁচটি করে টাকা পাঠাবে।

"কি—পারো না একটা ব্যবস্থা করে দিতে?"

"এ-বয়েসে, এ-স্বাস্থ্যে তুমি সহরে এসে থাকতে পারবে কেন—আর কাজও বা কি করবে?" গলাটা পরিষ্কার করে নিতে-নিতে বলে মোহিনী।

"আরে না না, স্বাস্থ্য আমার ভালোই আছে—" দপ করে সুর নামিয়ে নিয়ে আসে সুরেশ: "নেশাভাং আর করিনে ত আজকাল!"

সুরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে এ-অবিশ্বাস্য কথাটাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল মোহিনীর: "চেষ্টা করে দেখব আমি—হলে চিঠি দোব!"

"তুমি চেষ্টা করলে হবে না, সে কি একটা কথা;"

সুরেশ সান্ত্বনা পা'ক। খানিকক্ষণ চুপ করে রইল মোহিনী। তারপর খুব ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে: "ঠাকুর ভাই-এর খবর কি? শরীর কেমন আছে ওঁর?"

মুখটাকে করুণ করে সুরেশ যেন হঠাৎ ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে উঠল: "একটা অন্যায় হয়ে গেছে ভাই—উনি একটা পত্র দিয়েছিলেন তোমাকে—কোথায় যে রাখলুম খুঁজে আর পেলুম না। শরীর ওঁর চলছে একই রকম। বৌঠান বলেন, বাঁচবেন না—গুষ্টিতে কেউ

পঞ্চাশের উপর বাঁচেনি—বৌঠান ও-কথাই জপছেন কেবল !"

"কতো লেখালেখি করলাম—এখেনে এসে চিকিৎসে-পত্র করাতে, কিছুতেই বাড়ি ছাড়বেন না—ডাক্তার-বদ্যি কে আছে তেমন ওখানে বল' !"

"যুদ্ধু-ফেরতা রাসমোহন বোসের জামাই ডিস্পেন্সারি খুলেছে একটা—কিন্তু তার হাতযশ নেই !"

"মার আগে যদি ঠাকুরভাই চলে যান—ভাবো দিকিনি—"

"ঠাকুরের ইচ্ছে—"

মোহিনী নিঝুম হয়ে রইল। সুরেশেরও যেন কথা বলার উৎসাহ মীইয়ে এসেছে। গুপীর ছায়া এসে বাড়িতে ঢুকছে দেখতে পেল মোহিনী। রান্নাঘরের রারান্দায় গিয়ে উঠল সে ছায়া।

"তামাক খাবে না কি আরেক ছিলিম ? গুপীকে বলব দিতে ?" ঝিমোনো গলায় জিজ্ঞেস করে মোহিনী।

"না-না"—একটা লাফ মেরেই যেন সুরেশ উঠে দাঁড়ায় : "রাত হয়ে গেছে—ওরা আবার ভাববে কোথায় গেলুম !"

মোহিনী চুপ করে থাকে।

"একটা ব্যবস্থা কিন্তু করো মোহিনী—" উঠোনে নেমে রান্নাঘরের দিকে মোড় নিল সুরেশ : "বৌঠানকে একটা নমস্কার জানিয়ে যাই—উনি ত রান্নাঘরেই আটক রইলেন !"

এ-ধরণের একটা দৃশ্যের জন্যে বিরজা যেন তৈরী হয়েই ছিল—চুল-ঢাকা ঘোমটায় তাড়াতাড়ি সে বারান্দায় নেমে এলো। দু'পা এগিয়েই সুরেশকে থেমে যেতে হল তাই। মোহিনীর ছায়ার দিকে তাকিয়ে বললে বিরজা : "বাঃ—উনি আমাদের এখানে খাবেন না একবেলা ?"

"বেশ ত—বলে দাও!" মোহিনীর গলায় উৎসাহ এলোনা।

"মোহিনী বলবেনা বৌঠান—আপনাকেই বলতে হবে—" উঁচু গলায় হেসে উঠল সুরেশ।

"রান্না করে যিনি খাওয়াবেন তিনিই ত বলবেন—আমি বলবার কে?"

"কাল দুপুরেই আসুন তাহলে উনি—"

"নিশ্চয় আসব।" সুরেশ অকাতরে বলে উঠল: "এখানে নাকি খাসা মহাশোল মাছ পাওয়া যায় মোহিনী—অনেকদিন ও-মাছটা খাইনি—খাওয়াতে পারো?"

"কাল বাজারে উঠলেই পারি!"

"দেখা যাক আমার বরাত—"

"আজ দেখেছিলাম দু'টো—বরাত তোমার খারাপ হবেনা—" হাল্কা হয়ে ওঠে মোহিনীর গলা।

"ননদিনী বলগে নগরে—" সুরেশ খানিকটা সুর ভেজে দেয়: "নগরে সবই নিবেদন করতে হয়—গাঁয়ের হাট ভেঙ্গে গেছে—নগরের হাট জমজমাট!"

মোহিনী আবারও থেমে যায়। বারবার এসব কি বলছে সুরেশ! চোখ টাটিয়ে উঠছে যেন ওর বারবার। কি এতো মজা দেখতে পেল ও সহরের জীবনে? কি সুখ, কি স্বস্তি? শুধু বাইরের চেহারাটা ছাড়া ভালো বলবার কি আর আছে সহরে? বাসা-টা, ঘরের আসবাবগুলো-ই হয়ত খুঁচিয়ে তুলছে ওর চোখ। কিন্তু খুঁচিয়ে তুললেই যে এমন হা-হা করে তা বলে ফেলতে হবে তা-ই বা কেন? বুদ্ধি-সুদ্ধি সবই কি হারাতে বসেছে ও! কতো ভাবেই নষ্ট হয়ে যায় মানুষ—কতো রকমেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে!

"আচ্ছা বৌঠান—" চাদরটাকে গায়ের উপর ছড়িয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে স্থরেশ : "আপনার নিমন্ত্রণ শিরোধার্য্য করে চললুম—কাল আবার দেখা হবে!"

বিরজা এবার আর পাশ কাটায়না, বলে : "চপলার মা ভালো আছে ত?"

"ও আর বলবেন না—বাতে অর্দ্ধাঙ্গ অবশ—শয্যাশায়ী—" স্থরেশ আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়াবার চেষ্টা দেখায় না—রণে ভঙ্গ দেবার ভঙ্গী নেয় ওর পাগুলো।

খানিকক্ষণ ওরা দুজনেই তাকিয়ে থাকে স্থরেশের পেছনে—ও চলে গেলে পরও খানিকক্ষণ। তারপর বিরজা উঠোনে নেমে আসে। এসে মোহিনীর পাশে দাঁড়ায়। মোহিনী মুখ নীচু করে পায়ের আঙুলের কড়া খুঁটতে থাকে।

"কি রকম হয়ে গেছেন স্থরেশঠাকুর—" বিরজার গলাটা ভিজে ভিজে হয়ে আসে।

মোহিনী মুখ তোলেনা : "গাঁয়ের মানুষ সবই ওরকম।"

"বুড়োবয়েসে চাকরি করতে এসেছেন এখানে!"

"কিসের! যখন যা খেয়াল হচ্ছে তা-ই বলে যাচ্ছে!"

"ওঁকে দেখে তা-ই বুঝলে না কি তুমি!"

"তাছাড়া আর কি? আমি কি ওকে জানিনে?"

"কি জানি!" বিরজা একটা নিশ্বাস চেপে ঘরে উঠে আসে।

মোহিনীর আবার সে-কথাটাই মনে পড়ে : আজ সকালবেলা হঠাৎ কি করে স্থরেশের কথা মনে পড়েছিল তার, আর কি করে বা

হঠাৎ আজই সে এসে উপস্থিত হল। কেন এলো ও? পেছনের একটা পুরোণো হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে কেন মুখে লাগল তার? এখনকার, এখানকার সবই কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে। অসুখের সূচনায় যেমন হয়।

চার

১

ক'দিন ধরে শুধু সুরেশই মোহিনীর মনে আনাগোনা করে চলছিল। সহরে সবই জমজমাট! সুরেশের কথা। কিন্তু কি দেখে সুরেশের এমন চোখ ধাঁধিয়ে গেল? কি এমন ফুর্তি উড়ছে, আকাশ ফুঁড়ে আনন্দ ঝরছে এখানে? খেলার মাঠে লোক জড় হয়—সার্কাস-বায়স্কোপ এলে পথে সারবন্দী লোকের যাতায়াত দেখা যায়—নাটক-যাত্রায়ও ভীড় আছে কিন্তু তাছাড়া খাওয়া-পরায়, হাঁটাচলায়, অফিস যাওয়ায় কি এমন উৎসাহ আছে মানুষের? কি জানি হয়ত কারো কারো আছে উৎসাহ—এ-পাড়ায় এসে সেরেস্তাদার-মশাইএর যেমন উৎসাহ দেখতে পেয়েছিল মোহিনী—এখনও হয়ত কেউ-কেউ তেমনি উৎসাহেই ঘরসংসার জমিয়ে তুলতে চায়! আছে হয়ত তেমন লোক। বাইরে থেকে দেখতে গেলে মোহিনীও ত তাদেরই দলে গিয়ে পড়বে। কি সে ছিল আর তার হয়েছে বা কতো! মনে যে তার উৎসাহ নেই বাইরের মানুষ তা দেখতে যাবে কেন? আর সত্যি, উৎসাহ বা পাচ্ছেনা কেন সে? পঞ্চাশ বছরে মোহিনী নিজেকে যতো বুড়ো মনে করছে চৌষট্টি বছর বয়েসে—পেন্সান ভুগে-ভুগেও ত সেরেস্তাদারমশাই ততোটা অথর্ব্ব হয়ে পড়েননি! তাঁর সেই হাঁক-ডাক অবশ্যি আর নেই কিন্তু বিয়ে-অন্নপ্রাশন, শনিপূজো-কালী-পূজোতে এখনও ত তিনি পা বাড়িয়ে সবার সামনে এগিয়ে আসেন! এখনও ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীর বিরাট পৃথিবীটা এই বাসুকীরই মাথার উপর ভর দিয়ে আছে! আর মোহিনী শুধু পেছনেই সরে

যাচ্ছে—বিরজা সামনে এগিয়ে এসেছে বলেই যে সে পেছনে সরে যাচ্ছে তা নয়—পেছনে সে যেতোই, বিরজা আসুক আর না-ই আসুক। কবে যে কোথায় একটা ধাক্কা লেগেছে তার—ঠিক বুঝতে পারছেনা—শুধু বুঝতে পারছে আজও সেই ধাক্কার জেরই চলছে তার রক্তেমাংসে, চিন্তায়-ভাবনায়।

কোথায় যে জমে উঠছে সহর—আসল কথা—মোহিনীর মন তা খোঁজ করতে চায়নি। সহর কোথায় ভেঙে যাচ্ছে সে-ছবিটাতেই সমস্ত মনোযোগ উপুড় হয়ে পড়তে চায়। সি-আর-দাশের আন্দোলন যে ছত্রখান করে দিয়েছিল সহরটাকে—সহরের বুক থেকে সে-ছবি মুছে গেছে কিন্তু মোহিনীর চোখ থেকে মুছে যায়নি। সে-ছবি মনে তার স্বস্তি আনেনি তবু রাহুর মতো তা তাকে বারবার গ্রাস করছে। সেই বিরাট মিটিং-এ দাশমশাইকে দেখতে পেয়েছিল মোহিনী—যে-মীটিং-এ ওকালতি ছেড়ে দেবার শপথ নিচ্ছিলেন উকীলরা এক-এক করে! এতো বড় একটা বিরাট পুরুষের চোখে জল--শপথ না নিয়ে কেউ পারে? মোহিনী আবারও তখন ভাবছিল, দারোগার চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে ভালোই করেছে। সেদিন যখন দার্জ্জিলিং থেকে দাশমশাই-এর মৃত্যু-সংবাদ এলো, মোহিনীর মন যেন আরো ক'কদম পেছিয়ে গেল। "হায় চিরভোলা হিমালয় হতে অমৃত আনিতে গিয়া—ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের মৃত্যুগরল পিয়া"—মিতু আবৃত্তি করত কথাগুলো—মোহিনীর মনে গেঁথে আছে। তিতু কবিতা লিখে শোকসভায় পাঠ করেছিল—তিতুর লেখার প্রশংসা করেছিল সবাই, মোহিনীর তখন মনে পড়ছিল নিন্দাপ্রশংসার ঊর্দ্ধে যিনি চলে গেলেন তাঁরই মুখ।

একেক সময় ভাবে মোহিনী মৃত্যুর জন্যেই কি তৈরী হয়ে উঠছে

তার মন? তিনপুরুষে কেউ তাদের পঞ্চাশের উপর বাঁচেনি। তাই কি পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছিয়েই সে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছে? ঠিক তার দাদার মতো? হাবুল বড় হয়েছে—তিতুমিতু-ও ছোট নেই, এবার তোমার ছুটি!—কথাটা যেন শুনতে পায় সে মনে। ওদের ছোট রেখে, অনাথ করে ফেলে যাবার ভয় ছিল তার আগে—সে ভয়ই যেন এখন জোর-গলায় বলে উঠ্‌ছে—এবার ত সব শেষ! আয়নাতে চুল পাট করতে যায় সে অভ্যাসবশে—মাথাটা হাঁ করে আছে, চুল নেই—কানের আর ঘাড়ের পাশ-ঘেঁষে সরু একটা রেখা মাত্র। সমস্ত মুখে বয়েসের আঁচড়, এক ইঞ্চি মসৃণ চামড়া নেই। সব শেষ! পুঁজি ফুরিয়ে গেছে—বয়েসের ফুটো দিয়ে গড়িয়ে গেছে সব। সামনে তাকালে মৃত্যুর দেশটাই এখন বড় হয়ে চোখে পড়ে। চোখে পড়ে কিন্তু অসঙ্কোচে এগোতে ইচ্ছে করে কি? মন ধরা পড়ুক্ কিন্তু এ-জীর্ণ চামড়ার নীচে রক্তের রঙে যে ইচ্ছা মিশে আছে মৃত্যুর চুম্বকে তা ধরা দিতে চায়না। মৃত্যুকে সশরীরে এগোতে হয়, রক্তমাংস মৃত্যুর দিকে এগোয় না।

যেদিন মোহিনী টাউনহলে যায়না বিকেলের ছায়ায় কাছারীর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বিদরি হুঁকোর নলটা মুখে নিয়ে বসে থাকে। নায়েব-তহশীলদার-মোহরের লোকেরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে যান—দারোয়ান-পেয়াদারা দূরে সরে জটলায় বসে—মোহিনী একাই থাকতে চায় ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা। রশিটাক দূরে রাস্তার উপর লোকচলাচলের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ—খেলার মাঠ থেকে স্কুল-কলেজের ছেলেরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে—অফিস-ফেরতা কেরাণীরা কেউ-কেউ বাজার নিয়ে যাচ্ছেন—কেউ বা ফলফলারি কিনে নিয়ে চলেছেন ব্রতপূজোর অবিরাম চাহিদা মেটাতে।

মিষ্টির দোকানে খদ্দেরের আনাগোনা সুরু হয়ে গেছে। পূজোর তিথি থাকলে রাস্তায় মেয়েদের সারও দেখা যায়। কালীবাড়িতে ভোগ দেবার আর প্রণাম করবার ছুতো নিয়েই হয়ত গায়ে একটু হাওয়া লাগান ওঁরা। বাইরে বেরোবার চল করে নিচ্ছেন ধীরে ধীরে। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে মোহিনী আন্দাজ করতে চেষ্টা করে কারা কোন্ বাড়ির মেয়ে। দশ-বারো বছরের কোনো খুকীর দিকে হয়ত সে অপলক তাকিয়ে থাকে। বেঁচে থাকলে মিন্নুও তার হয়ত এত বড়ই হত! পনেরো-ষোল বছরের কোন মেয়ের মাথায় সিঁদূর দেখলে যেন আরেকটি মরা মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়—সে মেয়ে নূতন বউ বিরজা। ষোল বছরের সে-বিরজা ত সত্যি মরে গেছে! মরে গেছে অবশ্যি তখনকার মোহিনীও কিন্তু সে-মোহিনীর মনটা যেন মরে যায়নি। মন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। হাওয়ার আগেও চলে যুধিষ্টির বলেছিলেন—বলেন নি, সময়ের পাহারা যে মানেনা। অবাধে সে চলাফেরা করতে পারে জীবনের এমাথায়—ওমাথায়!

ঝিমুনি থেকে হঠাৎ মোহিনীর চোখ জেগে ওঠে। ওরা দুজন এদিকে কেন? বৈষ্ণব জমিদারের ছেলে বিভূতি আর পাটবাবুর ছেলে মেদিনী। বয়েসে দু'চার বছরের ছোট হলেও বিভূতি তার বন্ধুরই মতো কিন্তু মেদিনীকে ত মুখের চেনা ছাড়া অন্য কোনো ঘনিষ্ঠতায় জানেনা মোহিনী! অথচ দুজনে তার কাছেই আসছে—বাগানটা পার হয়ে এসে গেল প্রায়। কেন?

দূর থেকেই কপালে নমস্কারী হাত তুলে হাঁক দিলে বিভূতি: "মোহিনীদা—নমস্কার—"

কল্কে পাল্টে দেবার সময় বলে একজন পেয়াদা উঠে আসছিল—

কল্কে ছাড়াও দুটো চেয়ার পাতবার হুকুম হল তার উপর।

"শরীরটা যেন ভেঙে পড়ছে মোহিনীদা—আপনার!" সবান্ধবে বারান্দায় উঠে আসে বিভূতি।

"বয়েস ত হল!" মোহিনী দুর্ব্বলভাবে হাসতে সুরু করে।

"শোনো কথা মেদিনী—আমার চেয়ে বড় জোর বছর দুয়েকের বড় হবেন—বলছেন বয়েস ত হ'ল!" মেদিনীর জন্যে একটা চেয়ার টেনে দিয়ে বিভূতি অপর চেয়ারটাতে সশব্দে বসে পড়ল: "মুখে বললেই কি আর বুড়ো হওয়া যায়, মোহিনীদা?"

মেদিনী কথা বলেনা—শুধু চোখদুটো তার চিকচিক করে ওঠে।

"তারপর, কি মনে করে?" দুজনের মুখের উপরই জিজ্ঞাসু চোখ বুলিয়ে আনে মোহিনী।

"একটা কিছু মনে করে ত বটেই—কিন্তু এক্ষুণি বলতে হবে?—" দাঁত দেখিয়ে হেসে ওঠে বিভূতি। প্রৌঢ় দাঁতগুলোর দুপাশে মাড়ির বাঁধ ক্ষয়ে গেছে বলে কেমন যেন বীভৎস দেখায় হাসিটা।

"বল-বল—" মোহিনী ওদের সঙ্গ চুকিয়ে ফেলতে চায়।

"একটা পার্টি হচ্ছে মোহিনীদা—দিচ্ছে মেদিনী। শিকার-পার্টিও বলতে পারেন—" বিভূতি চোখ মটকায়: "অনেকেই যাবেন। মন্মথদা ত উচাটন হয়ে উঠেছেন—খেলার মাঠে যে সার্কাসওয়ালা এসেছে সে নাকি মস্ত শিকারী—সে-ও যাচ্ছে! একা নয়—"

মোহিনী হুঁকোর নলে নিবিষ্ট হয়ে যায়। কৌতুকাভিনয় উপভোগ করতে থাকে তার চোখ।

বিভূতি বলতে থাকে—মুখের শিথিল পেশীগুলো তার সামান্য উস্কানিতেই অসামান্য রেখা আর বাঁক নিয়ে বিচিত্র দেখায়: সার্কাসওয়ালার সঙ্গে আরো দুজন শিকারী যাচ্ছে পার্টিতে—তারের

উপর যারা খেলা দেখায় সে-দুটি মেয়ে—কৃষ্ণা আর কাবেরী। তাঁবু ছিঁড়ে গেছে বলে খেলা বন্ধ আছে ক'দিন, তাই ওরা যেতে পারছে। আর একটা ত মাত্র দিন—দিনের বেলায় পাহাড়ে গিয়ে একটু শিকার আর রাত্রিতে খানিকটা আমোদ-আহ্লাদ করা। বিবরণের শেষে নিবেদন উপস্থিত হয় : কিন্তু রাত্রিতে আস্তানা পাওয়া যাবে কোথায়—মোহিনীদা যদি তাঁদের কাছারীর বাংলোটা ব্যবহার করতে না দেন তাহলে পার্টি মাটি।

ঝিমঝিম করতে থাকে মোহিনীর মাথার ভেতরটা—দুর্ব্বল হয়ে আসে গলা : "কাছারীতে কেউ আছেন কি না আমার ত জানা নেই!"

"কেউ নেই মোহিনীবাবু—আমি খবর নিয়েছি—শুধু পাহারাদার" মেদিনী সোৎসাহে মুখ খুলে দেয়।

"আপনি একটি চিঠি দিলেই হয়ে যায় মোহিনীদা—" চোখদুটো উপরে টেনে তুলে বিভূতি মুখে আব্দেরে ভঙ্গী আনতে চায় : "আর চিঠিরও বা কি দরকার—আপনিও চলুন না!"

"আমি! আমি যাবো?" মোহিনী নিজের কানকেই যেন শোনাতে থাকে : "আমি যাবো কেন?"

"সবাই যাচ্ছেন—ক্ষতি কি?"

"দূর—"

"বিশ্বাস হলনা? চলুন না মন্মথদার কাছে। আমাদের অপেক্ষায় আছেন তিনি। একদল আজ রাত্তিরেই রওনা হতে চান—বাকি সব কাল সকালে!"

বিভূতির বাবার আমলের একটি ফিকে ছবি চুপিচুপি এসে মোহিনীর চোখের সামনে দাঁড়ায়। ডাকবাংলোর একটি রাত্রি। কিন্তু তখন তার বয়েস ছিল—যে বয়েসে যা খুসী তা করা যায়।

"না গেলেও খবরটা জানতে দোষ কি—মন্মথদার ওখানে চলুন—চিঠিটা ওখানে বসেই হবে!"

"সার্কাসওয়ালার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হল কি করে?" অন্যমনস্কতা থেকে উঠে আসে মোহিনী।

"পরিচয় করলেই পরিচয় হয়। পরিচয় করবার ইচ্ছে হল—সার্কাসে যদি যেতেন মোহিনীদা, ইচ্ছেটা আপনারও হত!"

নিজেকে বিভূতির ধরাছোঁওয়ার বাইরে তুলে আনবার উপায় নেই মোহিনীর, কাজেই তাকে খানিকটা নিস্তেজ হয়ে পড়তে হয়। তাছাড়া দু'টো নাম-ও অদ্ভুতভাবে বারবার মনে পড়ছে তার: কৃষ্ণা—কাবেরী।

বিভূতি উঠে দাঁড়াল। তুড়ি দিয়ে পেয়াদাকে ডাকল: "এই—এই—ইধার আও—।" তারপর মোহিনীর পাশ ঘেঁষে এসে বল্‌লে: "উঠুন মোহিনীদা—"

হুঁকোর গায়ে নলটা জড়িয়ে দিতে লাগল মোহিনী: "চিঠিপত্র দেওয়া মুস্কিল—জানো।"

"কুরসী ভেতর লে যাও—" বিভূতি পেয়াদার উপর হুকুম ঝেড়ে মোহিনীর দিকে মনোযোগী হল: "চলুন ত আগে—মুস্কিল আসান কি করে হয় দেখা যাবে!"

খাস বাঙালী পেয়াদা হয়ত বিভূতির হিন্দির তোড়েই খানিকটা জব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—মোহিনী চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্‌ল: "চেয়ারগুলো নিয়ে যা—"

অনেকক্ষণ চুপ থেকে আবারও মুখ ফুটল মেদিনীর: "ভেটারেন্‌রা না থাকলে পার্টি কি করে জম্‌বে—বলুন।"

মোহিনী কথা বল্‌লেনা কিন্তু মুচকি হেসে ওদের সঙ্গে পা বাড়াল।

২

মনে একটা উত্তেজনা নিয়েই মোহিনী ফিরে যাচ্ছিল বাসায়। মন্মথকে চিঠি লিখে দিয়ে এসেছে সে কিন্তু নিজে যাবে কি না ঠিক বলে আসেনি। চেহারার মতোই মনটা বেশ কাঁচা আছে মন্মথর—দেখলে ঈর্ষা হয়। পার্টিতে মন্মথই খাতির পাবে বোঝা যায়। যখন এধরণের ব্যাপারগুলোর নাম পার্টি ছিলনা—নাম ছিল আসর—মোহিনীরই তখন চেহারার জোর ছিল সবচেয়ে বেশি! বিভূতির বাবার কীর্ত্তনের আসর—পোদ্দার বাড়ির বিয়েতে নাচের আসর—মনে পড়ে। মনে পড়ে' মনটা নড়েচড়ে ওঠে একেকবার। যাবেনা বলেছে বটে সে কিন্তু মন্মথ-বিভূতি-ওরা তার কথার ভঙ্গীতে যাবে বলেই ধরে নিয়েছে। ওরা আশা করবে মোহিনীকে। ওদের আশাভঙ্গ করা কি ভালো? তাছাড়া যাওয়াটা এমন কি দোষের? কাছারির আর বাড়ির চেয়ারে থিঁতিয়ে থেকে এমন কি পুণ্যার্জ্জন করছে মোহিনী? একটা ফাঁকা বেলুনের মধ্যে বসে আছে চুপচাপ—চারদিকে ফাঁকা—কিছু পাবার নেই, কিছু নেবার নেই—ভালোমন্দ কিছুই করবার নেই। মফঃস্বলে ট্যুর দেবার দরকারও নেই কাছারির তরফ থেকে—নায়েবরা এষ্টেটের অভাব-সভাব বুঝতে দেননা—পুণ্যাহের আদায়ও একতিল এদিক-ওদিক হয়না। মফঃস্বলে যেতে পারলেও খানিকটা নূতন আলো-বাতাস লাগত গায়ে। মফঃস্বল! কাল সকালে সে মফঃস্বলে যাচ্ছে বলতে পারবে বিরজাকে। দুশ্চিন্তায় মুখটা ফ্যাকাশে করে কাপড়জামা গুছিয়ে দিতে এগোবে যখন ও, তখন বল্‌বে, রাত্তিরেই ফিরে আসছি। তবু হয়ত পীড়াপীড়ি করবে, গোপী সঙ্গে যাক। 'কারো আর সঙ্গে যেতে

হবেনা—বিকেলেই ফিরতে চেষ্টা করব'—আবারও একটা মিছে কথা বলতে হবে। এ-বয়েসেও মিছে কথা বলতে হবে!

কি আর হবে তাতে? মিছে কথার বোঝার উপর ওইটুকু শাকের আঁটিতে কিছু এসে যায়না। পরকে খুসী করতে হলে মিছে কথার চেয়ে আর কি এমন ভালো উপায় আছে? আর নিজেকে ঢেকে রাখতে হলেও তার দরকার—চামড়া যেমন শরীরের ভেতরটাকে ঢেকে রাখবার দরকারেই তৈরী, মিছে কথাও ঠিক তা-ই। তুমি কি ছিলে তা নয়, তুমি কি ভাবে ছিলে তা-ই তোমার স্ত্রী ছেলেমেয়ে আর বন্ধুবান্ধবদের কাছে তোমার সবটুকু পরিচয়! নিজের সাফাই গাইতে সুরু করে মোহিনী। সে নিজে যেমন নিজেকে জানে, বিরজার তাকে ঠিক তেমনভাবে জানবার কি দরকার? আর বিরজা যে-ভাবে জানে, হাবুল-তিতু-মিতু তাকে সে-ভাবে না-ই বা জানল! আর সত্যি বলতে ওরা তাকে একভাবে জানেও না—প্রত্যেকের মনে তার চেহারা আলাদা। প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকের জানা-টা সত্য। সত্যের যদি এতগুলো চেহারা হয় ওটা কি আর সত্য থাকে কোনোদিন? আসলেও সত্য বলে কিছু নেই। মিথ্যেকেও যদি সত্যের মধ্যেই ধরে নাও তাহলে বরং সত্যের কিছু মানে থাকতে পারে।

দীঘির পাড়ের পথটুকুতে পড়েই থেমে গিয়েছিল মোহিনী। অন্ধকার হয়ে গেছে—লোকজন নেই আর তেমন, তাই যেন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হল তার। পুরোনো দীঘি—অন্ধকারেই বেশ দেখায়। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন? বাসায় ফিরে গিয়ে সব ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে? —হাঁটতে হাঁটতে মোহিনী অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে। সে যে যাবেই, কখন তা ঠিক হয়ে গেল মনে-মনে? যাওয়া উচিত বলেই কি যাবার জন্যে তৈরী

হয়ে গেল মন! পাগুলো তার মনের তাড়া খেতে সুরু করে। তাড়াতাড়ি পা চালায় মোহিনী।

অন্ধকারে ছায়ার মতো বাসার রাস্তার মোড়ে তিতু দাঁড়িয়েছিল। মোহিনী জিজ্ঞেস করল: "কিরে?"—তিতু কথা বললেনা, ছায়ার মতোই বাবার পেছু নিলে। ফিরতে তার দেরি হয়ে গেছে আজ—উদ্বিগ্ন হয়ে সবাই অপেক্ষা করছে হয়ত তাই। মোহিনী বিরক্ত হল, তার জন্যে ওদের এরকম উদ্বেগ থাকা উচিত নয়—এ যেন খানিকটা বেশি-বেশি, বেমানান! রোজই তাকে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় একই সময়ে বাড়ি ফিরে আসতে হবে, তার কি মানে আছে? হু-হু করে বাসার দিকে এগিয়ে চলল মোহিনী।

রান্নাঘরটা নিঝুম। শোবার ঘরের বারান্দায় গোপী হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে – ঘরের ভেতরে পুরো-সলতেয় ল্যাম্পটা ঝকমক করে জ্বলছে। বিরজা কোথায়? মিতুর বা পড়ার কি হল?

ওরা ঘরের ভেতরই ছিল, মোহিনী ঘরে ঢুকতেই ওদের সাড়া পাওয়া গেল। কবাটের আড়ালে বসে চুপিচুপি কাঁদছে বিরজা—মিতু তার টেবিলে মাথা হেলিয়ে দিয়ে মার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ঘণ্টা দেরি হয়েছে বলে এত কাণ্ড? আশ্চর্য্য! ভুরু কুঁচকে মোহিনী সার্টের বোতাম খুলতে সুরু করে দিল।

তিতু ঘরে এল—পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে মাটির দিকে তাকিয়ে বললে: "টেলিগ্রাম এসেছে বাবা—"

একমুহূর্তে মোহিনীর চোখে সমস্ত ছবিটা আরেক মানে নিয়ে সেজে উঠল। সার্টটা বিছানার উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে তিতুর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল: "টেলিগ্রাম? কার? হাবুলের?"—কাগজটা তিতুর হাত থেকে তুলে নিয়ে পড়তে সুরু করে দিলে মোহিনী।

কবাটের আড়াল থেকে বিরজা বেরিয়ে এসে জলভরা গলায় বল্‌ছিল : "আগে একটু খবর দিলেন না আমাদের, মামাশ্বশুর—"

"সন্ন্যাস-রোগে খবর দেবেন কি করে ?"—তিতুই জবাব দেয়।

"সন্ন্যাস ?" মোহিনী তিতুর মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর হাতেধরা কাগজটার দিকে তাকায়।

"তখন থেকে মা শুধু বলতে লেগেছে বাড়িঘর ছেড়ে একা কোন দূরে গিয়ে মারা গেলেন ঠাকুরমা—কাশীতে গঙ্গার ধারে মরতে পারা-টা কম কথা ? তাছাড়া রাঙা-ঠাকুর্দ্দা ত ছিলেনই কাছে!" যুক্তিতর্কে নিজেকে মজবুত করে নিয়ে তিতু বাবাকে আগলে দাঁড়ায়।

"মামা ?"—মোহিনী ক্লান্ত হয়ে মেঝের উপর বসে পড়ে : "হাঁ মামা ছিলেন !"

"আমি যেতে পারলামনা—শেষ দেখা দেখতে পারলামনা—" ছোট ছোট হিক্কা উঠ্‌তে থাকে বিরজার ভেজা গলায়।

মাথা গুঁজে রাখে মোহিনী। মনে পড়ে বাবা যখন মারা যান তিনদিন তার কান্না থামেনি—যতবারই মনে হয়েছে বাবার মতো কাউকে আর পাওয়া যাবেনা তত বারই চোখ ঠেলে দরদর করে জল বেরিয়ে এসেছে তার। মাকেও ত আজ আর পাবে না সে, কিন্তু কান্না কই ? মা যেন ক্রমে-ক্রমে অস্পষ্ট হয়েই যাচ্ছিলেন—আজ একেবারে মুছে গেলেন ! তবু কি মনে হতনা কোথায় যেন একটি মানুষ আছে—একটি মানুষের প্রাণ আছে, যাকে মা বলে ভাবা যায় ? মনে হত। মা বলে কিছু ছিল—অস্পষ্ট হলেও, দূরে থাকলেও যে তা আছে ভাবতে পারত মোহিনী। এখন আর তা-ও ভাবা যাবেনা। কিন্তু সবাই যে বলে প্রাণ না কি মরে যায়না ! সে সি সত্যি ? কেমন যেন শীত-শীত করে ওঠে মোহিনীর সমস্ত শরীর। এখন,

এখানেই হয়ত তাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মা। তারা দেখতে পাচ্ছেনা—কিন্তু হয়ত আছেন।

"থান কাপড়-টাপড় আনতে হলে টাকা দাও মা—দোকান বন্ধ হয়ে যাবে শেষটায়—আর ওগ্নি ঠাকুরমশাইকে আসতে বলে আসব না কি?" সবাই চুপ করে আছে বলেই যেন কথা বলবার দরকার ছিল তিতুর।

"টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে অফিসে-বাসায় ঘোরাঘুরি করছিস কখন থেকে—আবার এক্ষুনি বেরোবি?" —আঁচলে মুখ রগড়ে শান্ত গলায় বলে বিরজা।

"ওসব পরে কাজ নেই বাবার—" মিতু বাবার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তে সুরু করে।

"না—তিতু যাক—গোপীও যাক না ওর সঙ্গে—" মোহিনী মুখ তুলে বাইরে তাকায়। নিজের কাছেই মনে হয় কোটরে যেন তার চোখগুলো নেই—একটা ফাঁকা জায়গায় আলো আর অন্ধকার এসে পড়ছে। কাল শেষ রাত্রিতে মারা গেছেন মা! সকালবেলা কি আজ একটু অস্থির-অস্থির বোধ করেনি মোহিনী? বিকেলে ত দস্তুরমত মন খারাপ ছিল তার! তখন হয়ত দাহ শেষ হয়ে গেছে! দু'ছেলের কেউ কাছে নেই—ভাই-এর হাতের আগুনই নিতে হল মাকে! ভালো হল কি? মাকে কাশী যেতে দিয়ে ভালো হয়েছিল কি? মোহিনীর কি ভালো হবে?

বিরজা, তিতু-মিতু, গোপী চলাফেরা করছে, ছোট-ছোট কথা বলছে —একেক সময় বুঝতে পারছে মোহিনী। বুঝতে পারছে কিন্তু মন দিতে পারছেনা। ছেলেদের কাছ থেকে মা কি পেয়ে গেলেন? কিছুই না! তাতে কি ভালো হবে ছেলেদের? আবারও মনে উঠে এলো কথাটা—

মোহিনীর কি ভালো হবে? মার অভিশাপ ছেলেদের লাগেনা—অভিশাপই দেন না মা—গালি দিলেও তা মুখ থেকেই মাত্র বেরোয়, অন্তর থেকে নয়! মার কাছে থেকে সরে এসেছে সে কিন্তু মাকে ত অশ্রদ্ধা করেনি কোনোসময়! প্রাণের যদি মৃত্যু না-ই থাকে, মা ত এখন জানেন সব, সবই দেখছেন!

জানেন সব! মোহিনীর মনে কোথায় যেন হঠাৎ আটকে পড়ল কথাটা। জানেন সব! জানেন বলেই কি টেনে ধরলেন তাকে পেছন থেকে? পার্টিতে যেতে দিলেন না! বাধা দিলেন—কিছুতেই আর বাধা তৈরী হতনা বলেই কি মৃত্যু দিয়ে বাধা দিয়ে গেলেন?

আবারও শীত-শীত করে উঠ্‌ল মোহিনীর শরীর। "কই—দ্যাখো—" বিরজাকে ডাকল সে: "একটু গরম জল কর। রাত্তিরে ঠাণ্ডাজলে স্নান করতে পারবনা!"

উনিশ শ' ছত্রিশ

এক

শেষটায় উকিল! শিশির কিছুতেই এ-কথা ভুলতে পারেনা। কারো আশা-ই পূর্ণ হলনা। বাবা অবশ্যি কোনোদিন তাকে বুঝতে দেননি যে তিনি খুসী নন কিন্তু শিশির নিজে ত বুঝতে পারত, কেমন যেন একটা ফাঁকা শূন্য ভবিষ্যতের দিকে তিনি তাকিয়ে থাকতেন। কাজ থেকে অবসর নিয়ে এসে বলেছিলেন: "এ ষ্টেটের ভাত আমি খেয়েছি ত খেয়েছি—হাবুলের ওখানে গিয়ে কাজ নেই!" তার সম্বন্ধে আশা থাকলে কি আর বাবা ওরকম নির্ব্বিকার হয়ে যেতে পারেন? মা একটু পীড়াপীড়ি করতে চেয়েছিলেন: "বাপের সুবাদে ছেলের চাকরি সব জায়গাতেই হয়!" "কি দরকার? ভাগ্যে থাকলে ওকালতিতেই পয়সা হবে ওর—এখনও ত কারো কারো হয়!" —মামুলি কথাই বলতেন বাবা। তখন খুব বেশি নিরুৎসাহিত হয়নি শিশির। ভাগ্যই ত সব! কপালের ভাগ্যরেখা দেখে যোগীপুরুষ চিদানন্দ তাকে বলেছিলেন, মনোবাসনা পূর্ণ হবে। মনোবাসনা ত তার বড় হওয়া, সুখী হওয়া, সবাইকে সুখী করা! প্রফেসরি করলেই যে তা হত—ওকালতি-তে তা হবেনা তার কি মানে আছে? আসল কথা যখন ভাগ্য, তখন জীবিকা নিয়ে

খুঁতখুঁত করার অর্থ নেই। কিন্তু এখন মনে হয়, সে যে ভালো পাশ করবার জন্যে, মানসম্মান পাবার জন্যে, অনায়াসে টাকা উপার্জ্জনের জন্যে চেষ্টা করেছিল তার কি কোনো দামই নেই? তা-যদি না থাকবে তাহলে এতো সময়, পরিশ্রম আর টাকা খরচ করবার কি মানে ছিল? লেখাপড়া শেখার সঙ্গে ভাগ্যের যদি কোনো সম্বন্ধই না থাকে তাহলে কেন সে লেখাপড়া শিখতে গেল? এ-প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। প্রশ্নটা আগুনের মতো জ্বলে উঠে আবার আগুনের মতোই নিভে যায় শিশিরের মনে। ছাই-এর মতো নিস্তেজ হয়ে আসে মন। বাবা যে বেঁচে নেই ভালোই হয়েছে—মা-ও যদি বেঁচে না থাকতেন বেশ হত। তার স্ত্রী আর দু'টি মেয়ে—ভদ্র দারিদ্র্যে মুখ বুঁজে তারা জীবন যাপন করে যেত। গোড়ায়ই হয়ত এমন ইচ্ছা ছিল তার। তার মন আর মনোবাসনা হয়ত তার উপরে উঠ্‌তে পারেনি কোনোদিন। কে বলবে, ছোট একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হাবুলের চোখে বড় হবার কোনো স্বপ্ন ছিল কি না—বড় হবার স্বপ্ন যে কেমন তা সে জানত কি না! প্রফেসর! কি এমন ঐশ্বর্য্যময় পুরুষ এই প্রফেসর! কি সম্মান, কি শ্রদ্ধা আজ তাঁর ছেলেদের কাছে? ছেলেরা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে—কথায়-কথায় ষ্ট্রাইক করে—অভিভাবকের কাছে এসে তাঁদের ধর্ণা দিতে হয়! সম্মানহানির ভয়ে আগেকার প্রিন্সিপাল ত রিটায়ারই করে গেছেন! আইন-না-মানার জোয়ার এসে গেছে সব জায়গায়। সবই যদি ভেঙে পড়ছে, শিশিরের তাহলে আফশোষ কোথায়? কেউ আর আগেকার স্বস্তি নিয়ে বাঁচতে পারবেনা! একত্রিশের আন্দোলনে কতো পরিবারের কতো ছেলে জেলে গেল—আজও কতো ছেলে বিনাবিচারে আটক

—স্বস্তি কার আছে? মিতুর জেল হয়নি কিন্তু গোয়েন্দা-পুলিশের যন্ত্রণায় সহর ছেড়ে যেতে হয়েছিল ত তাকেও—তিনরছর বাড়ি আসেনি — কলকাতায় কি করত চিঠিতে লিখতনা! তা-ওত একরকম কয়েদ—মুখ কালি করে মা বসে থাকতেন, মিতুর চিঠি এলে সেদিন একটু যা নড়াচড়া করতেন! সহরের ঘরে-ঘরেই এ-রকম! আহ্লাদ-আমোদ একদম উধাও। মিলিটারির ক্যাম্প বসল স্থায়ী হয়ে—চাটগাঁর মতো ঘটনা যেন দুবার না হয়। একা পুলিশ-সাহেবের উপর দিয়েই এ-যাত্রায় ইংরেজের ফাঁড়াটা কেটে গেছে এখানে—জজসাহেব আর ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব বেঁচে গেছেন—আর তাই যেন ইংরেজসরকারও বেহাত হয়নি! কিন্তু হতে ত পারত—চাটগাঁর মতো হতে পারত এখানেও। ফাঁড়া যখন এড়ানো গেছে একবার, এখন ফাঁড়ার মূল উপড়ে ফেলতে হবে। গান্ধীজির লজিকে ইংরেজসরকার চলতে পারেনা—আর দেখাও যাচ্ছে অস্ত্র ছাড়া অস্ত্র ভয় পায়না। মিলিটারি বসেছে আর ছাখো কেমন শান্ত হয়ে গেছে সহর! সঙ্গীন উঁচিয়েও হাঁটতে হয়না ডোগরা রেজিমেণ্টকে—ওরা আছে, তা-ই যথেষ্ট। নিজেদের মনে পাপ থাকলেই তোমরা ওদের উৎপাত বলে মনে করবে, নইলে ওরা ত সহরের বাসিন্দেই বনে গেছে! টাউনক্লাবকে ফুটবলম্যাচে ডাকে, সিভিলকোর্ট থিয়েট্রিক্যাল পার্টির নাটকে এসে দলবেঁধে ঢোকে, আর অফিসাররা টাউনহলে এসে বিলিয়ার্ড টেবিল ঘিরে দাঁড়ায়। খুন-ডাকাতি যদি না কর আমাদের ভয় করবে কেন? তোমাদের যে খুনে ডাকাত হতে দিচ্ছিনে এ-ও কি আমাদের একটা অপরাধ? খুন-ডাকাতির নেশা বাংলাদেশের আফিং-এর নেশা—ছাড়তে কষ্ট হয় জানি। বেশত ক্রমে-ক্রমে

ছেড়ে দাও—ডাকাতি ছেড়ে রাইবেঁশে নাচ শেখো—ডাকাতের রাইবেঁশে নাচ! ছেলেরা তাই শিখছে—ইস্কুলে-ইস্কুলে শেখানো হচ্ছে তাদের। বুড়োরা-ও কেউ-কেউ যান—কেন যান বুঝতে পারেনা শিশির। যা হয়ে চলেছে তাতেই গা ভাসিয়ে দিতে চান কেউ-কেউ, তাই কি এঁরা যান?

তিতুও ঠিক তাই হয়ে উঠেছিল। তিতু! সামনে যা পাওয়া যায় তাকেই আঁকড়ে ধরা, বাছবিচার নেই, জীবনের মানে বুঝবার চেষ্টা নেই। কি কেলেঙ্কারি করল তিতু ও-বাড়ির কিরণকে নিয়ে! দুজনে ওরা পালাতে চেষ্টা করল—কিন্তু ধরা পড়ে গেল ষ্টেশনে গিয়ে। হৈ-হৈ উঠ্‌ল সারা সহরে! লজ্জায় আর বাবা মুখ উঁচু করতে পারলেন না তারপর। কিন্তু মাকে দেখা গেল অদ্ভুত। হাসতে হাসতে বলেছিলেন মা: "বিয়েই করবার ইচ্ছে হয়েছিল যদি, আর কি মেয়ে খুঁজে পেলিনে তুই! অত চেনাশোনায় কি বিয়ে হয়?" ঠোঁটে একটা ধারালো হাসি নিয়ে তিতু অন্যমনস্ক হয়ে রইল মাস-দু'মাস। কেসটা কোর্টে উঠ্‌লনা—দুপক্ষই লজ্জিত—সহরের মুরুব্বিরা ধরে-পড়ে কেস চেপে দিলেন। শেষে একাই পালাল তিতু—মার খোসামুদে কথায়ও কোনো ফল হলনা। আস্কারা দিয়ে মা-ই ওকে নষ্ট করেছিলেন—ফল হবে কেন? কিছু বলতে গেলে বাধা দিতেন: 'থাক। ও বাঁচবে না বেশিদিন!' 'বাঁচবেনা তুমি জানো! আর বাঁচবেনা বলে কি আমাদেরও বাঁচতে দেবেনা?'—হাবুল কিছুতেই সহ্য করতে পারতনা তিতুকে। হাবুল সহ্য করতে পারতনা, কিন্তু আজ শিশির হয়ত সহ্য করতে পারত—অনেক কিছুই সয়ে যেতে হচ্ছে যখন, তিতুকেও অক্লেশে সয়ে যেতে পারত শিশির। কিরণের

বিয়ে হয়ে গেছে—মামাবাড়িতে আর আসেনি—ছেলেপুলে নিয়ে গিন্নীবান্নি এখন! কিন্তু তিতু নেই। মার আশঙ্কাই শেষে সত্য হল! তিতু নেই ভাবতেই শিশিরের বুকের ভেতর একটা ঠাণ্ডা হাওয়া হু-হু করে ছুটে চলে যায়। কলকাতায় পালিয়ে গেল তিতু—তারপর কেউ আর তার কোনো খবর জানেনা। মেসোমশাইর দোকান তাঁর এক কর্ম্মচারি কিনে নিয়েছেন—তাঁর কাছে চিঠি গেল—উত্তর এলোনা। হাবুলের বন্ধু-বান্ধব কারা কোথায় আছে—কেউ আছে কিনা কলকাতায় তা সে জানতনা। "তুই যা—" মা বললেন। "তোমার লম্পট ছেলের খোঁজ আমি করতে পারবনা—" তিরিক্ষি হয়ে উঠ্‌ল হাবুল। যাবেন বলে বাবাই তৈরী হলেন শেষটায়—তখন রাজি হতে হল হাবুলকে। কিন্তু কলকাতায় গিয়েও বা কি—কোথায় খুঁজবে সে তিতুকে? স্যাতসেঁতে ঘুপসি কতো মেসই ত আছে—কতো বস্তি—কতো নোংরা জায়গা—কোথায় আছে ওটা কে বলবে! খোঁজ পাওয়া গেলনা—ফিরে এলো হাবুল। বাবা মারা গেলেন পরও দেখা নেই হতভাগার! তার এক বছর পর—ত্রিশ সনেই বোধহয়—ওর এক বন্ধুর চিঠি এলো, বসন্ত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল—সেখানেই মারা গেছে। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন, শুকনো শাদা মুখটা তার লাল্‌চে হয়ে ফুলে উঠ্‌ল তারপর, শরীরের বাকি রক্তটুকুই যেন চোখ দিয়ে জল হয়ে বেরুতে লাগল অনবরত। ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল বেচারী মুকুল—কতোই বা তখন ওর বয়েস—সতেরো কি আঠারো—শাশুড়ীর অবস্থায় পায়ের নীচে থেকে যেন ওর মাটি সরে গেল! দেওরের নামই শুনেছে ও, চোখে দেখেনি, তবু ওর চোখ

জলের বান রুখতে পারলনা! "তুমি যাও—জেনে এসো গিয়ে কলকাতায়—কি ভাবে গেল ঠাকুরপো—" গলা বুঁজে এলো মুকুলের। কলকাতা গিয়েছিল শিশির। সরাসরি তিতুর বন্ধুর মেসেই গিয়ে উঠেছিল শেয়ালদ ষ্টেশন থেকে।

কলকাতার পথে একটা কথাই বারবার মনে পড়ছিল তার: মা বলতেন, ও অল্পায়ু হবে—ঠিক তা-ই হল! আয়ু নেই, কি করে বাঁচবে ও। যার যেরকম কপালে লেখা! নইলে বসন্ত হয়েও ত কতো লোক বেঁচে যায়—আয়ুর জোরেই বেঁচে যায়। আয়ুর উপর সব দায় চাপিয়ে দিয়ে শিশির খানিকটা সান্ত্বনা খুঁজে নিয়েছিল। কিন্তু তিতুর বন্ধুর ঘরে পা দিয়েই যেন ঘোলাটে হয়ে উঠ্‌ল তার মন। ছেলেটির চোখে-মুখে শিশির খানিকক্ষণ তিতুকেই খুঁজে চলল। বাতির চারদিকে একটা আগুনে-পোকা ঘুরছিল—সেই ঘোরার দিকে পরপর চোখ ফেলে যেতে লাগল সে। তিতুর বন্ধু আছে—পোকাটাও আছে—কিন্তু তিতু নেই। ওর স্মৃতি বলতে কিছু নেই—স্যুটকেশটা পর্য্যন্ত নয়। শুধু একগাদা খাতাপত্র। বুকের ভেতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যেতে লাগ্‌ল শিশিরের। গলা বুঁজে এলো। শুধু কতগুলো কাগজ আর কালির আঁচড়—ওটুকুই চিহ্ন ওর? একটা যে মানুষ ছিল তার ওটুকু মাত্রই চিহ্ন! "বাংলাসাহিত্যে তিমির কীট্‌স্ হয়েই থাকবে, দাদা—" থমথমে গলায় বলতে সুরু করেছিল বন্ধুটি: "কিছুই ও পায়নি কিন্তু দিয়েছে যথেষ্ট—আরো দিতে পারত!" ষ্টেশনের হট্টগোলের মতই খানিকটা শব্দ এসে কানে ঢুকছিল শিশিরের। "কবিতা লেখেন অনেকেই—কিন্তু কবিতার প্রতিভা ওর মতো আর কারো ছিলনা!" কালির আঁচড়গুলোর দিকেও ভালো করে তাকাবার

সাহস ছিলনা তার পাছে সেই পরিচিত অক্ষরের রেখা আর বাঁকগুলো চোখের উপর ভেসে ওঠে। "তাছাড়া এমন মন—কারো কাছে হাত পাততে কোনো সঙ্কোচ নেই, কিছু না পেলে-ও দুঃখ নেই—" বন্ধুটি স্বপ্ন দেখে চল্‌ছিল ঃ "উৎসাহের আর আনন্দের অভাব নেই! মাসিক কাগজের অফিসগুলো থেকে যে খুদকুড়ো পাওয়া যেতো তাই নিয়ে এসে আমার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌ত—লিখে নাকি পয়সা পাওয়া যায় না, ত্থাখ!" বারবার চোখে জ্বালা ধরে যাচ্ছিল শিশিরের, মনে হচ্ছিল খানিকটা জল ঝরে না গেলে বুঝি চোখগুলো আর ঠাণ্ডা হবেনা। কিন্তু শোকে সে কাবু হয়ে কেন পড়বে? এ ধর্ম্মচ্যুতি কেন হবে তার? জীবন আর মৃত্যুর সীমাকে বড় করে দেখবার শিক্ষা ত সে নেয়নি কোনোদিন। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা যথা বিহায়...' গীতার পাতাটা শিশির চোখের উপর তুলে ধরেছিল। " 'তোকে আর কতো জ্বালাতন করব, সুধীন—' এ ক'টা মাস বলতে সুরু করেছিল তিমির—" সুধীনের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠ্‌ছিল ঃ "প্রায়ই বাইরে-বাইরে থাকত আর বলত, 'টাকার বরাতই নেই আমার! গ্রামোফোন-ওয়ালারাও আমায় বলে— গান লেখা যার-তার কম্মো নয় মশাই — আমায় বলে! টাকা-টা যে কি করলে পাওয়া যায় তা-ই বুঝলামনা — বোকা বলেই বুঝলামনা হয়ত!' — এভাবে কথা বলতে ওকে আর কোনোদিন শুনিনি! — আপনাকে বলতে আর ক্ষতি নেই, আমাদেরই এক বন্ধুর বোন — উষা — আমরা ধরেই নিয়েছিলাম তিমিরের সঙ্গে উষার বিয়ে হয়ে যাবে — সে-উষাও যখন একজন সাবডেপুটিকেই পছন্দ করে বিয়ে করলে — তখনও ও টাকার অভাবকে বড় করে তোলেনি মনে — শুধু এ-ক'টা মাস! আমি ঠাট্টা করে বলতাম—

তোর সর্ব্বনাশ হয়েছে! ও বলত — 'সত্যি তা-ই। সর্ব্বনাশ — ঠিক বলেছিস।' সেই উৎসাহ আর ফুর্ত্তি কিছুই আর ওর ছিলনা শেষটায় — এমন কি, লিখতও না — সাধাসাধি করেও তখন ওকে দিয়ে দু'ছত্র কবিতা লেখানো যায়নি!" হাতের তেলোয় চোখ লুকিয়ে ফেলল সুধীন। তার কথা শেষ হয়েছে। কিন্তু শিশিরের কথার স্রোত যেন থেমে যায়নি। মুখে সে কিছু বলতে পারছেনা বলেই কি তা' থেমে যেতে পারে? শিশির বাধা দিতে পারেনি। গালের উপর দুটো সরু জলের রেখায় কথার স্রোত বয়ে চলল তার। তিতু এসে তার চোখের উপর দাঁড়িয়েছিল — সেই উস্কোখুস্কো চুল, পাতলা ঠোঁট, চক্‌চকে চোখ — ছেঁড়া-ময়লা একটা পাঞ্জাবী গায়ে — হাসছে তিতু — তবু হাসছে — বলছে — 'জানো, টাকার বরাতই আমার নেই!' 'আমারই কি টাকার বরাত আছে রে —' শিশির যেন শুনতে পাচ্ছিল কে যেন তার ভেতর থেকে নিঃশব্দ চীৎকারে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছে — 'তবু এ কাজ কে করে? এমনভাবে কে মরতে যায়?' — দুহাতে কোঁচা-টা তুলে মুখের উপর চেপে ধরেছিল শিশির — তারপর লুটিয়ে পড়েছিল সুধীনের ঘরের মেঝেতে।

পুরোনো হয়ে গেছে কলকাতার সে-রাত্রিটা। তবু মনে পড়লে নতুন মনে হয়। ঠিক ওই চেহারাতেই তিতুকে দেখতে পায় শিশির। আর দেখতে পায় পঁচিশবছরের একটি তরুণ মুখ — সুধীনের মুখ। কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধই না তৈরী হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের। সওদাগরি অফিসে সামান্য কেরাণীর কাজ করত সুধীন, কি বা তার সম্বল — কতোই বা উপার্জ্জন — অথচ ওটুকু সম্বলেই তিতুকে জড়িয়ে ধরেছিল সে ভাই-এর মতো করে! যে-ক'টা দিন বাঁচতে পেরেছিল তিতু — হয়ত শুধু সুধীনেরই

জন্যে। নইলে আর কি ছিল ওর, কে ছিল? দাদা ছিলনা, ভাই ছিলনা, মা-বাবা কেউ নয়। জীবনকে চিনতে পারেনি তিতু — হয়ত সুধীনও তখন চিনতে পারেনি তবু যে দুজন একসময় পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল হয়ত তা জীবনেরই কোনো রহস্যময় ইঙ্গিতে — হয়ত এ-ইঙ্গিত জীবনের একটা দুর্ব্বল, ভঙ্গুর দিক — তবু তা জীবনের কতো অন্তরঙ্গ!

বাসায় ফিরে এসে কাগজপত্রের পুটুলিটা ট্রাঙ্কের নীচে লুকিয়ে ফেলেছিল শিশির, কাউকে দেখায়নি — কিছু বলেনি কাউকে। মা-ও কিছু জানতে চাননি। মার ঘরে বাবার ছবির পাশে তিতুর ছোট বেলাকার একটি ছবি ঝোলান দেখতে পেয়েছিল সে। মখমলের কোট-প্যাণ্ট-পরা একটি দুষ্টু ছেলে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে আছে।

মার ঘর! মারই প্ল্যান ছিল তিন-কোঠার দালান হবে। তিন ভাই-এর জন্যে তিনটি ঘর — নিজেদের জন্যে ত শ্মশানই পড়ে আছে! মাঝের ঘরে মা থাকতেন — বাবা এক পাশের ঘরে। এখন মাঝের ঘরটা-ও রুমু আর ঝুমুকে ছেড়ে দিয়ে মা বাবার ঘরে গেছেন। দুটো ঘরই এখন শিশিরের। সাবেক বাস্তুঘরে বৈঠকখানা হয়েছে তার, বেড়া দিয়ে ওটাকে অন্দর থেকে বাইরে ঠেলে দিয়েছে সে। খারাপ দেখায় তাতে — কিন্তু দেখানো-টা আর বড় নয় এখন, দরকারটাই বড়। মা আপত্তি করেন নি। অবশ্যি কোনো কাজেই আর তাঁর আপত্তি নেই। পুকুরটা ডোবা হয়ে গেছে, ভরিয়ে ফেলবার কথা হয়, মার আপত্তি নেই। কিন্তু ঘাটলাটার কি হবে? "ভেঙে ফ্যাল—" বলেই ঠোঁট বুঁজিয়ে রাখেন মা। বাবা থাকতেই জলের কল

আনা হয়েছিল — চৌবাচ্চায় ফাটল ধরে যাচ্ছে এখন — বারবার মেরামতের কথা তোলে শিশির কিন্তু মেরামত হয়না। মার মুখ থেকে টুঁ-শব্দটিও আসেনা—অথচ মা-ই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চৌবাচ্চা আর স্নানের পাকা জায়গা তৈরী করিয়েছিলেন!

নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মা — শিশির লক্ষ্য করছিল। তা-ই হয়ত নিয়ম। এখন হয়ত মুকুলের ছড়িয়ে পড়বার কথা। কিন্তু কিছুতেই ও ছড়িয়ে পড়ছেনা—মার মুঠো থেকে যা আলগা হয়ে যাচ্ছে, মুকুল তা জড়িয়ে ধরেনা। ও যেন বৌ-ই থেকে যেতে চায় চিরকাল। রুমু-ঝুমুর দিকেও তাকাবার যেন দায় নেই ওর। মা-ই ওদের সঙ্গী। ঝুমু-টা যখন হাঁটতে শেখেনি—তবু চার হাতপায়ে উবু হয়েই মাঝের ঘরের দরজা থেকে দিদিমার ঘরে উঁকি দিত—দিদিমা হয়ত তখন রুমুকে ছড়া শেখাতেন—সেই ছড়া, কন্যার মা সুন্দর বলে যে বর গোসা করে থাকে। ঝুমুর দিকে তাকাতেননা। কিন্তু কেন? ওর মুখের আদল অনেকটা তিতুর মতো বলেই কি? তিতু-ই কি এলো আবার? এবার এলো কি শিশিরকে শাস্তি দিতে? মাঝের ঘরে রুমু-ঝুমুর শোবার ব্যবস্থা অবশ্যি শিশিরই করেছিল—পার্টিশন-দেয়ালের দরজা ত খোলাই থাকে—দুটো ঘরকে এক ভাবতেও ক্ষতি নেই। তাছাড়া বিদেশী এ-নিয়মটা ভালো। লেখাপড়া ত আর শিশিরের উপার্জ্জনের কাজে লাগলনা —ঘরসংসারের কাজেই খানিকটা লাগুক। ব্যবস্থার শেষে মা মুকুলকে বলেছিলেনঃ "তাই ভালো। মার গা ঘেঁষে না থাকাই ভালো ছেলেপুলেদের!" দেখা গেল মুকুলের তাতে আপত্তি নেই। মাত্র হাঁটতে শেখা পর্য্যন্ত ঝুমুকে সঙ্গে রেখেই দায় চুকিয়ে ফেলেছিল মুকুল। তখন মার ঘরে ঝুমুর উৎপাত সুরু হল।

রুমুকে পাশে বসিয়ে মা যখন গুণগুণ করে মহাভারত পড়েন তখন হয়ত দেখা গেল ঝুমু মার পিঠের উপর ঝুপ করে পড়ে গলা আঁকড়ে ধরছে। মা তবু চোখ ফেরাননা—পড়তেই থাকেন। কিন্তু তাতেও কি রক্ষে আছে! মার গালে গাল ঘষতে সুরু করে দেয় দুষ্টু মেয়ে। মা হাত বাড়িয়ে ওকে কোলের ওপর টেনে নেন—কি আর করা যায়—কিন্তু চোখে চোখে তাকান না।

ঝুমুকে আদর করবার তেমন কেউ নেই—তা-ই মনে করে শিশির, আর যেন তা-ই ওকে আদর দিতে এগিয়ে যায়। শিশুর মনে ব্যথা দিতে নেই। তাছাড়া ওয়ার্ড্‌স্‌-ওয়ার্থের সে-কথাটাও মনে পড়ে: —শিশুদের গায়ে স্বর্গের ছোঁওয়া লেগে থাকে। 'কে তোমায় বেছি ভালোবাছে—' কোলে নিয়ে ঝুমুকে হয়ত জিজ্ঞেস করে শিশির। "ব-ল্‌-ব না—া-া"—গাল দুটো গোল করে ফুলিয়ে তুলে কথার সুরটা নীচু আর ঢিমে পর্দা থেকে উঁচু আর জলদ পর্দায় নিয়ে আসে ঝুমু—আর সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা মেরে ঘাড়টা ফিরিয়ে নেয়। চোখে কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগে শিশিরের। ধাক্কাটা এড়ানো যায়না। মনকে ভুলিয়ে রাখা যায়না যে এ ঘাড়-ফেরানো-টা তিতুর। সব ভুলে গিয়ে ঝুমুকে বুকে জড়িয়ে ধরে শিশির কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকে।

তার মানে কি শান্তি পাওয়া? অবশ্যি খানিকক্ষণ মন শান্ত হয়ে থাকে—শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কতোক্ষণ? অশান্তির তুফান ভুলে থাকা যায় কতোক্ষণ আর!

"বাস্‌-ভাড়া নিয়েছেন ওঁরা—রথে যাচ্ছেন সবাই—ও-বাড়ির রাঙা-বউ এসেছিল জানতে আমি যাব কি না!"—মুকুল শিশিরের কাছে এসে দাঁড়ায়।

"ভাগে যা পড়বে তা-ই। ও আবার জিজ্ঞেস করা যায় না কি!"

"পাড়ার মেয়েরা সবাই যাচ্ছেন?"

"বুড়ো মানুষ গিন্নী-ঠাকরুণ পর্য্যন্ত—"

"মা-কে বলনা একবার—"

"যেতে?"

"না। তোমার কথাই।"

"মা যেতে বলবেন—ইচ্ছে না থাকলেও বলবেন।"

"তবে আর কি!"

"তোমার রুমু—বেঁকে দাঁড়িয়েছেন—ঠাকুমার ধারা ধরে উঠছে এখন থেকেই—"

কথাটা বেসুরো শোনাল শিশিরের কানে। মেজাজ হারিয়ে ফেলছে মুকুল। দোষ নেই—বড্ড বেশি অবহেলা পেয়েছে ও এখানে এসে। তার ফল একদিন ফলতে সুরু করবে, জানে শিশির। শিশির নিজেও অবহেলা করেছে মুকুলকে প্রথম-প্রথম। শ্রদ্ধা করবার মতো কিছু পায়নি বলেই অবহেলা করেছে। এম-এ ক্লাশে তাদের সঙ্গে দুজন মেয়ে পড়ত—কলেজে-ইস্কুলে কতো মেয়েকেই যেতে দেখেছে কলকাতার ও-ক'টা বছর—আর এ-সহরেও মেয়েরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে তখন—হাইস্কুলে ভীড় জমেছে। শিশির ভাবতে পারেনি তার স্ত্রী এদের দলের কেউ হবেনা। একটা গেঁয়ো-সহরের সামান্য লেখা-পড়া জানা একটি মেয়ে—গান জানেনা, জুতো পরেনি কোনোদিন—লালচে বৌ সেজে যে তার জন্যে তৈরী হয়ে আছে, এ কি ভাবা যায়? মন ওঠেনি শিশিরের। বাবা-মা খুশী হয়েছিলেন—কিন্তু স্বপ্ন-ভাঙার ব্যথা শিশির শীগ্‌গীর মুছতে পারেনি। চুপচাপ থাকত—মুখভার—মুকুলের সঙ্গে ভালো

"মা ?"—শিশির চোখের উপর একটা প্রশ্ন তুলে ধরে।

"মা কি যাবেন না কি !"

"যেতেন ত আগে !"—ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বলে শিশির ঃ "আগে যেতেন। আমাদের নিয়ে ঘণ্টা-চুক্তি ঘোড়ার গাড়িতে গেছেন অনেকবার !" ফিকে হয়ে আসে শিশিরের গলা, বুঝতে পারে এ-কথার এখন আর কোনো মানে নেই।

"আমি যাব কি না তা-ই বলো !"

"যেতে হয় যাও—"

"ও ত' আর বলা হলনা !" মুকুলের মুখে ছায়ার ছাপ লেগে যায়।

আজকাল প্রায়ই ঠিক ওম্নি হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে মুকুল। আগে এমন হতনা, এখন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে ওর মাঝে-মাঝে। সবই শিশিরের চোখে পড়ে কিন্তু উপায় আছে কি কিছু ? দশভুজার বাড়িতে পূজো-পার্ব্বণে নিজহাতে সে ভোগ সাজিয়ে নিয়ে যায়—মনে-মনে আশা থাকে উপায় একটা কিছু হবে। রোজগার যদি বিশ-পঁচিশটা টাকা উপরে উঠে যায় তাহলেই একটি চাকর আসে, মুকুল হাঁপ ছাড়বার অবকাশ পায়। বৈঠকখানায় এককেসময় নথিপত্র পাশে ঠেলে রেখে কোষ্ঠী-টা খুলে বসে শিশির। নেহাৎ মন্দ সময় নয়ত এ-বয়েসটায় ! মুসাবিদায় উৎসাহ আসে। নতুন প্রকাশিত কোনো আইনবই ভি-পিতে পাঠাবার জন্যে কলকাতায় চিঠি পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু মাসের শেষে দেখা যায় উপার্জ্জনের দাগ নীচে নেমে আসছে। নীচে তা নামতে থাকে—উপরে উঠলেও আগেকার কোনো উঁচু দাগে পৌঁছুতে পারে না।

হাসি নয়, হাসির একটা ভাঙাচোরা ছবি ফুটে ওঠে শিশিরের মুখে ঃ "সবাই চাঁদা করে ভাড়া দিচ্ছ ত ? তোমার বরাদ্দ কত ?"

করে কথাও বলত না। আরো তেতো হয়ে উঠত তার মন, যখন দেখতে পেতো অবহেলা-অপমান বোধটুকুও মেয়েটার নেই—শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে নিয়ে বেশ ফুর্ত্তিতেই আছে সে! কিন্তু মানুষ বদলায়—মেয়েরা খুব বেশি বদ্‌লাতে পারে। হয়ত তাই ওদের 'প্রকৃতি' বলেছে—প্রকৃতির মতো বদলায় বলেই হয়ত বলেছে। মা-ও ত বদলে গেলেন কতো! বাবা বদলাননি—বাবাকে ঠিক একটি জায়গাতেই পেয়েছে শিশির। শাশ্বত পুরুষ!

"আমার কথা ত কথা-ই নয়—তুমি বলোগে রুমুকে—"

"এক্ষুণি যাচ্ছ না কি?" এতোক্ষণে শিশির ভালো করে তাকিয়ে দেখল মুকুলের পরণে আটপৌরে শাড়িটা নেই।

"বাঃ—ক'টা বাজে তারও খেয়াল নেই?"

ছুটির দিনে খেয়াল থাকেনা সত্যি। শিশিরের আরো বেশি খেয়াল থাকেনা। সমস্ত অতীত-টা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মনের উপর। বয়েস হয়েছে বুঝতে পারে সে—অতীতটাই এখন মস্ত বড়—ভবিষ্যৎ বিন্দু হয়ে আসছে—তাই অতীতেরই রাজত্ব এখন মনের উপর।

আধ-ময়লা একটা ফ্রক গায়ে চড়িয়ে খুসীর আর সীমা ছিলনা ঝুমুর—উঠোনময় দৌড়ঝাঁপ চলছিল তার। নির্ব্বাক দর্শক দিদি তার বারান্দার পিলারে হেলান দিয়ে মার নালিশ শুনে-শুনে মুখ কালো করে তুলছিল ধীরে ধীরে। শোওয়া থেকে উঠে বসল শিশির।

"কি রে রুমু—যাবিনে বলছিস কেন?"

ছলছল চোখে বাবার দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল রুমু।

"বল্‌ যাবিনে কেন?"

"এ-জামা পড়ে কেউ যায় না কি?" গায়ের ফ্রকটা দুহাতে টেনে উঁচু করে তুলে ধরল রুমু।

"এ-জামা কেন—তোর জামা নেই আরেকটা?" ধারাল, ঠাণ্ডা গলায় বললে মুকুল।

"তা-ও এম্নি।"

"জামা!"—শিশির অনর্থক হাসতে সুরু করল: "চারদিকের পাড়া-গাঁ থেকে কতো ছেলেবুড়ো এসে দুদিন তিনদিন ধরে জগন্নাথ মন্দিরে জড় হয়—কারো গায়ে তুই জামা দেখতে পাবিনে! ভীড়টাই ওখানে মজা—কে কাকে জামা দেখাবে!"

"ও-বাড়ির ফুলু-রতন ওরা এম্নি জামা পরে যাবে কখনো?" মার ধারাল গলার জবাবে রুমু চোখে একটা ধারাল প্রশ্ন তুলে ধরে।

"মাষ্টার-বাড়ির ছেলেমেয়েরা? ওরা যাবে কি পরে? ও-বাড়ির মেয়ে হলে বুঝতিস!" মুকুল উঠোনে নেমে যেতে সুরু করে।

"লক্ষ্মী মা—যা—" আস্তে আস্তে বলে শিশির।

মুকুল পেছন ফিরে তাকায় না। ঝুমুকে টেনে কোলে তুলে নিয়ে উঠোন পার হয়ে যায়। রুমুর পা টলে ওঠে। সিঁড়িতে পা বাড়ায়। শিশির তাকিয়ে থাকে। রুমুর যাওয়াটুকু যেন একটা মহাদৃশ্য! তা ভেবেই যেন তাকিয়ে থাকে শিশির।

কি হবে আর খাটের উপর শুয়ে-শুয়ে এই ঘরের, এই বাড়ির, এখানকার মানুষগুলোর অতীত, অস্পষ্ট ছবি চোখের উপর টেনে এনে? খাটটা এখনো আছে। বিয়ের যৌতুক। রং-চটে গেছে। পায়ার উপর হাত নিয়ে যায় শিশির। বিয়ের যৌতুক বলে হয়ত এখনো চেনা যায় ওটাকে। হাতের উপর ভর দিয়ে শিশির উঠে পড়ে। কেন গেল মুকুল? সবার সঙ্গে দল বেঁধে এমন কি দরকার ছিল তার

যাবার? মনের আভিজাত্যটুকুও নেই মুকুলের—যা মার ছিল, এখনো যা তাঁর আছে। মুকুলের সাধারণ মনের সংসর্গেই কি দিনের পর দিন সাধারণ স্তরে নেমে চলেছে শিশির? ওর সাধারণ ভাগ্যের ছোঁওয়া কি লাগল এসে তার ভাগ্যের উপর? তা-ই। মুকুলকে ভুল বুঝতে সুরু করেছিল শিশির। ভাবত, পাড়াপড়শীর সঙ্গে এতো মেলামেশা, ওর—মার মনে কষ্ট দেবার জন্যেই। মা একা থাকতে ভালোবাসেন বলেই ওর এই জেদাজেদি! আসলে একা থাকবার মতো মনের শক্তিই ওর নেই। পাড়ার কারোরই নেই। আলাদা হয়ে থাকতে ভয় পায় মাষ্টার-বাড়ির বৌরা—ওবাড়ির সুরেশ-বিনয়ের পরিবার—কোবরেজ-ভিটেতে তাদের যে নতুন ভাড়াটে এসেছেন, তাঁরও ছেলেমেয়েরা। জড়িয়ে থাকে বলে যে মিলেমিশে থাকে তা নয়, এ ওর নামে, ও এর নামে কাণাঘুষো করে চলছেই। বাইরে থেকে বোঝবার যো নেই। ও-বাড়ির গিন্নীঠাকরুণের মতো চেঁচিয়ে ঝগড়া আর হৈ-চৈ করে মেলামেশা করার পাট উঠে গেছে আজকাল—কারো সে-শক্তি নেই। একা দাঁড়াবার মতো গুণ থাকলেই ঝগড়া করবার শক্তি থাকে—ওরা কেউ একা দাঁড়াতে পারবে না। সব ভাঙাচোরা, রং-চটা মানুষ! কর্ত্তামশাই মারা গেলেন আর সমস্ত পাড়ার রং-টাই যেন চটে গেল! চৌধুরী-পাড়ার বুড়ো চৌধুরী মরে গেলেন পর ওখানকার ছেলেদের ডাংপিটেপণা একদম মীইয়ে গেল—উঠে গেল তাঁর ডনের আখড়া—উঠে গেল তাঁর হাডুডু খেলার টীম। কর্ত্তামশাই ছিলেন পূজোপার্ব্বণের পীর। ঘটা করে বারোয়ারী কালিপূজো বছরে একবার তাঁর করা চাই-ই—বাইরের মস্ত উঠোনে সামিয়ানা খাটিয়ে দু'একবার অহোরাত্র কীর্ত্তনও বসিয়েছেন তিনি। তারপর, এ-রথের সময়, কোর্ট-অব-ওয়ার্ড্‌সের বাবুদের জন্যে দুটো

হাতী আসত—একটি হাতী বরাদ্দ ছিল ওয়ার্ডস্‌-ষ্টেটের ম্যানেজারবাবুর মাতুল কর্ত্তামশাইর জন্যে। শুধু বাড়ীর নয়, পাড়ার ছেলেরাও হাতীর পিঠে যতোটা ধরে উঠে বসবার হুকুম পেতো। হাবুল-ওদের যেতে দেননি মা—"কী দরকার পরের হাতীতে গিয়ে—আমাদের গাড়ী আসবে—গাড়ীই ভালো—" মা বোঝাতেন তাদের। আজ আর এ-কথা বোঝাবার কেউ নেই—সে-মা আর নেই—বুঝিয়ে লাভ নেই বলেই হয়ত মুকুলকে আর বোঝাতে চাননা মা।

কাপড়ের খুঁটটা গায়ে তুলে দিয়ে চটি পায়ে শিশির বাইরে চলে আসে। এক-পা, দু-পা হেঁটে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। এখনও লোক যায় রথতলায়। কিন্তু সে-ভীড় নেই—চারদিক থেকে লোক ভেঙে পড়ত আগে—ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়দৌড়ি সুরু করত—কতো রং-বেরং-এর লোক—হিন্দু-মুসলমান-পাহাড়ী কতো রকমের কতো যে মানুষ! আর রথও সত্যি দেখবার মতো! মস্ত-মস্ত গাছের গুঁড়িতে গজাল ঠুকে তার কাঠামো তৈরী—পাঁচতলা দালানের সমান উঁচু। বারোটি চাকা—দু'হাত চওড়া—উঁচুতে মানুষ প্রমাণ। দড়ি তার দুহাতের মুঠোতে কুলোয় না। পাঁচসাতশ' মানুষ দড়ি ধরে টানে, তাতেও রথ টলেনা—পাঁচ-সাতটা হাতী লাগিয়ে দিয়ে তবে তাকে টলানো হয়। আর টান পড়ল ত চারদিক থেকে কলা আর নারকেল বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। মাছি আর পিঁপড়ের সারির সঙ্গে ঐরাবত চলেছেন, দেখলে মনে হয়।

'যাচ্ছ না ?—অ শিশির—"

একপাল গেঁয়ো যাত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিল শিশির—ভাবছিল, এখনও ওরা কেউ-কেউ আসে—ডাক শুনে চমকে তাকাল। বৃদ্ধ উকীল নীলাম্বরবাবু দু'টি নাতীর হাত ধরে হেঁটে চলেছেন।

"এবার যাওয়া হলনা।" ব্যস্ত হয়ে উত্তর দিল শিশির।

"কেন?" ধর্ম্মমতি জুনিয়রটির কথায় অবাক হলেন নীলাম্বরবাবু।

"বাসার সবাই গেছেন—তাই।"

"ও"—খুসী-খুসী হয়ে উঠল নীলাম্বরবাবুর মুখ। অভ্যস্ত হাঁটায় হাঁটতে সুরু করলেন তিনি আবার।

সেই ময়লা কেড্‌স্‌—আধময়লা কাপড়—কলার-ছেঁড়া কোট; দেড় মাইল রাস্তা হেঁটে চলেছেন নীলাম্বরবাবু—বিধবা মেয়েটির ছেলেরা রথে যাবে বলে বায়না ধরেছিল বলেই হয়ত। আবহমানকাল এ-পোষাকেই দেখা গেল নীলাম্বরবাবুকে—বড়ছেলেটি দেউলিতে, ছোট-টি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি, সাতবছর ধরে টেকনিক্যাল স্কুলে কার্পেণ্টারি শিখে চলেছে। ধার্ম্মিক মন—প্র্যাকটিস তাই কোনোদিনই জমাতে পারেন নি, সিভিল-লাইনে থেকেও নয়। কেন যে এসেছিলেন তিনি এ-জীবিকায়! হয়ত সম্মানজনক আর অর্থকরী বলেই এসেছিলেন, জানতেন না যে অর্থকর পথ সম্মানজনক ত নয়ই, সাধুও নয়। তবু আশ্চর্য্য, কারো উপর কোনো অভিযোগ নেই তাঁর, নিজেকেও নিজে অনুযোগ করেননি কোনোদিন!

নীলাম্বরবাবু এখনও রথে যান—কিন্তু শিশির গেলনা কেন? সত্যি কেন গেলনা? রথের কথাটা মনেই আসেনি তার। কেন? মা যাবেন না বলে? সবাই মিলে যেতে হলে অনেক খরচ—তাই কি? না কি এম্নিতেই ভালো লাগছেনা আর রথে যাওয়া! ভালো যে লাগছেনা—তা সত্যি। নীলাম্বরবাবুর যেমন ভালো লাগছে তেমন ভালো তার লাগবেনা কোনোদিন। নিজের মন ত বুঝতে পারে শিশির!

গাগুলো ঘরমুখো হয়ে উঠ্‌বার আগে ত্রিমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে হাত

তুলে নমস্কার জানায় শিশির। যেতে ভালো না লাগাটা উচিত নয় বলেই যেন নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত দুটো কপালে ঠেকে যায়। সহরের বহু প্রাচীন দেবতা এই জগন্নাথের পরিবার। কোন্ যুগ থেকে চলেছে তাঁর রথ কেউ বলতে পারবে না। বঙ্কুবাবু দারোগার গল্পটা বাবার মুখে প্রায়ই শুনত শিশির—বাবারও নাকি ছোটবেলাকার গল্প। জুতো পায়ে রথের উপর গিয়ে উঠেছিলেন বঙ্কুবাবু—পাণ্ডাদের নিষেধ শোনেন নি। তারপর? রথে টান পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই পা-পিছলে একদম চাকার নীচে পড়ে গেলেন—থেঁতলে চ্যাপ্টা হয়ে হয়ে তাঁর চিহ্নটুকুও আর রইল না! ভাবতে গা শিরশির করে ওঠে! কী জাগ্রত দেবতা!

বাড়ি ঢুকে শিশির দেখতে পেল শুকোতে-দেওয়া কাপড়-জামাগুলো টেনে তুলে নিচ্ছেন মা।

"রথে এবার আর তেমন লোক হয়নি—" মাকে খবরটা শুনিয়ে দিতে চাইল শিশির।

মা মুখ তুলে তাকালেন: "রথে?"

"বাঃ, আজ যে রথযাত্রা তুমি খবর রাখনা?"

"মুকুল রথেই গেল বুঝি?"

"বেশ!" শিশির হাসতে লাগল: "তা-ও জানোনা!"

"ছেলেরা সকালবেলা রথ বার করেছিল কি? শাঁখ বাজতে ত শুনতে পেলামনা!"

"ছেলেদের রথ কি বেরোয় না কি আজকাল!"

মা আর কথা বললেন না—জামাকাপড়গুলো হাতের উপর জড় করে নিয়ে বারান্দায় উঠে গেলেন। শিশির তাঁর পেছনে হেঁটে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। টুকি-টাকি নিজের কাজগুলো ছাড়া আর

সবই ভুলে আছেন মা। ভুলে থাকতে পারছেন। আশ্চর্য্য! অথচ এ-রথের দিনে আগে কী সোরগোলই না গেছে এ-বাড়িতে! পালা করে আত্মীয়-স্বজনরা রথ দেখতে এসেছেন বছর-বছর। যে-বছর কেউ আসেন নি, হাবুল-তিতু-মিতুকে নিয়েই তোড়জোড় চলেছে মার রথে যাবার জন্যে—সঙ্গে হয়ত নিরু-মাসী বা কোবরেজগিন্নী জুটে গেছেন। সে এক অদ্ভুত মন ছিল তাঁর—হাত পাতবেন না কারো কাছে, হাত উপুড় করে দেবেন। অনেক দিয়েছেন অনেককে—শুধু দিয়েছেন—নেন নি কিছু। একবার একটা মণিঅর্ডারের রসিদ হাতে করে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন বাবা: "গোপীর পেন্সন হয়ে গেল—মাসে পাঁচ টাকা—তা-ই না!" মা ছোঁ মেরে রসিদটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন: "দশ বছর এ বাড়িতে খেটে গেল—তার কি পুরস্কার নেই? বুড়ো মানুষ—অন্ধ হয়ে গেছে—কে খাওয়াবে তাকে!"—তাছাড়াও মনে পড়ে, অশোকতলা থেকে একটি বুড়ো মুসলমান-ভিখিরি আসত বাচ্চা একটি মেয়ের হাত ধরে। টলটলে মুখ মেয়েটির—নাকে কাচের নোলক। কিন্তু পরণের ডুরে শাড়িটা স্থতো-স্থতো হয়ে গেছে। বছরে দুটো শাড়ি বরাদ্দ হয়ে গেল তার। নতুন শাড়ি পরিয়ে দিয়ে মা মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বুড়ো আল্লাহ রহিম—আল্লাহ—বলে বিড়বিড় করতে থাকত। বুড়োর কাছে বসে কারবালার গল্প শুনতেও দেখেছে শিশির মাকে। অশোকতলার মহরমের তাজিয়া কর্ত্তামশায়ের বাড়িতেই শুধু আসতনা—প্রত্যেক বছর একটি রবিবারের বিকেলবেলা মা ওই তাজিয়া আসবে বলে আঁচলের খুঁটে দু'টি টাকা বেঁধে রাখতেন!

ঘরে চলে গেছেন মা—শিশির মার ঘরে এল। রোদে-তাতা মেঘ ঘোরাফেরা করছে আকাশে। রথে জল হয় একেকবার। মেটে

রাস্তায় রথের চাকা আটকে যায় তখন—টানা-হেঁচড়া চলে বেদম। রথ আটকে থাকার মানে সমস্ত জেলার অমঙ্গল। নেহাৎই যখন সে-অমঙ্গলের সূচনা দেখা যায়—পাণ্ডারা পাঁজা-কোলে করে দারুব্রহ্মকে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যান। জল না হলেই রক্ষা। গায়ে জল শুকোলে ওখান থেকেই জ্বর নিয়ে ফিরে আসবে ঝুমু-টা!

"মা—" কি যেন বলবার জন্যে শিশির মুখ তুলে মার মুখের দিকে তাকাল।

মা-ও মুখ তুললেন। জলে তাঁর চোখ ভেসে যাচ্ছে।

দুই

একটা ব্যাপারে শিশিরকে ভাগ্যবান বলতে হবে—বুড়ো উকীলরা তাকে খুবই স্নেহ করেন। দু-তিন জন মাঝারি-আয়ের প্রবীণ উকীল তাকে পেলে আর কাউকে জুনিয়র নেন না। কারণ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছেলেটি। যে ধরণের আলাপ-আলোচনায় বার-লাইব্রেরীতে তাঁরা সাবেক কাল থেকে অবকাশ-রঞ্জন করে আসছেন, শিশিরের মতো শ্রোতা পাওয়াতেই তার ধারাটা মজে যায়নি। পলিটিক্স আর পরলোকের বাঁয়াতবলাতেই তাঁরা ঠেকা দিয়ে এসেছেন বরাবর—ত্রিশ সনের মহামারী কাণ্ডের পর পলিটিক্সের টুং-টাং ছেড়ে দিয়ে অগত্যা পরলোকের-বাঁয়ার বোলই ধরেছেন ইদানীং। আর এক্ষেত্রে শিশির কেবল শ্রোতা নয়—বক্তার আসনও তার মাঝে-মাঝে জুটে যায়। স্থানীয় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির তরুণতম সভ্য সে—এদিকে মন-মেজাজ, পড়াশুনো আছে খানিকটা—কাজেই তার কথা শুনতে তাঁদের বাধা নেই। অবশ্যি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে বারলাইব্রেরীর যোগাযোগ খুব বেশি ঘনিষ্ঠ নয়—প্রবীণ উকীলদের মধ্যে এক লীলাম্বরবাবু,—ওখানকার সেক্রেটারী, রিটায়ার্ড্ হেডমাষ্টার ভুবনবাবু প্রেসিডেণ্ট—উৎসাহী সভ্য আর তিন-চারজন যাঁরা আছেন সবাই অবসরপ্রাপ্ত, মৃত্যুপথযাত্রী। এঁদের মৃত্যু হলে সোসাটিরও মৃত্যু হবে বলে কেউ-কেউ ঠাট্টা করে থাকে কিন্তু এঁরা মনে করেন এবং মনে করে উৎসাহিত হন যে এ-অনির্ব্বাণ দীপ তাঁরা শিশিরের হাতেই তুলে দিয়ে যাবেন। মনে না করবারও কারণ নেই। ১৯১০-সনে

পারীতে যে একটি 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব মেটাফিজিক্স' গড়ে উঠেছে আর সব বড়-বড় চিকিৎসকরা যে তার উদ্যোক্তা—এযুগের এ-টাটকা খবরগুলো শিশিরের মারফৎ এসেই এঁদের বিশ্বাসের মূলে জলসিঞ্চন করছে। কিন্তু উকীলবাবুরা তাঁদের বিশ্বাসের স্বাস্থ্যরক্ষায় এতোটা উদ্গ্রীব নন—তাঁরা চান মক্কেলের মতো সাক্ষাৎ পুরুষের সন্ধান—ঈশ্বরজানিত পুরুষ। তাঁর কৃপায় ইহকালটা পুষ্ট আর পরকালের পথটা যদি সুগম হয় ত মন্দ কি! সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের রূপ-রসে তাঁদের তেমন বিশেষ কৌতূহল নেই। সে দুরূহ কাজটা সদ্গুরুরাই করুন। এবং তাঁরা এসে সংসারিক জীবদের জন্যে একটা সোজা রাস্তা বাৎলে দিন।

"সে এক যুগে গেছে—" হরিশবাবু তাঁর আলপাকার কোটের বোতাম আলগা করতে করতে বলেন: "সাধু-সন্নেসীর আর অন্ত ছিলনা। গোস্বামীমশাই-এর সঙ্গে অবশ্যি আমার দেখা হয়নি কিন্তু বারুদীর ব্রহ্মচারীকে দেখেছি!"

"স্বামীজিকে দেখেছেন?" শিশির উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে।

"বিবেকানন্দ? তিনি ত এ-স্তরের নন!"

"ব্রহ্মচারীর দয়াতেই হরিশবাবু—" বিলম্বিত হিক্কার মতো হাসতে সুরু করেন বৈকুণ্ঠবাবু।

"আরে না-না, ওঁর দয়া পেলে কি আর পরোয়া ছিল মশাই—ভবিষ্যৎ শুধু বলতেনই না—ভবিষ্যৎ তৈরী করে দিতেন!"

"আপনাকে কি বললেন তা-ই শুনি—"

"বললেন, চলে যাবে—"

"এ-যুগের সাক্ষাৎ মহাপুরুষ গিরি-মহারাজ—" বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর গলার রুদ্রাক্ষটা একবার অনুভব করে নেন।

"আছেন আরো কেউ-কেউ---" হরিশবাবু হাই তোলেন: "নিগমানন্দ—"

"ওঁরা বলেন, য়ুরোপীয়রা—" সম্মতি নেবার জন্যে চারদিকে তাকায় শিশির: "মনের চর্চা এ-যুগে নেই বলেই মানুষের মধ্যে তেমন বিভূতি আজকাল আর দেখা যায়না!"

"কথাটা মন্দ বলেননি ওঁরা—" হরিশবাবুর গোল গালে হাসির টোল ফোটে।

"ওটা ও-দেশের কথা শিশির—" বৈকুণ্ঠবাবু গম্ভীর হয়ে পড়েন: "আছেন—যোগী, ঐশ্বর্য্যবান আমাদের দেশে এখনও অনেক আছেন! কুম্ভমেলাতেই তাঁদের দেখা পাবে!"

"কুম্ভে ত আপনি গেছেন?"

"অনেকবার!"

"হিমালয়ের সন্নেসীরা সব আসেন?"

"সব!" নিরাশা ফুটিয়ে তোলেন বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর চোখে-মুখে: "দুর্গম গুহায় কতো সিদ্ধযোগী আছেন কেউ জানে না! ওঁরা ওঁদের ঈশিত্বে মগ্ন!"

হয়ত তখন হরিশবাবুর নাকের আওয়াজ শোনা যায়—বাধাধরা পাঁচমিনিটের ঘুমটা ঘুমিয়ে নিতে সুরু করেন তিনি তখন। হয়ত দোরগোড়ায় বৈকুণ্ঠবাবুর মুহুরীর মুখ দেখা যায় অথবা ফৌজদারী থেকে সওয়াল সেরে জলধরবাবু দিগ্বিজয়ীর আরক্তিম আভায় এসে বারলাইব্রেরীতে দর্শন দেন এবং ঘরে ঢুকবার মুখেই পাখা-টানা মালীর তন্দ্রা ছুটিয়ে দিয়ে আসেন। শিশির একটু মুষড়ে পড়ে। উঠেও যায় সে অনেকসময়। জলধরবাবুর আবির্ভাবে ত সমস্ত শরীর তার উঠ্‌বার জন্যে দস্তরমতো তাড়া

খেতে সুরু করে! তবে জলধরবাবুও একেকদিন বৈষয়িকতার দাম্ভিক মেজাজ থেকে অনিত্যতার নম্র পরিবেশে নেমে আসেন। হয়ত সেসব দিনে দু'একটি জামিনের আবেদন সই দিয়েই তিনি অবসর হয়ে যান, মন বিষণ্ণ থাকে আর তাই নীলাম্বরবাবু যেখানে একটি দৈনিক কাগজের আড়াল তুলে চুপচাপ বসে থাকেন—সেখানে, তাঁর পাশে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েন। এই দৃশ্যে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে যেতে হয় শিশিরকে। তখন জলধরবাবুই অতিথেয়তা জানান: "এসো এসো হে শিশির—"

সামনাসামনি বিরোধিতা ত আর চলেনা তাছাড়া শিশিরের মনে পড়ে যে সে জুনিয়র—তাই একটা চেয়ার নিয়ে এগিয়ে আসে সে।

"আপনার প্রশ্নের জবাব শিশিরই ভালো দিতে পারবে জলধরবাবু—" নীলাম্বরবাবু স্নেহার্দ্র চোখে শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

শিশির লক্ষ্য করে প্রশ্নাতুর জলধরবাবুর মুখে যেন তাঁর সেই স্বাভাবিক দীপ্তি নেই—আর তাই তাঁর দামী পোষাকটাও যেন খানিকটা আটপৌরে দেখাতে থাকে।

"আমি! আমি কি জবাব দোব!" আন্তরিক বিনয়ে মাথা নীচু করে রাখে শিশির।

"জবাব দেবে—" জলধরবাবু জবাব আদায়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন: "বিজ্ঞানের দেশে ওঁরা পরলোক বিশ্বাস করেন কি না!"

"খ্রীষ্টধর্ম্মে এ-বিশ্বাস কি করে থাকতে পারে বলুন—"

"খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা ছেড়ে দাও—ওঁদের বিজ্ঞান কি বলে?"

"অতীন্দ্রিয়তা দেখতে পায় কিন্তু বুঝতে পারেনা তা বিজ্ঞান; তাই

চুপ করে থাকে!"

"ওঁদের দর্শন?"

"তা-ও ইন্দ্রিয়াসক্ত—" শিশির হাসতে সুরু করে: "তাই ভারতীয় দর্শনকে দর্শনই বলেন না ওঁরা, বলেন আধ্যাত্মিকতা!"

"আধ্যাত্মিকতার চর্চ্চা ত ওদেশেও হয়!"

"হ্যাঁ, Séance-এর মারফৎ হয়—সূক্ষ্ম শরীরের ছবি তোলার চেষ্টা হয়—" শিশির জোরে জোরে হেসে ওঠে: "ওতে ওঁদের ম্যাজিকের মতো কৌতূহল শুধু!"

"বিজ্ঞানের মারফৎ না জানলে ওঁরা তা গ্রহণ করবেন কেন, বলো!" জলধরবাবু ফরিয়াদীর জবাব নিয়ে দাঁড়ান।

"ইন্দ্রিয় নিয়েই যার কারবার অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে তার প্রবেশ-পথ থাকবে কেন?"

জলধরবাবু চুপ করে মাথা নাড়তে সুরু করেন।

"ওঁরা যৌগিক বিভূতি লাভ করতে চাননি কোনোদিন—জলধরবাবু—" নীলাম্বরবাবুর মুখের হাসিটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

"তবে হ্যাঁ—" শিশির মেধাবী ছাত্রের ভঙ্গীতে পড়া দিতে সুরু করে: "পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়াও যে জানবার পথ আছে—মনের মারফৎ যে অনেক কিছু জানা যায় একথাটা ওঁদের বিজ্ঞান ইদানীং স্বীকার করতে সুরু করেছে!"

"ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষদের কথা ছেড়ে দিন—ওঁরা ত ভূত-ভবিষ্যৎ সবই চোখের উপর দেখতে পন" — নীলাম্বরবাবুর মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে যায়: "আমার জ্যেঠামশাই-এর কি হয়েছিল শুনুন — জ্যেঠাইমার অসুখ, ভুগছিলেন অনেকদিন — তাই কাশীতে জ্যেঠামশাই গুরুদর্শনে গেছেন, তাঁর আশীর্ব্বাদে যদি জ্যেঠাইমার

রোগমুক্তি হয়। গিয়ে দেখলেন, কাশীতে গুরুদেব নেই, হঠাৎ তিনি বিন্ধ্যাচলে চলে গেছেন। মন খারাপ করে তিনি ধর্ম্মশালায় ফিরে এলেন—ভাবছিলেন পরদিন বিন্ধ্যাচলে রওনা হবেন। রাত্রিতে শুয়ে আছেন—ঘুম আসছিলনা কিছুতেই—হঠাৎ যেন দেখতে পেলেন লালপেড়ে শাড়ীপরা একটি মহিলা এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন—অস্পষ্ট মুখ—চমকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি : 'কে ?' ছায়ামূর্ত্তি নড়ে উঠল, বললে : 'আমি চলে যাচ্ছি !' 'চলে যাচ্ছ ?' —জ্যেঠামশাই চিনতে পারলেন, জ্যেঠাইমা ! পরদিন টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত—গতরাত্রিতে জ্যেঠাইমা মারা গেছেন !"

"Telepathy—ওঁরা-ও স্বীকার করেন, হতে পারে এমন—" বিমর্ষ জলধরবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে শিশির : "কিন্তু মনের এই শক্তির পেছনে গিয়ে-গিয়েই যে ভারতবর্ষ আত্মার সন্ধান পেলো তা ওঁরা বুঝতে চাইবেন না !"

"রুটীর চিন্তায় বোঝা মুস্কিল—" জলধরবাবু হাঁফধরা আবেষ্টন থেকে বেরিয়ে পড়তে চেষ্টা করেন।

"রুটীর চিন্তা নয় জলধরদা—" শিশির হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে : "ওঁদের মাপকাঠি Time আর Space দিয়ে তৈরী, কিন্তু মুস্কিল যে মন ও-মাপকাঠির তোয়াক্কা রাখেনা !"

কথায় আগ্রহ কমে আসে জলধরবাবুর—মনে হয় এ-ধরণের দুর্ব্বোধ্য চিন্তায় সময় নষ্ট না করে সরাসরি পরলোককে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। এবং সব চাইতে ভালো তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করা। বাতকে-বাত প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি নীলাম্বরবাবুর কাছে, শিশির যে তা এতদূর গড়িয়ে আনবে তা কে জানত ! তবে ছোকরা এ নিয়ে পড়াশুনো করেছে। ভালোই

বলতে হয় ওর মতিগতিকে। মোহিনীবাবুর ছেলে যে এমন হবে তা তাঁর সৌভাগ্যই বলতে হবে! মনটা খারাপ লাগতে সুরু করে জলধরবাবুর। তাঁর ছেলে মুরলী-টাকে নিয়ে মুখ দেখাবার আর যো নেই! বাড়ি থেকে অবশ্যি তিনি ওকে বার করে দিয়েছেন—কিন্তু ওর কিসের বাড়ি, কিসের ঘর! অষ্টপ্রহর কার্ণিভ্যালে পড়ে আছে! মাঝে-মাঝে চুপিচুপি এসে ওর মার কাছ থেকে নাকি পাঁচ-দশটাকা চেয়ে নিয়ে যায়! ছেলেদের নষ্টের মূল মা! এ-যুগের মা-রাই নষ্ট করে দিচ্ছে ছেলেদের। জলধরবাবুর মনে পড়ে, মাকে তাঁর বাঘের মতো মনে হত! একটা সাময়িক অনাসক্তিতে ভুগতে থাকে তাঁর মন। নীলাম্বরবাবুর পাশেই বসে থাকেন চুপচাপ।

"আসক্তির যূপকাঠে ওরা নিজেদের বলি দিচ্ছে জলধরবাবু—" নীলম্বরবাবুর চোখে করুণা ফুটে ওঠে: "কাজেই সুখশান্তি ওদের নেই!"

জলধরবাবুর মুখে ভয়ের একটা ছায়া খেলে যায়।

"ওদের মার খেয়েও আমরা ঢের ভালো আছি!"

এবার শিশিরেরও চোখের আলো নিভে আসে। ভালো কি আছি আমরা? শিশির কি ভাবতে পারে, সে ভালো আছে? ভালো নেই। কেউ ভালো নেই। নীলাম্বরবাবু যে কি করে ভালো আছেন—কি করে যে তিনি ভালো থাকেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। ভালো থাকা ওঁর উচিত নয়—তবু ভালো আছেন! ওঁর মুখের রেখাগুলো বার্দ্ধক্যের—ঝড়-ঝাপটার দাগ নয়। অদ্ভুতভাবে খুসী হয়ে আছেন তিনি সবসময়—হেঁ, অনেকটা পাগলের মতোই। কয়েকটা এষ্টেটের কাজ করেন—আশী-পঁচাশী

টাকা মাত্র আয় তবু একটি দিন শিশির ওঁর মুখে অভাবের কথা শুনেনি!

আলাপ ঢিমে হয়ে আসে—দুর্ব্বল, অল্পভাষী নীলাম্বরবাবু একা আলাপের সূত্র ধরে রাখতে পারেননা। কাজেই সভা ভঙ্গ হয়। গভীর ক্লান্তি নিয়েই জলধরবাবু উঠে যান। শিশির বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কাছারী থেকে ফিরে আসবার পথেও শিশির ভালো থাকা নিয়েই মাথাটাকে ব্যস্ত করে রাখে। হরিশবাবু-ওঁরা চারজন একটি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে বাড়ি ফেরেন—মাসচুক্তি ভাড়াটে গাড়ি। চারজনের কেউ কোর্টে আটকা পড়ে গেলে সওয়ারী হবার জন্যে শিশিরের ডাক পড়ত। সুযোগটা গ্রহণ করতে হত তাকে। আগে সে মনে করত সৌভাগ্য, তারপর কয়েকদিন মনে হয়েছে সুযোগ, এখন মনে হয় দান গ্রহণ। তাই গাড়িটা এসে কোর্টের রাস্তায় দাঁড়াবার আগেই এখন শিশির বেরিয়ে পড়ে। হেঁটে বাসায় ফিরতে ক্লান্তি নেই তার—কোনোরকম কাজেই ক্লান্তি নেই। ভালো থাকতে পারত সে। কিন্তু মুকুলকে নিয়েই মুস্কিল। বেচারাও বা কি করবে, ছোট হোক বড় হোক সংসার সংসারই—সারাদিন একটু বিশ্রাম নেই। মা-ত নিজের জন্যে চাট্টি ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খেয়ে-দেয়ে দুঘণ্টায় অবসর হয়ে যান—তাঁর জন্যে কারো কিছু করতে হয়না, তিনিও কারো জন্যে কিছু আর করতে চাননা। মাঝে-মাঝে একবাটি নিরামিষ তরকারি জলে বসিয়ে শিশিরের জন্যে তুলে রাখেন। রাত্রিতে শিশিরের পাতের সামনে ওটা এনে দিয়ে মুকুল মুখ কালো করে বলেঃ "ছেলের জন্যে, বৌ আর নাতনীদের জন্যে নয়।" শিশির চুপ

করে থাকে—দু'টো কুমড়োর ডাঁটা আর চাট্টি আলু-বেগুন নিয়ে কথা বাড়িয়ে কি লাভ! সামনে আরো অনেক কাজ পড়ে আছে মুকুলের—নিজে খেয়ে, থালাবাসন মেজে তুলে রেখে তবে তার ছুটি। কাজগুলো সহজ হতে পারে কিন্তু ক্লান্তিকর—বুঝতে পারে শিশির আর তাই খানিকটা সহানুভূতি আসে মুকুলের জন্যে! মার আমল থেকে একই রকম চলে এলো এবাড়িতে—অন্যরকম আর হলনা! মুকুলের তদারকে ঠাকুর রান্না করবে—মা তাঁর পূজো-আচ্চা নিয়ে থাকবেন—শিশিরের এ স্বপ্ন ফললনা এতোদিনেও! মা এমন অদ্ভুত হয়ে গিয়েই হয়ত সব অশান্তি ঘটাল। খাওয়াদাওয়ায় ত তাঁর রুচি নেই-ই, এমনকি পূজোব্রতও সব চুকিয়ে দিয়েছেন! ভাবলে অবাক হতে হয়—বিশ্বাস হয়না এ তার আগেকার মা! রুমুর গায়ে-পড়া বাড়াবাড়ির সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারেন না বলেই মাঝে-মাঝে তাঁকে কথা বলতে শোনা যায়—নইলে হয়ত বাকি দিনগুলো চুপ করেই কাটিয়ে দিতেন।

মাঝের ঘরে মুকুল ও-বাড়ির রাঙা-বৌকে নিয়ে আড্ডায় বসেছে কখন থেকে কে বল্‌বে! আরো দু-চারটি অচেনা মুখ দেখা যায়—হয়ত নিজেদের পাড়া ডিঙিয়ে এ-পাড়ায় এসেছেন। 'চণ্ডীদাস' ছবির গল্প হচ্ছিল আড্ডা ভাঙবার মুখে। শিশির চুপচাপ ঘরে ঢুকে গেল। দেয়ালের দরজাটা বন্ধ করে আব্রু তৈরী করে নিয়েছে মুকুল—মার ঘরের দিককার দরজাও হয়ত বন্ধ করে দিয়েছে। সারাদিন মুকুলের বিশ্রাম নেই—মুকুলের মুখ থেকে কথাটা শুনতে শুনতে শিশিরও বলতে শিখেছে, ভাবতে শিখেছে ওরকম। কিন্তু বারোটা থেকে এই পাঁচটা পর্য্যন্ত কি করে

মুকুল? আড্ডায় বেরোয়, না-হয় বাড়িতে আড্ডা জমায়। কিন্তু মা-কে ত কোনোদিন এ-ভাবে সময় কাটাতে দেখেনি শিশির। যদি কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন—একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টার বেশি কেউ তাঁকে বসিয়ে রাখতে পারেনি—শেষটায় ত বেরোতেনই না কোথাও—রান্নার শেষে দু'ঘণ্টা যেতো বিকেলের খাবার তৈরী করতে—তারপর ঘর গুছোতে আসতেন—রোদ পড়লে ফলের গাছগুলোর চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন—দুপুরে ঘুমোতেননা, সেলাই করতেন না-হয় রামায়ণ পড়তেন। ঝুমুর একটা ইজারেও স্ঁচ লাগায়না মুকুল। রান্না-বান্নাটুকু সামলে নিতেই হাঁপিয়ে ওঠে—কখন আর কি করবে!

সংসারে ভর্ত্তি না-হওয়া-ই ভালো ছিল—ভেতরটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগতে সুরু করে শিশিরের। কাপড় পরে, চটিতে পা গলিয়ে পাখা নিয়ে বসে। এই বাজে কারবারে কি লাভ হল? ওতে মন দিলেও লাভ নেই, মন না দিলেও উপায় নেই। আদর্শ গৃহীর ধর্ম্ম-সাধনা বোঝাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—পড়তে চমৎকার লাগত শিশিরের। এখনও হয়ত ভালো লাগবে পড়তে কিন্তু ওসব উপদেশ দেহ গ্রহণ করেনা, জীবন নিতে চায়না—হজম করতে মাথার উপর বরাদ্দ দেয়। ওগুলো মগজের খেলনা, পেয়ে মগজ খুসী হয়ে ওঠে। অভাবগ্রস্তের শুধু গৃহী হওয়াই চলে—কড়া গৃহী, না-হয় সন্নেসী। দুটোর গুণ একসঙ্গে মেলাতে গেলে একটি ভালো মন আর ভালো ব্যাঙ্কব্যালেন্স চাই। কিন্তু নীলাম্বরবাবু যে কি করে অসাধ্য সাধন করলেন শিশির ভেবে পায়না।

"কানপাশা? ও আমি জীবনে পরতে পারবনা, মাসীমা—কখ্খনো না—" হাসির গিটকিরি তুলে বলছিল মুকুল।

"সবাই পরে—ভালোও দেখায়—" জনৈকা বর্ষিয়সীর গলা।

"ছবির মেয়েরা পড়ছে তাই সবাই ধরেছে ও-ফ্যাশন!"

"ভালো না লাগলে কি আর ফ্যাশন ধরে কেউ?" তৃতীয়ার মন্তব্য।

"তোমাদের আমল আর নেই বউ—" আবার বর্ষিয়সী: এবার বারান্দায় বেরিয়ে এসে খোলা জায়গায় গলা ছেড়ে দিচ্ছেন: "গয়না-গাটি ত' ছেড়েই দিয়েছিলে তোমরা—বৌ-হয়ে আমরা কানঝুমকো পড়েছি, খাড়ু আর বাজুর কথা বললে ত হেসেই লুটিয়ে পড়বে!"

"গয়না-গাটি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গরীবের আর কি ফ্যাশন থাকবে, মাসীমা—" খই ফুটে উঠল মুকুলের ঠোঁটে।

"বৌদির নাম দেবীচৌধুরাণীই হওয়া উচিত—" একটি কপোতকণ্ঠ।

কেউ হাসল কেউ হাসল না। মুকুল চুপ করেই রইল হয়ত। চৌধুরী-গিন্নী পর্য্যন্তই সে পৌছুতে পারে—দেবীচৌধুরাণীতে তার বোধ পৌছুবার কথা নয়।

কলকণ্ঠ পাখীর একটা ঝাঁকের মতো ওরা চলে গেল। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল শিশির, উঠে বসল।

"মা—আমায় হার দেবে?" ঝুমু বায়না ধরেছে।

"দোব—দোব—দোব—" দাঁতকপাটি লেগে গেল যেন মুকুলের: "আদেখলে মেয়ে—আদর করে নীলা হারটা গলায় পরিয়ে দিয়েছে আর কিছুতেই ওটা খুলে দেবেনা—"

আবার শয্যাগ্রহণ করতে হল শিশিরকে। মনে হল চোখ বুঁজে থাকা-ই ভালো। আরো ভালো হত ঘুমিয়ে পড়তে পারলে।

পাশের দরজা খুলে গেল। গোল করে পাটি জড়াতে-জড়াতে মুকুল এ-ঘরে এলো।

"সোনাদানা ছাড়া তোমার মেয়ের চলবেনা—বুঝলে ?"

চোখ বুঁজিয়ে রেখেই হাসতে লাগল শিশির : "তাই না কি ? কেমন রে ঝুমু ? আয় ত মা—এদিকে—"

ঝুমু এগিয়ে এসে শিশিরের বাড়ানো হাতটা জড়িয়ে ধরল।

"স্বর্গের বাগান থেকে তুমি পড়ে যাচ্ছ ঝুমুমণি ?" শিশির আপনমনে হাসতে থাকে।

"হুঁ—" বাবার হাতে মুখ ঘষতে সুরু করে ঝুমু।

"ও-বাগানে আর থাকবেনা ?"

"বাগানে ছাপ দেখেছিল রুমু—এত্তো বড় ছাপ—"

"সাপ ?" হো-হো করে হেসে ওঠে শিশির : "তা-ত দেখবেই !"

খোঁপা খুলে মাথায় ঝাঁকুনি দিল মুকুল : "মার গিনি-মোহরগুলো কোথায় গেল বলতে পারো ? হারচুড়ি ত ছোটঠাকুরপোর বৌ-এর জন্যে আছে—কিন্তু ওগুলো ?"

"আছে মার কাছে !" শিশির ঝুমুকে খাটের উপর তুলে নিল।

"রুমুকে হার দিয়েছিলেন গড়িয়ে, ঝুমুকে ত এক রত্তি সোনা দিলেন না !"

"ওঁর জিনিষ—উনি না দিলে কি করা যাবে !"

"না দেবার কথা ত বল্‌ছিনে—দিয়েছেন যে তা জানি !" ক্ষিপ্র আঙুলে খোঁপা তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুকুল।

"ওগুলো বাবার দেওয়া গিনি-মোহর—" শিশির ক্লান্ত হয়ে ওঠে : "বাইবেলে বলেছে স্বামীর প্রতি মেয়েদের বাসনা অক্ষয় !"

"কোথায় কি বলেছে শুনে আমার কাজ নেই—" মুকুল চলে যায়। যায় শিশিরের জন্যেই এক কাপ দুধ আর দু'টো বিস্কুট আনতে। দুধের অপেক্ষায় বসে থাকে শিশির—ক্ষিদের তাড়নাতেই অপেক্ষা

করতে হয়। মুকুল এক কাপ দুধ আনবে—সে-দুধে চুমুক দেবে শিশির —পেটের জ্বালা-জ্বালা ভাবটা কমে যাবে তাতে—আর কিছু নয়। শুধু এই। মনের কোনো দাবীদাওয়া উঁকি দিতে আসেনা, মান-অভিমান, ব্যথার কালো ছায়া কিছুই নেই! কলেজ থেকে এসে মাকে রান্নাঘরে বসে থাকতে না দেখলে যে অভিমান হত তার, যে ভাবে মুখ কালো হয়ে উঠত, আজ আর তা হয়না। মা যেন ভয়ই করতেন হাবুলের ওই অভিমানকে। আই-এ পড়ার দুটো বছরকে শিশির একটি মাত্র ছবিতেই চোখের উপর তুলে ধরতে পারেঃ সরু গোবিন্দভোগ চালের ভাত আর এক বাটি দুধ কোলে নিয়ে মা হাবুলের অপেক্ষায় বসে আছেন।—তিতুর জন্যে মাছের ঝোল আর ভাত শিকেয় তোলা আছে, তার জন্যে ততো ভাবনা নেই, নিজের হাতেই পেড়ে নিয়ে বসে যাবে সে খেতে। তবে গ্লাসে জল নিয়ে প্রায় কোনোদিনই বসতনা তিতু—গলায় গরস আটকে গেলে চেঁচাতে সুরু করত—মা তখন দৌড়ে আসতেন! হাবুলের বেলায় তা নয়—মাকে নিজের হাতে বেড়ে দিতে হত সব—কাছে বসে থাকতে হত। তাছাড়াও খুসী-খুসী হয়ে থাকতে হত তাঁকে। আদরই গিলেছে শিশির প্রত্যেকটি গরসের সঙ্গে। ভাতে একটি ধান থাকতনা, একটি মরা চাল নয়, চিনিতে একটু ফেসো জড়িয়ে থাকতে পারতনা, দুধে ধোঁয়ার গন্ধ নয় একটুও। ওইটুকু ছেলের মেজাজকে ভয় করার কি মানে ছিল? আদর ছাড়া আর কি মানে? যতীনদা কলকাতা থেকে বাড়ি আসবার পথে একদিন ব্রেক-জার্নি করতেন এখানে। প্রায়ই বলতেন মাকেঃ "খুব হয়েছে মাসীমা—যেম্নি দিদিমা আপনাকে ভয় করেন, ঠিক তেম্নি হাবুলকে ভয় করতে সুরু করেছেন আপনি!" গলা হাঁকিয়ে হেসে উঠতেন যতীনদা। মা বোকা বনে গিয়ে বলতেনঃ

"তোকেও ত আমি ভয় করি!" যতীনদা হাততালি দিতেন: "সে আমাকে নয়, আমার বিদ্যেকে—বলতেন আমি মুখ্খু হব, দা-মশাইর নাম হাসাব—দেখা গেল তা নয়। বি-এটা ওরা পাশ করিয়েই দিলে!" "পণ্ডিত-মুখ্খুও ত হয় মানুষ—তুই তা-ই!"—বলে মা রণে ভঙ্গ দিতেন।

তা-ই ঠিক—মরতে সুরু করেছে শিশির! কখন থেকে তা বুঝতে পারছেনা কিন্তু তিল-তিল করে মরে চলেছে ঠিক। তিতুর মতো হঠাৎ মরে গিয়ে অবসর হয়ে যাওয়া তার ভাগ্যে নেই—একটু-একটু করে ক্ষয়ে যাওয়াই তার ভাগ্যলিপি! আস্ত মানুষ নয় আর শিশির—তার সন্তানরা কি করে আস্ত হবে! ঝুমু চুপচাপ শুয়ে আছে তার পাশে—প্রাণ আছে কি নেই! ওইটুকু শিশুর চোখে আলো নেই, ঠোঁট শুকনো, নেতিয়ে-পড়া হাত-পা! একসময় হাবুল তবু আস্ত ছিল কিন্তু এরা এখন থেকেই ভাঙা। উচিত হয়নি—সংসারী হওয়া উচিত হয়নি শিশিরের। কারো কোনো লাভ হলনা যখন, সবারই যখন ক্ষতি, তখন এ যৌথকারবারে ঢুকবার কি দরকার ছিল! মা সুখী হতে পারলেন না, সে নিজে সুখী নয়—মুকুলও মনে করে সে সুখে নেই—তবে কেন এ-ঝঞ্ঝাট তৈরী করতে গেল সে?

তিন

১

ভোরের গাড়িতে হঠাৎ যতীনদা এসে উপস্থিত। গোঁফ-দাঁড়িতে আর বাব্‌রিতে অদ্ভুত চেহারা—পাঁচবছরের জেলের আড়াল হল্‌দেটে করে তুলেছে মুখ। যীশুখ্রীষ্ট! মনে মনে বলে উঠ্‌ল শিশির। মুখে বললে ঃ "জেসাস্‌ হয়ে ফিরে এলেন না কি যতীনদা!"

"তাই মনে হচ্ছে কি?" যতীন চোখ দিয়ে হেসে উঠ্‌ল ঃ "মাসীমা কই?"

অনিশ্চিত মক্কেলের তোয়াক্কা না করে শিশির উঠে পড়ল ঃ "চলুন—আপনার কথাই ভাবছিলুম ক'দিন থেকে—মাকে নিয়ে হঁপিয়ে উঠ্‌লুম!"

"কেন, কি হ'ল?"

"জ্যান্তই দেখবেন কিন্তু মড়ার সামিল।"

"ও।" অন্যমনস্কের মতো বল্‌লে যতীন।

দশবারো সেকেণ্ডের পথটুকু চুপচাপই হেঁটে যাওয়া যায় কিন্তু শিশিরের মনে হল মার ঘরে পৌঁছুবার আগে যেন যতীনকে অনেক কথা বলার ছিল। অনেক কথা, তাই ওটুকু সময়ে কুলোবেনা। আর তাই কথা না বলে যতীনের আগুবাড়া হয়ে চলল সে।

"যতীনদা এসেছেন, মা—" হাসি-হাসি মুখ নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল শিশির।

"যতীন?"

চারদিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে মার চোখগুলো স্থির হয়ে গেছে লক্ষ্য করল শিশির।

"হাঁ"—যতীন ঘরে ঢুকে প্রণাম করতে গেল মাসীমাকে।

"না-না"—বিরজা সরে দাঁড়াতে চাইল। উবু হয়ে বাধা দিলে। কিন্তু যতীন পা ছুঁয়ে ফেলেছে।

"জেলে গেলে মানুষ আর অশুচি হয়না আজকাল—মাসীমা—" যতীন সোজা হয়ে মাসীমার মুখের দিকে তাকাল। জলে মাসীমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। মেঝেতেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল যতীন।

শিশির ভাবছিল মার এ ভাবগুলোর কথাই যতীনদাকে বলার ছিল।

"আমাকে—আমাকে আর প্রণাম করিস কেন?"

কান পেতে শুনল যতীন, মনে হল মাসীমা যেন মনে-মনে কথা বলছেন। কিন্তু কি ভেবে যেন সে হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠ্‌ল: "আমি বেঁচে আছি—আপনি বেঁচে আছেন, প্রণাম করবনা?"

"কিন্তু আশীর্ব্বাদ করবার আমার কি আছে বল্!" থরথর করে কেঁপে উঠ্‌ল বিরজার ঠোঁট, নাক, আর চোখের চারপাশ তারপর সমস্ত শরীর। হাতের উপর ছড়ানো কাপড়টুকুই মুখে চেপে ধরল সে।

শিশির মুখ ফিরিয়ে নিল। মাসীমার শরীরের ভাঙাচোরা রেখাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল যতীন। কয়েক সেকেণ্ড। তারপর আবার সে চারদিক কাঁপিয়ে তুলল হাসিতে: "আশীর্ব্বাদ করতেই হবে তার কি মানে আছে বলুন!"

কোথায় যেন ডুবে যাচ্ছিল বিরজা হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে উপরে

ভেসে উঠ্‌ল। মুখ থেকে কাপড়ের স্তূপটা সরিয়ে নিয়ে যতীনের দিকে তাকাতে চাইল আবার।

"আশীর্ব্বাদ আমার মাথায় বেশিদিন থাকবেনা মাসীমা—" যতীন মুখ উঁচু করে শিশিরের দিকে তাকাল।

"জেলে এবার খুব কষ্ট হয়েছে আপনাদের—না যতীনদা?" ছেলেমানুষ সাজল শিশির।

"আলাদা কষ্ট আর কি—জেলের কষ্ট! তবে অদ্ভুত এবার—মাসীমাকে খুব বেশি মনে পড়ত!" যতীন হাতের পিঠে গোঁফের দুপাশ ঘষতে সুরু করল।

আবারও চুপচাপ কাঁদতে সুরু করেছেন মা—ভালো লাগলনা শিশিরের—চলে যেতে ইচ্ছা করল বলেই বলল: "চা-ত আপনি খাননা যতীনদা—দুধ-মুড়ি এনে দিচ্ছি!"

নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বার ভয়ে মাসীমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চাইল যতীন: "মিতুর সঙ্গে কলকাতায় দেখা হল মাসীমা—"

ছায়ার মতো খাটের শিয়রের দিকে সরে এল বিরজা—পায়ার গায়ে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল।

"আমাকে হার মানিয়েছে মিতু—জানেন মাসীমা! তর্ক করে-করে মগজ গুলিয়ে দিয়েছে আমার!"

"চিঠি দিয়েছে—তোর সঙ্গে যে দেখা হয়েছিল খবর দিয়ে!"

"দেখা! রীতিমতো যুদ্ধ! আমাকে বলে দিলে—তোমরা সব সন্নেসির চেলা, তোমাদের দিয়ে স্বদেশী হবে স্বপ্নেও ভেবোনা!"

"ওম্নি সন্নেসির চেহারা তৈরী করলে বলবেনা সন্নেসি?"

"কি মুস্কিল!" যতীন কপাল থেকে চুলের বোঝা সরিয়ে

নিয়ে বল্‌লে: "জেলের ভেতর চুলছাঁটার হাঙ্গামা কে করবে—এখন দেখবেন কেমন ধোপদুরস্ত হয়ে যাই!"

"দেখেছি—তোদের সবাইকেই দেখছি—"

"কি এমন খারাপটা দেখলেন!"

"আশীর্ব্বাদ না লাগুক—অভিশাপ লাগছে তোর—"

"কিছুনা—কিছুনা—"

"দিদির অভিশাপ নয়—বৌমার অভিশাপ।" ক্লান্তিতে খাটের উপর মাথা এলিয়ে দিল বিরজা।

"তাই না কি!" কি যেন ভাবতে গিয়েও ভাবতে চাইলনা যতীন, বললে: "মরে গেলে কি আর করা যায় বলুন!"

"বেঁচে থাকলে বা কি হতো! বেঁচে ত ছিল চারবছর—কি পেয়েছে?"

"মানুষ কবে কি-একটা পায়, মাসীমা? ছেড়ে দিন—মানুষ বেঁচে থাকে!—ওটুকুই—ব্যস্!"

"তা-ও ত থাকিস না তোরা—" কেমন যেন মোটা আর ভারি হয়ে এলো বিরজার গলা।

"ও-চিন্তা করবেন না মাসীমা—" কথার ঝড়ে মাসীমার মনকে উড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল যতীন: "আমরা বেঁচেও থাকব—আর ইংরাজের জারিজুরিও ভেঙে দোব। আমরা প্রহ্লাদের দল—বিষ খাওয়ালেও মরিনে, হাতীর পায়ের নিচেও চাপা যাইনে। মনের জোরে বেঁচে যাব—ঠিক গন্ধীজির মতো!"

"তোরা বিষ খাবি, ফাঁসীতে যাবি, রাস্তায় মরে পড়ে থাকবি, তার জন্যেই কি তিল-তিল করে তোদের গড়ে তোলেন মা-রা? তা-ই চান বুঝি ওঁরা তোদের কাছে? কেমন—তা-ই চান?" চোখ

বুঁজিয়ে নিল বিরজা—চোখ-ভরা জলটুকু আবার গড়িয়ে আসতে লাগল গালের উপর।

কথাটার জন্যে তৈরী ছিলনা যতীন। মাসীমার মুখে এ-কথা শুনলে "ত্রিশ কোটি সন্তানেরে" কবিতাটা যেদিন আওড়ানো যেতো আজ যেন আর সে-সময় নেই। সে-সময় নেই বলেই বুঝি সে-মাসীমাও নেই যিনি কবিতাটা শুনে বলতে পারতেন: "মা তোদের মানুষ করেনা, মানুষ করে পুঁথি-কেতাব, না?"

"ওহ্-হো—" লহর তুলে হেসে উঠল যতীন: "বুঝলাম! বাবার মতো মামলা-বাজ হওয়াই বোধহয় আমার উচিত ছিল! কিন্তু বাবাও খুব সুখে ছিলেন না, মাসীমা। আসল কথা সুখ বলে কোনো জিনিষই নেই! আমার ত তা-ই মনে হয় আর তাই সুখের অভাবও হয়না আমার!"

পায়ে একটা কচি হাতের স্পর্শ পেয়ে যতীন চমকে উঠল: "আঁা?"

দুহাতের আঙুলে ফ্রকটা টেনে-টেনে হাসতে লাগল রুমু।

"তুমি কে?" মাথা দুলিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করল যতীন।

"রুমু—"

বিরজা চোখ মেলে তাকাল। ঠাকুমার গা ঘেঁষে আশ্রয় নিলে রুমু।

"ওকে এই এতটুকু দেখেছি—" দুটো আঙুলে একইঞ্চির মাপ দেখালে যতীন।

"একবছরের ছিল।"

"দেখতে কার মতন—উঁ?" যতীন ঠাওর করে দেখতে লাগল রুমুকে।

"মা-ই না কি এসেছে—বলে ও!"

"আমার দিদিমা? তুমি? উঁহু।"

লজ্জা পেয়ে রুমু ঠোঁটে জিভ জড়াতে সুরু করে।

"মামার খবর কি, মাসীমা?"

"মাথার দোষ বেড়ে গেছে। একেক সময় বেঁধে রাখতে হয়!"

"বামুনগোষ্ঠীর মাথার দোষ না হয়ে যাবে কোথায়? পূর্ব্বপুরুষের তন্ত্রসাধনার ফল!"

"কেউ ত পাগল ছিলনা আমাদের গোষ্ঠীতে, মার গোষ্ঠীতে ছিলেন!"

"মাথাওয়ালা ছিল ত—মাথাওয়ালাদেরই মাথা নষ্ট হয়!" হাতে দাড়িগুলো চাপতে সুরু করলে যতীন: "মামাকে দিয়ে ভাগ্নেদেরও ভয়, সেই হয়েছে বিপদ!"

"তুই ত পাগল আছিসই—নতুন আর ভয় কিসের তোর?" ম্লান একটা হাসির ছায়া দেখা গেল বিরজার মুখের উপর।

"মাত্রা ত বেড়ে যেতে পারে—" যতীন হো-হো করে হেসে উঠল।

একবাটি দুধে মুড়ি ঢেলে নিয়ে এলো মুকুল--ঘোমটায় শুধু চোখ গুলো ঢাকা, অব্যবহারে ঘোমটার মাত্রা আর ঠিক নেই এখন—কিন্তু হাত কাঁপছিল তার। শিশির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তবু যেন জোর পাচ্ছিলনা হাতে। বাটিটা মেঝেতে রাখবার সময় দিলেনা যতীন, মধ্যপথেই বৌমার হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নিলে। মুকুল ছুটে পালাল। শিশির এগিয়ে এলো ঘরের ভেতর। রুমুর চুলে আঙুল চালাচ্ছে বিরজা। দৃশ্যটা চমৎকার—শিশিরের মনে হল যেন এক টুকরো স্বপ্ন। এক্ষুণি হয়ত ভেঙে যাবে তবু চোখে লেগে থাকবে তার স্বাদ। যতীনদার উপর কৃতজ্ঞ হয়ে

উঠল শিশির—এসে যেন ঘরের দৃশ্যটাই বদলে দিয়েছেন—এমন কি মার চেহারটাও যেন পাল্টে গেছে।

শিশিরের মুখে গৃহীর ফোলা-ফোলা স্বস্তি আর তৃপ্তি ফুটে ওঠে: "মিতুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার, যতীনদা?"

ঠোঁট থেকে দুধের বাটি নামিয়ে যতীন হেসে উঠ্‌ল: "'মোচের মুখে দুগ্ধ খেলে ছুঁচোর মতো দেখা যায়—বলো দেখি রুমুমণি, মোচের করি কি উপায়!'—রুমুর কথাই বারবার বলছিল মিতু—"

রুমু গা-কুঁকড়ে ঠোঁটে হাসি চাপতে লাগল। তারপর ঠাকুমার কানের কাছে মুখ নিয়ে জানতে চাইল: "ছুঁচো কি মা?"

"মা? বলে কি রে!" রুমুর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা চলছিল যতীনের।

"মা-ই বলে ও আমায়।" বিরজা রুমুর ছড়ানো হাত-পাগুলো গুছিয়ে টেনে নেয়।

"ছুঁচো মানে ইঁদুর—" মুড়ি চিবুতে থাকে যতীন: "তোমায় কেউ কিছু শেখায়নি, রুমুচন্দ্র! তোমার কাকা বড়-বড় বুলি ঝাড়ে, তোমায় এম-এ পড়াবে, বিলেত পাঠাবে কিন্তু দেখলে ছুঁচো-টা পর্য্যন্ত শেখায়নি!"

"কাজে ও উন্নতি করবে—মিতু—" খানিকটা আশীর্ব্বাদের মতোই গলার স্বর ঢালতে থাকে শিশির: "কিন্তু আমার দুঃখ নিজেকেও বড্ড বেশী সরিয়ে রাখতে চায়।"

"সরিয়ে রাখা-টা মন্দ কি? জড়িয়ে থাকার চেয়ে ওটা ঢের ভালো!"

"আপনার ধরণকে আপনি ত ভালো বলবেনই!" শিশির হাসতে থাকে।

"নিজের ধরণটাকে খারাপ বলে লাভ আছে কিছু?"

সত্যি লাভ নেই। শিশির তা জানে। তাতে শুধু অস্বস্তিই বেড়ে চলে—ধরণ বদলায়না। অবশ্য নিজের ধরণকে খারাপ বলা-ও একটা ধরণ, শিশির সে-ধরণেরই রোগী। শুধু শিশির কেন? অনেকেই। নীলাম্বরবাবু আর ক'জন আছেন? যতীনদা-ও বা ক'জন? কিন্তু যতীনদা কি নীলাম্বরবাবুর মতো? উঁহু। বরং উল্টো। ধর্ম্মের ছোঁওয়া বরাবর এড়িয়েই গেছেন যতীনদা। তাহলে কোন্ বিশ্বাসে ভর করে নিজের অবস্থায় খুসী হয়ে আছেন তিনি? অদ্ভুত! মনের বয়েস একটুও বাড়তে দেন নি —চেহারাতে-ই শুধু বয়েসের ছাপ পড়েছে কিন্তু মনে এখনও ঠিক সেই ছাত্রবয়েসেরই যতীনদা!

"সতু বলছিল—" বিরজা ম্লান চোখে তাকাল: "ওর খবরও না কি নিসনি তুই একটা চিঠি দিয়ে!"

"জেলে বসে খবর নিয়ে কি লাভ হত, মাসীমা—"

"লাভের জন্যেই বুঝি ভাই-এর খবর নিতে হয়?"

"লাভের জন্যেই সবকিছু করতে হয় কিন্তু নিজের লাভের জন্যে নয়।"

"নিজেকে বিলিয়ে দিলে আর লাভ কি হল যতীনদা?"

"আবহাওয়ার লাভ হয়।"

"ও—" অবিশ্বাসীর হাসি ফুটে ওঠল শিশিরের মুখে।

"জমি-জিরাত বাড়িঘরদোর আগলাবে সতু—আর তুই টই-টই করবি!" অনেকদিন আগেকার ভঙ্গীতেই কথাটা সেজে এলো বিরজার মুখে কিন্তু আগেকার ধ্বনির দোলা লাগলনা: "বড় ভাই-এর এই বুঝি ধর্ম্ম?"

"রাজা-যুবরাজের যুগ কি আর আছে মাসীমা? জল দিন একটু—" যতীন উঠে দাঁড়াল: "তা যখন নেই, বড়ভাই-এরও আলাদা ধর্ম্ম নেই!"

মা জল দেবেন জেনেও জলের জন্যেই যেন ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শিশির। উঠোনে নেমে রান্নাঘরের দিকে ছুটল।

একটা ছোট বাটিতে সুজির লেই নিয়ে খাওয়ার নামে হাতে-মুখে মাখামাখি করছিল ঝুমু। তা করুক, শিশিরকে এখন একগ্লাস জল চাইতে হবে কিন্তু জল চাইবার আগেই উনুনের পাশ থেকে মুকুল মুখ তুলে বল্‌লে: "রোজ-করা দুধ কিন্তু নেই—কিনে আন্‌তে হবে দুধ!"

২

রাত্রিতে শিশিরকে বারবাড়ির ঘরে ডেকে নিয়ে এলো যতান। কথা আছে। কি কথা? মিতুর সম্বন্ধেই কি কোনো কথা বলবেন যতীনদা? সারাদিন মার কাছে ছিলেন, হয়ত মার কথাই তুলবেন। যার কথাই হোক, শিশির কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। যতীনদার কাছে যে তারও কথা ছিল তাও যেন সে ভুলে গেল। অপরাধীর মতো মনে হতে লাগল নিজেকে। ডেকে এনে কথা বলবার অভ্যাস যতীনদার নেই—যা বলেন তিনি সরাসরি, মুখের উপর। যতীনদার মনে মেঘ জমে আছে কেউ বলতে পারবেনা, মেঘ এলে বৃষ্টি চলবেই। কিন্তু, শিশির লক্ষ্য করল, আজ যেন জমে উঠেছে মেঘ।

টেবিলের দুধারে দুজন এসে বসল। ল্যাম্পটার সলতে উস্কে দিয়ে ঘরের চারদিককার রেখার হিজিবিজি দমিয়ে দিতে না পারলে শিশির যেন স্বস্তি পাচ্ছিলনা। কড়া আলোতে যতীন কপালের উপর হাত তুলে চোখ ঢেকে নিলে। শিশির তৈরী হল, কি বলেন যতীনদা দেখা যাক।

"মাসীমা চলে যেতে চান কেনরে, হাবুল?" স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন গলায় যতীন জিজ্ঞেস করল।

"মা? চলে যেতে চান?" বাধো-বাধো ঠেকল শিশিরের কথাগুলো: "কোথায়?"

"যেখানেই হোক। এখানে আর থাকতে চাননা, কেন?"

"কি জানি!" শিশিরের মুখে অসহায়ের ভঙ্গী এলো।

"অদ্ভুত ত মনে হচ্ছে আমারও! মাসীমা এ-মাটি ছেড়ে চলে যেতে চান, শুনলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না।"

"বাসার মায়া আর নেই মার—" খানিকটা সতেজ শোনাল শিশিরের গলা: "কারু জন্যেই আর তেমন মায়া নেই!"

"তাই কি?—দূর্—"

"আমার জন্যেত মায়া নেই অন্তত!"

"কেন নেই? হাবুল-হাবুল করতেন যিনি দিনরাত, হঠাৎ তিনি এমন হয়ে গেলেন কেন?"

"আমি কি করে বলব! আপনিই বলুননা কেন!"

"আমার মুস্কিল কি জানিস—মানুষকে ঠিক আমি বুঝতে পারিনে—আলাদা-আলাদা মানুষকে। একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষকে হয়ত ঠিক বুঝতে পারি!"

"বাবার শোকটাই মা ভুলতে পারেননি—অনেক মা অবশ্য

ভুলে যান!"

"শোক ভোলার জিনিষ, তাই ভুলতে হয়। মাও মাত্র দু'বছর মুষড়ে ছিলেন, তারপর বাবার সব ব্যাপার মা নিজেই দেখতেন-শুনতেন!"

"এ-বাড়িতে বাবার ত কোনো ব্যাপার ছিলনা—যা ছিল সবটুকুই মার!"

যতীন চুপ করে গিয়ে বেয়াড়া দুটো গোঁফের চুল ঠোঁট দিয়ে চাপতে লাগল।

"আমাদের কাছে যদি মা কিছু চাইতেন তাহলেও বা বুঝতাম! —আমাকে যে কি হতে হবে—কি হওয়া যে উচিত ছিল আমার, তাই আমি জানিনে, যতীনদা!"

"মার কাছে ছেলের আবার একটা-কিছু হতে হয় না কি!"

"ছেলে কিছু-একটা হোক—তা চাননা মা'রা?"

"কেউ-কেউ চান!"

"মা তা চাননি—আমার কি করবার আছে বলুন!"

"তুই কি বলতে চাস্ মাসীমার ভেঙে পড়াটা স্বাভাবিক?"

"তাছাড়া আর কি!"

"হুঁ!" আবার নিঝুম হয়ে গেল যতীন।

"তবে—" শিশির স্মৃতির ঘর হাতড়ে বেড়াতে লাগল: "টাকা-পয়সার অভাব একটা কথা হতে পারে! তা-ও বা আমি কি করতে পারি বলুন—আমার ইচ্ছায় ত আর রোজগার হবেনা!"

"টাকা-পয়সা?" একটা জরুরী কথা শুনতে পেয়ে হঠাৎ যেন সতর্কতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল যতীনের চোখ: "টাকা-পয়সা একটা বড় কথা! আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা টাকা!"

"এখানে আর ভালো লাগছেনা মার—তাই চলে যেতে চান। ভালো কি আর আমারও লাগছে যতীনদা—কিন্তু আমি পালাব কোথায় ?"

"সংসার-গেরস্তি খুবই ঝঞ্ঝাটের কাজ—" যতীন অল্প-অল্প হাসতে সুরু করল।

"টাকা-পয়সার অভাব থাকলে খুবই!"

"তা-ই। আর ভেঙেও যাচ্ছে তাই সংসারগেরস্তি। মানুষের মনই ভেঙে যেতে সুরু করেছে।"

"তবু কেউ-কেউ পারে। সতু-ত বেশ পারছে—রেহাই দিয়েছে আপনাকে!"

"ওরা সেকেলে মানুষ—" যতীন তার স্বাভাবিকতায় হেসে উঠল।

"কিন্তু সেকেলে হওয়াটা মন্দ কি যতীনদা ?"

"পুরোপুরি কেউ আর আজ সেকেলে হতে পারেনা বলেই মন্দ—সেকেলে হতে যাওয়ার বিপদ ত ওখানেই। নইলে সেকেলে হতে পারলে মন্দ নয়!" বসার ভঙ্গীটাকে নেড়ে-চেড়ে দিতে লাগল যতীন: "ওঁরা ভালো ছিলেন, একথা ত আর মিথ্যে নয়। দুঃখ থাকলেও সুখের অভাব ছিলনা। আর একটা বড় জিনিষ ছিল অতৃপ্তি—ওটাই ওদের ক্রিয়েটিভ ফোর্স! একটা অতৃপ্তি আজও মানুষের আছে কিন্তু তা দিয়ে বাড়ি-ঘর-দুয়ার, রাস্তাঘাট, সহর-বন্দর তৈরী হবেনা—ওটা বন্ধ্যা। ওটা থাকার চেয়ে আমাদের সতুচন্দ্রের মতো তৃপ্তি থাকাও অনেক ভালো!"

সামনে ঝুলান একটা কাল্পনিক আয়নায় যেন নিজের একটা কুৎসিত চেহারা দেখতে পেল শিশির। কিন্তু কি করবে, কুৎসিত হয়ে গেছে সে—তাতে তার হাত ছিলনা। চেষ্টা করলেই যে কিছু

করা যায়, কিছু হওয়া যায় একথা কে বললে যতীনদাকে!

"গাঁয়ের বাড়িতে তোদের এখন কে থাকেন, হাবুল ?"

"কেউনা। পোড়োবাড়িরই সামিল। কেন ?"

"ভাবছিলাম ওখানে গেলে মাসীমা ভালো থাকবেন কি না!"

"পাগল! বাড়ি যখন জমজমাট তখনও মা যেতে চাননি।"

"তা জানি। তবু ভাবছিলাম। অবশ্যি আমাদের ওখানে খারাপ থাকবেন না—সতুর বউ — চমৎকার মেয়ে!"

গেরস্তঘরের বউ—তা জানে শিশির। খেটে জীবনপাত করতে হয়, টুঁ শব্দটি করতে হয়না—মেয়েটি তা-ই জানে। কিন্তু যতীনদারও যে ভালো লাগছে মেয়েটিকে—আশ্চর্য্য! আসল কথা, যতীনদার হয়ত মর্জ্জিরই ঠিক নেই।

"বিয়ের পর সতুর বৌকে তুই দেখিসনি, হাবুল ?"

"না।"

"গেঁয়ো মেয়ে বলে নয়—ওর রকমটাই ভালো। গেঁয়ো মেয়ে হলেই যে ভালো হবে তার কোনো মানে নেই!"

যতীনদা হেঁয়ালি।

"মা-ও মানতে বাধ্য হয়েছিলেন, নাঃ, পারুল ভালো মেয়ে!"

পারুলের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে হচ্ছিল শিশিরকে—কথা বলছিলনা কিন্তু চোখে-মুখে উৎসাহ ফুটিয়ে তুলতে হচ্ছিল। নিরুৎসাহিত হওয়ার উপায় নেই। পারুলের আড়ালে ভিন্ন মুখে ভিন্ন চেহারায় মুকুলই হয়ত চলাফেরা করছে যতীনদার মনে।

"মেয়েরা সবাই ভালো। পুরুষের দুর্ব্বলতায় ওরা খারাপ হয়ে যায়।"

"কথাটা কি ভালো শোনাল, যতীনদা ?" শিশিরের কথা ফুটল:

"মেয়েদের তাহলে মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই!"

"তা হয়ত আছে—মাসীমাই ত! মেশোমশাই-এর দুর্ব্বলতা ওঁকে ছুঁয়ে যেতে পারেনি কোনোদিন!"—ঘাড়ের চুল চুলকোতে সুরু করল যতীন, তারপর হাসতে লাগল: "বলেছি ত—আলাদা-আলাদা মানুষকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনে!"

"সত্যি কথা—বাবা মনে-মনে ভীষণ দুর্ব্বল ছিলেন। তারজন্যেই আমি চেয়েছিলাম শক্ত হতে!"

"হতে পারিসনি বুঝি?" যতীন সজোরে হেসে উঠল।

"রক্তেই কোথায় যেন দুর্ব্বলতার বীজ রয়ে গেছে যতীনদা—বাবার মতো হুবহু নই—কিন্তু বাবার খানিকটা উঁকি দিচ্ছে বুঝতে পারি!"

"একটু সেকাল একটু একাল—ভাঙাচোরা—মিশতে পারেনি! মুস্কিল ওখানেই!"

জ্যোতিষীর মতো শোনাল যতীনের কথাগুলো। ছম্‌ছম্ করে উঠল শিশিরের ভেতরটা।

"নতুন কি ছবি হবে বোঝা যাচ্ছেনা, হাবুল—কিন্তু ভালো কতগুলো ছবি মুছে গেছে!"

যতীনদা কি অভিশাপ উচ্চারণ করছেন?

"খারাপ অনেক ছবির সঙ্গে থেকে ভালো ছবিগুলোও মুছে গেল—দুঃখ এই!"

ল্যাম্পের আলোটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল শিশির—চোখে খানিকটা আলো আর তাপ লাগুক।

"মনে হয় ছেলেবেলায় অনেক ভালো ছিলাম—চারদিকটা ভালো ছিল বলেই ভালো ছিলাম! দিদিমাকে মনে পড়লে মনে

হয় দু'টি নরম হাত আমার মাথায় আর পিঠে বুলিয়ে দিচ্ছেন যেন কে—সরযূমাসীকে মনে পড়লে খানিকটা হাসি শুনতে পাই! আমার এক পিসিমা ছিলেন, কখনও যদি গেছি তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে, আমায় মাথায় তুলে রাখবেন না কি করবেন ভেবে পেতেন না—তাঁর খুসীর ছবিটা চোখে এলে চোখ জুড়িয়ে যায় এখনও—" যতীন ঘুমপাড়ানি গল্পের মতো বলে যেতে সুরু করল: "জানিনে এখনকার ছেলেপিলেরা এধরণের ছবি দেখতে পায় কি না তবে মনে হয় সে-ছবি নেই!"

চোখে সত্যি তাপ লাগছে শিশিরের—পাতাগুলো চোখের উপর নামিয়ে দিল সে। বাবা কি করে উঠে এলেন চোখের উপর? সেই ছোট-ছোট হাসি মুখে নিয়ে স্পষ্ট তাকিয়ে আছেন তার চোখের দিকে! কোত্থেকে তাকিয়ে আছেন? ঘাড় নেড়ে দুপাশে তাকাল শিশির।

"একটা জমজমাট হাট ছিল—ওটা ভেঙে নির্জ্জন পথ হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে কেউ হেঁটে যায় সে-পথে—একা-একা হেঁটে যায়! এইত এখনকার ছবি। তাই আমি লোকারণ্য খুঁজি—কোথায় মানুষ জমেছে—সেখানে ভিড়ে যাই—অনেক রকম মানুষের ভীড়ে মানুষের পুরোনো জিনিষগুলো কিছুকিছু পাওয়া যেতে পারে!"

শিশির শুনতে পাচ্ছিলনা কিছু। ছবি দেখছিল ষষ্ঠীব্রত মার—বাবা দাঁড়িয়ে আছেন—মা হাবুলকে নতুন কাপড় পরিয়ে দিচ্ছেন—সেই হাবুলের প্রথম কাপড় পরা। মখমল-পাড়, তুলতুলে নরম কাপড়। মা বলছিলেন: "কাগজের মতো শক্ত কাপড়ে ওর গা ছড়ে যেতোনা? ফরাসডাঙা হলেই কি হ'ল!" মাথা নেড়ে হাসছিলেন বাবা। ঠিক এরকম হাসি, এখন যেমন হাসছেন—সবসময়ই যেমন

হাসতেন। হাসিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শিশির—কথাও কি শুনতে পাচ্ছে কিছু?

"হাবুল—"

ঠিক এরকম নয়—আরেক রকম। ওটা যতীনদার গলা—অন্যরকম ছিল বাবার ডাক। মিষ্টি? না, নরম। কেউ আর ও-রকম করে ডাকতে পারবেনা—কেউ আর ডাকবেনা তাকে ওরকম করে। হারিয়ে গেছে সে-ডাক! হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে!

"তা হলে আমার কাছে গিয়েই থাক্ মাসীমা ক'দিন—কি বলিস হাবুল?"

শিশির মুখ তুলে তাকাল। যতীন অবাক, হাবুল কাঁদছে!

চার

১

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গাড়ি—কোর্টে যেতে পারত শিশির, কিন্তু কিছুতেই যেন মন রাজি হলনা যেতে। মনে হচ্ছিল কোথায় যেন কি একটা বিরাট ব্যাপার ধ্বসে পড়বে—শূন্য হয়ে যাবে অনেকটা জায়গা, আর তার জন্যে যেন তার প্রস্তুত হওয়া দরকার! তিল-তিল করে প্রস্তুত হতে হবে। সমস্ত দিন চলে যাবে প্রস্তুত হতে—কোর্ট থেকে ফিরে এসে মার যাবার জন্যে হঠাৎ সে নিজেকে তৈরী করে তুলতে পারবেনা। মুকুল গম্ভীর হয়ে আছে—রাত্রিতে ওর উপর এমন মেজাজ করে না উঠ্‌লেও পারত শিশির। বোকা মেয়েরা কতো কথাইত বলে—জেনেশুনেও সে মেজাজ ঠিক রাখতে পারলনা। আসল কথা, বোকামি জিনিষটা বাড়তে বাড়তে মনে খিঁচ ধরিয়ে দেয়। পাথরকেও তাতিতে তুলতে পারে! "মা যেতে চান, যাক না ভাশুরঠাকুরদের বাড়ি—" উপরে পড়ে এ-কথা বলবার কি দরকার ছিল মুকুলের! মা চলে গেলে মুকুল যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে তা কি শিশির জানেনা? তার কানের ভেতর হর্‌হর্‌ করে কথাটা ঢেলে দিতে হয়? বিরক্ত হয়ে বলেছিল শিশির: "যেতে চাইলেই যেতে দিতে হবে না কি?" "ধরে রাখতে যাবে কেন তুমি?"—মুকুলের নির্লজ্জ বোকামি সুরু হল। শিশির কি করবে না করবে তার পরামর্শ কি মুকুলের কাছ থেকে নিতে হবে? মুকুলের ইচ্ছার

প্রতিবাদ করেনা সে ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যে, তার অর্থ এই নয় যে মুকুলের যুক্তি আর বুদ্ধিকে মেনে নিয়ে চলেছে শিশির। অথচ মুকুল মনে করে তার অকাট্য ইচ্ছার গা ছুঁয়ে যাবার মতো সাংসারিক বিবেচনা শিশিরের একবিন্দুও নেই। মানুষকে নির্বিকার দেখলে বোকারা দুর্ব্বল ভেবে নেয়! সবার সঙ্গে মিলেমিশে তুমি যদি বোকামি না করতে চাও, জনতার মর্জ্জির পাঁকে যদি ডুবে থাকতে না চাও তাহলেই তুমি দুর্ব্বল। বাবাকে দুর্ব্বল মনে করত সবাই, মা-ত মনে করতেনই কিন্তু সত্যি বলতে হয়ত বাবা দুর্ব্বল ছিলেননা—মনকে উপরে তুলে নেবার একটা মস্ত শক্তি ছিল তাঁর! বাবার সেই ছোট-ছোট হাসির রেখাতে তা-ই আঁকা ছিল। বাবার এই গুণটুকুই শিশিরের মনে তৈরী হয়ে উঠেছে। মুকুলকে সে সহ্য করে, মুকুল মনে করে সে হার মেনেছে!

আশ্চর্য্য—মা আজ চলে যাবেন কিন্তু বারবার তার বাবার কথাই মনে পড়ছে! বাবার যেন জেদও ছিল—মনে পড়ে শিশিরের। শিশিরও হয়ত তাই জেদী হয়ে উঠেছিল ছেলেবেলায়। ব্রাহ্মণের জেদ! কিন্তু কোথায় গেল তার সে জেদ! হার মেনে-মেনে ভোঁতা হয়ে গেল ধার! মার কাছেই শুনেছিল শিশির, তাঁর এক পিসেমশাই-এর কথা—জেদী, মেজাজী আর সত্যনিষ্ঠ! পিসিমা কি-একটা মিছে কথা বলেছিলেন একবার, সে-অপরাধে পিসিমার হাতের ছোঁওয়া কোনো জিনিষ স্পর্শ করলেননা আর জীবনে। নিজ হাতে রেঁধে খেতেন বরাবর। লোকটাকে যেন শিশির চোখের উপর দেখতে পায়—আগুণের শিখার মতো ঋজু হয়ে জলছে। পাথরের মতো একটা চরিত্র! সে-জেদ ভেঙে

গেছে মানুষের—টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে ভেঙে গেছে। অনেক উত্তাপে তবে টুক্‌রোগুলো জোড়া লাগে। গর্জ্জন ফোটাবার জন্যে অনেক মেঘ জমতে হয়। ছোটবেলায় একদিন শুধু বাবাকে দেখেছে শিশির, মার উপর রাগ করে সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন—সারাদিন বাসায় ফেরেননি, রাত্রিতেও ফিরে এসেছিলেন কি না ঠিক মনে পড়ছেনা তার। শিশিরের ছিল পরীক্ষার ফল ভালো করবার জেদ। কিন্তু জেদ সত্ত্বেও কিছুই হলনা। দেহের কোষ আর তন্তুগুলোই হয়ত আজকাল আরেকরকম হয়ে গেছে মানুষের—জেদের টান খুব বেশি সয়না। কাল রাত্রিতে বিছানার পাশে মুকুলের শরীরটাকে কি দূষিত মনে হয়নি শিশিরের? কিন্তু সে মনে হওয়া কাল রাত্রিরই জন্যে, আজ আর তেমন নয়। ঘন হয়ে মেঘ জমতে পারেনা। উড়ে যায়!

একটা চরিত্রই নয় সে। কেউ বলতে পারবেনা সে কি! সে নিজেও বলতে পারবেনা বলবার মতো তার ভেতর কি আছে। বাইরের চোখে সে এম্‌-এ, বি-এল্‌। মুকুলের কাছে সংসার-অনভিজ্ঞ, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির কাছে আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী, নিজের কাছে ভাগ্য-নির্ভর! কিন্তু সত্যি কি সে এই? এসবগুলোর যোগফলে কি তাকে পাওয়া যাবে? সে যোগফলে যদি মার, মিতুর আর যতীনদার ধারণাও যোগ দেওয়া যায় তবু কি এমন কোনো মূর্ত্তি তৈরী হবে যার নাম দেওয়া যায় শিশির চৌধুরী? কখ্‌খনো না। অনেকের ধারণার ধরণে শিশির চৌধুরী ধরা পড়বার নয়—কেউ-কেউ হয়ত পড়ে—কেউ-কেউ হয়ত পড়ত—কিন্তু সে ধরা পড়েনা। শিশির চৌধুরী একটা সরল রেখা, দুর্ব্বোধ্য জ্যামিতিক চিহ্ন, তাতে চোখে দেখবার মতো কোনো স্থান নেই।

বারবাড়ির ঘরে বাবাকে একা পেয়ে রুমু দৌড়ে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

"কিরে?" রুমুর মুখের দিকে তাকাতে চাইলনা শিশির — ওর মুখের ছবি তার জানা আছে।

"মার সঙ্গে আমি যাবনা?"

"মা কি বললেন?"

"মাথায় হাত বুলিয়ে দেন শুধু — কিচ্ছু বলেন না!"

"মা তাঁর দিদির বাড়ি যাচ্ছেন, সেখানে কি তুমি যেতে পারো?"

"আমি যাব।"

"যাবে?" কেমন যেন মীইয়ে এলো শিশিরের গলা।

"তুমি বলে দাও মাকে!"

কি বলবে শিশির? মার কাছে আবার কি একটি আবেদন নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে সে — বল্‌বে কি, রুমুকে সঙ্গে নিয়ে যাও? একবার ত সে বলেছে, — কেন যাচ্ছ তুমি, মা? মা জবাব দেননি। হয়ত শিশিরকে নিয়ে তিনি খুসী নন, তাই যাচ্ছেন। হতে পারে যে মুকুলকে আর সহ্য করতে পারছেন না। হয়ত চারদিকটাই তাঁর সহ্য হচ্ছেনা — তাই ছট্‌ফট্ করে বেরিয়ে পড়তে চান। জবাব আর দেবেন কি তিনি! নিজেও হয়ত জানেননা কেন তিনি চলে যেতে চান। আজ যদি শিশির সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নীলাম্বরবাবু-ওঁরা হয়ত ভাববেন ধর্ম্মপ্রাণতাই তাকে টেনে নিয়ে গেল, মুকুল মনে করবে অভাবের তাড়না, আর সে নিজে? নিজে সে কোনো সোজা কারণই খুঁজে পাবেনা। একটা অস্বচ্ছ, অপরিচ্ছন্ন কারণ আছে — ভালো লাগেনা। কেন ভালো লাগেনা — কি তার অভাব আর কি পেলে

যে ভালো লাগবে কিছুতেই তা আবিষ্কার করতে পারবেনা শিশির।

"বাবা, তুমি বলে দাওনা মাকে—" রুমু নিজেকে জাহির করল আবার।

শিশিরকে উঠ্‌তে হল। হাসতেও হ'ল একটু। রুমু খুসী হয়েছে। কিন্তু তার জন্যেই কি সে হাসল? নাকি নিজের দুর্ব্বোধ্যতায় মন বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌ল বলেই হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের পাশে?

রুমুকে নিয়ে মার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শিশির। কিছুই গোছানো হয়নি—ট্রাঙ্ক-বিছানা কিছুই না। কাপড়ের ছোট একটি পুটুলি খাটের উপর পড়ে আছে—তা-ই সব। ফিরে আসবেন বলেই হয়ত যাচ্ছেন মা। খানিকটা জোরের জোয়ার এলো শিশিরের মনে—খুসীর ধাক্কায় হাল্কা হয়ে গেল গলার ভেতরটা।

"রুমু তোমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছে মা—"

পাশের দরজায় দাঁড়িয়ে বিরজা বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, মুখ ফেরালনা, জিজ্ঞেস করল: "যতীন আসেনি?"

"আসবেন এক্ষুণি! কোন্ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।"

"গাড়ীর সময় হয়নি?"

'একঘণ্টা সময় আছে। রুমুকে বলে দাও, ও তৈরী হয়ে নিক!"

বিরজা কথা বললেনা।

"তোমাকে ছেড়ে থাকেনি ও কোনোদিন—"

কাপড়ের আঁচলটা টেনে নিল বিরজা।

"তুমিও কি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে?"

থরথর করে কেঁপে উঠল বিরজার শরীর। মা কাঁদছেন—শিশিরের

গলা আটকে গেল। মনে হ'ল মার মতো ওভাবে কাঁদতে না পারলে গলা দিয়ে তারও আর কথা বেরোবেনা।

রুমু রয়ে গেল, শিশির চলে এলো! কাঁদবার জন্যে একটু জায়গা পাওয়া যাবে কি কোথাও? যতীনদাকে কি আর কাল রাত্রির মতো পাওয়া যাবে?

২

ঘোড়ার গাড়িতে উঠেও মা মুখ ফিরিয়ে ছিলেন—শুধু যে গাড়ির-পাশে-দাঁড়ান শিশির আর রুমুর দিকে আর বেড়ার-এধারে-দাঁড়ান মুকুল আর ঝুমুর দিকে তাকাবেন না তা যেন নয়—সমস্ত বাসাটাকেই যেন তিনি মুছে ফেলতে চাচ্ছিলেন চোখ থেকে। আঁচলে চোখ মুছছে মুকুল—একবার পেছন ফিরেই দেখতে পেয়েছিল শিশির। কি যেন বলছেন মা রুমুকে—চুপ করে আছে ও। শুধু মার হারটার জন্যে নয়। ওটা ওর গলায় ঝুলছে কিন্তু তাতে ওর মন নেই। কেন যে কঁদছেনা ও বুঝতে পারছিলনা শিশির। গাড়ি ছেড়ে দিল। আর ঠিক তক্ষুণি যেন শিশিরের মনে পড়ল, যতীনদার আবোল-তাবোল কথাবার্ত্তায় পড়ে মাকে প্রণাম করা হয়নি। গাড়ি ছেড়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রণাম করবার কথাটা বা কেন মনে পড়ল তার হঠাৎ? প্রণাম করবার দরকারও বা কি? মা কি আর ফিরে আসবেন না? এ-ই শেষ দেখা তার সঙ্গে? তাই কি সেই ভীষণ শেষপ্রণামের কথা মনে পড়ল? একদিন শ্মশানে মুখাগ্নির শেষে যে-প্রণামে বাবাকে বিদায় দিয়েছিল শিশির—কেন মনে হল তার তেমন একটা প্রণামের

কথা ? কেন মনে হল ? ভেতর থেকে অনেকগুলো স্বর যেন এক সঙ্গে চেঁচাতে সুরু করল, কেন, কেন ? আর সেই আগুনের তাপ— সেদিন শ্মশানে যেমন মনে হয়েছিল যেন সমস্ত শরীরে আগুন ধরে গেছে—ঠিক তেম্নি মনে হতে লাগল আবার। অসহায়ের মতো পেছনে ফিরে তাকাল শিশির। মুকুল চলে গেছে। মুকুল যেখানে দাঁড়িয়েছিল—সেদিন মা ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক ওখানে। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—"কোন্ প্রাণে তুই ওই সোণার শরীর ছাই করে দিয়ে এলি হাবুল—তোর কি একটু মায়া হলনা ?" হাউ-হাউ করে কেঁদে বেড়ার গায়ে মাথা ঠুকছিল শিশির, অনবরত বলে চলছিল ঃ "দিয়ে এলাম—দিয়ে এলাম—দিয়ে এলাম !"

আজও কি সে আবার তেমনি দিয়ে এলো মাকে—বিদায় দিয়ে এলো তার জীবন থেকে ? মুকুল ওখানে থাকলে জিজ্ঞেস করত শিশির। কাঁদতনা, শুধু জিজ্ঞেস করত। মুকুলের কাছে সে কাঁদতে পারেনা— কান্না আসেনা। হয়ত অন্যমনস্কের মতো বলত ঃ "মা কি আর ফিরে আসবেন না ?" ভেজা-ভেজা গলায় হয়ত উত্তর দিত মুকুল ঃ "কেন তুমি যেতে দিলে !" শিশির যেতে দিল ! হবেও বা ! অনেক দূরে সরে গেছে সে—মার কাছ থেকে অনেক দূরে। বয়েস তাকে টেনে নিয়ে এসেছে—নইলে আর ত কিছু শিশির দেখতে পায় না। কিন্তু মুকুল কি শিশিরের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারতনা--ফাঁকটুকু ভরিয়ে দিতে পারত না—ভুলিয়ে রাখতে পারতনা মাকে ? মুকুলও দূরে সরে এলো—তারই সঙ্গে সঙ্গে সরে এলো ! হয়ত এ-ও শিশিরেরই অপরাধ। শিশুর চোখ নিয়েই মেয়েরা পৃথিবীর দিকে তাকায়— চেতনা নেই, আছে শুধু বিস্ময়ের আনন্দ। পুরুষ তাদের সচেতন

করে তোলে—তৈরী করে তোলে, পৃথিবীর সঙ্গে চেনাজানা হয় তাদের পুরুষেরই মারফৎ—রূঢ়তা, সঙ্কীর্ণতা, অকৃজ্ঞতা শিখিয়ে দিয়ে তা দিয়েই আবার পুরুষেরা তাদের চরিত্রের পরিচয় দেয়। শিশির অপরাধ না করলে মুকুলের সাধ্য ছিলনা অপরাধী হয়। সাধ্য ছিলনা—তাই মুকুলকে চোখের জল ফেলতে দেখল শিশির। মেয়েদের সবটুকু স্বভাব উপড়ে ফেলতে পারে না পুরুষ—কোথায় যেন তার শিকড় থেকে যায়—কচি পাতা মেলে দিয়ে একদিন তা নিজেকে জানিয়ে দেয়।

শিশির চারদিকে তাকাল—মনে হচ্ছিল তার, চারদিককার ছবি যেন আর ঠিক আগেকার মতো দেখতে পাওয়া যাবেনা। কি যেন হারিয়ে গেছে, তন্নতন্ন করে তা খুঁজে দেখতে হবে। কি হারাল? সারবন্দী সুপুরিগাছগুলো ত ঠিক ওম্নি আছে—বনসেগুন গাছটাও তা-ই। ময়রার দোকানের নিধু ওটার পাতা নিতে আসে, দু'একটা কচি ডাল ভেঙে রেখে গেছে। মার ষোল বছর আগেকার কথা: "আমি তখন থাকবনা—তোর মেয়ের যখন বিয়ের বয়েস হবে, হাবুল, সেগুন গাছটাও বড় হবে তখন, সেগুন-কাঠে খাট তৈরী করতে পারবি—বিয়ের খাট!"—সত্যি বড় হয়ে উঠ্‌ছে গাছটা। বেড়াগুলো ভাঙা—বৈঠকখানা ঘরটা একটু কাৎ হয়ে গেছে একপাশে—খুঁটি পাল্টাতে হবে হয়ত। দালানের দেয়ালে শ্যাওলা জমছে—কার্নিসের ধারটাতে বেশ পুরু হয়েই উঠেছে সবুজ রং—আর আলসের আড়ালে ওগুলো কিসের পাতা উঁকি দিচ্ছে? বটের চারা! নারকেলগাছগুলোর জটজঞ্জাল পরিষ্কার না করলে না কি ভালো ফলন হয়না—তাছাড়া চড়ুইর উৎপাত—কোনো ব্যবস্থাই হয়নি আজ অবধি। ডোবাটায় পানা ভর্ত্তি—

বুঁজিয়ে ফেলতে ত পারলইনা শিশির—পানা পরিষ্কারও করা হচ্ছেনা! এইটুকু একটা বাড়ি সাজিয়েগুছিয়ে রাখবার ক্ষমতা নেই শিশিরের—দু'চারটি প্রাণীকেও সুস্থ সুন্দর করে তুলবার ক্ষমতা নেই—এম্নি অক্ষম, এতো দুর্ব্বল সে! অথচ নিজেকে কোনোদিন দুর্ব্বল ভাবেনা শিশির—আশ্চর্য্য! হাকিমের এজলাসে দাঁড়িয়ে অনর্গল সে বকে যেতে পারে—বড়োবড়ো থিয়োসফিষ্টের সঙ্গে নির্ভয়ে তর্কযুদ্ধ চালিয়ে যায়, নিজেকে পঙ্গু ভাববার কারণ ত তার নেই! মুকুল অবশ্যি তাকে দুর্ব্বলই ভাবে—দৈহিক সম্বন্ধের দরুন স্ত্রী-রা স্বামীদের তা-ই ভেবে নেয়—সে-ভাবার কোনো মানে দেয়নি শিশির। পরের মুখে নিজের ত্রুটীর কীর্ত্তন শুনে বিচলিত হবার মতো দুর্ব্বলতা সত্যি তার নেই। কিন্তু ত্রুটী যেদিন নিজের চোখে ধরা পড়ে সেদিন আর মন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা।

মা চলে যাবেন না কেন? তাঁর বাড়ি, তাঁর ঘর শিশিরের হাতে কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে! কোথায় কি সান্ত্বনা আছে যার? শিশির যদি বাড়ির চেহারাটা পাল্টে ফেলতে পারত তাহলে কি মা সান্ত্বনা পেতেন? যদি দোতলা ঘর করতে পারত দালানের উপর—বাইরে ফুলবাগান আর লালসুরকির রাস্তা-ঘেরা বৈঠকখানার একটি ছোটদালান—সেগুন গাছটার নীচে গ্যারেজ; সহরের পাঁচসাতখানি মোটরগাড়ির একটি গাড়ি যদি তার হত—সবাইকে নিয়ে বিকেলে যদি পাহাড় পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসতে পারত শিশির—বিশ্বস্ত, অনুগত চাকর-ঠাকুর বাড়ি-পাহারায় থাকত—তাহলে কি মা ভুলে থাকতে পারতেন নিজেকে? অনেকে ভুলে থাকেন—বড়মাসীই ত ছিলেন কিন্তু মা কি পারতেন?

পারতেন না আর তাই হয়ত শিশিরও সেদিক থেকে তৈরী হয়ে ওঠেনি। মার আসক্তির দিক থেকে তৈরী নয় শিশির—অনাসক্তির যে বীজটুকু ছিল তাঁর মনে তা নিয়েই জন্ম হয়েছে তার। নইলে এই ছুনিয়াময় অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় শিশির থিয়োসফিষ্ট হতে গেল কেন? পলিটিক্সও ত করতে পারত সে—তাদের বার-লাইব্রেরীর তিনচারজন উকীলই ত এখন জেলার নেতা। যতীনদার এক বন্ধু ত রাতদিন কাউন্সিল-এসেমব্লি নিয়েই ডুবে আছেন—ওকালতনামায় নামটুকুই আছে তাঁর আর কিছু নয়। অম্বিকাবাবু নেতার নেতা—আবার পলিটিক্সের দৌলতে পসার জমিয়ে বসেছেন। পলিটিক্সেরই মাহেন্দ্রক্ষণ এখন। কিন্তু শিশির ত গেলনা তাতে! জেলের ভয়? জেলের ভয় ছিল খানিকটা কিন্তু দলে ভিড়ে গেলে তা আর থাকতনা। আসল কথা, শিশিরের মনই যেতে চাইলনা সেদিকে—যেতে দিলনা তাকে। অম্বিকাবাবুর মতো মোটরগাড়ি, দালান-কোঠা হতে পারেনা তার—কৈলাসবাবুর মতো কল্‌কাতায় এমন বিরাট ব্যবসাও হতনা—চকমিলানবাড়ি, দোলদুর্গোৎসবের ঘটা হতনা। যা হয়নি তা কিছুতেই হতনা। ওটাকে অদৃষ্টই বলো আর যা-ই মনে কর। অবশ্যি অদৃষ্ট ছাড়া আর কি-ই বা মনে করতে পারো তুমি! ডাক্তারিশাস্ত্রের কোষতন্তু, বংশতত্ত্বের গুণাগুণ—এইত? তুমি কোন্ কোষতন্তু, গুণাগুণ নিয়ে জন্ম নেবে তা কি তুমি জানতে পারো? এখানেও কি অদৃষ্ট নেই, ভাগ্য নেই? পুরুষকার! ওকথাটা যৌবনেরই নামান্তর—যখন মনে হয় মরুভূমিতেও বুঝি জলের ঝর্ণা আছে!

হঠাৎ খেয়াল হ'ল পাশে তার রুমু নেই—কখন পালিয়েছে।

কোথায় গেল—সুরেশের মেয়েকে হারটা দেখাতে?

বাড়ির ভেতরে এলো শিশির, রুমুকে খুঁজতে নয়—আসতে হবে বলেই। বোঝা গেল মুকুল রান্নাঘরে—সিঁড়িতে বসে ঝুমু পেয়ারা চিবোচ্ছে। মার পেয়ারা গাছটা নেই—জলপাইগাছটা আছে।

শিশির রান্নাঘরে উঁকি দিল।

"আমি এ-বাড়িতে একা থাকতে পারবনা—" মুকুল গলার ভার কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি।

"মা কি চিরদিন তোমায় আগ্‌লে থাকতেন?" নিজের মনে নিজের জন্যেই শিশির সান্ত্বনা খুঁজতে চাইল।

"যখন না-থাকতেন না থাকতেন, তা বলে এভাবে চলে যাবেন!"

শিশির চুপ করে রইল।

"আমি থাকবনা, কিছুতেই থাকবনা। কেন থাকব? যাঁর বাড়ি তিনিই যখন রইলেননা, আমি কেন থাকব!"

"আমি কি করতে পারি বলো!"

"আমি কি জানতাম উনি সব দিয়ে-থুয়ে চলে যাচ্ছেন—ভেবেছি দুদিনের জন্যে যাবেন আবার চলে আসবেন!"

"আসবেন না তুমি কি করে জানো?"

"মাকে আমি জানিনে—তোমার মা বলে তুমিই সব জানো?"

তা-ই যদি কেন তুমি পারলেনা তাঁকে ধরে রাখতে—কেন ধরে রাখতে চাইলেনা! কেমন একটা বিষণ্ণতায় অবশ হয়ে

যেতে লাগল শিশির। সত্যি তুমি তাঁকে বেশি চেনো, মেয়ে বলেই মেয়েদের মন বেশি বুঝতে পারো তুমি--কিন্তু তাঁর পথ রুখে এসে দাঁড়ালে না কেন?

"এ-বাড়ির ভালো হবেনা—আমি জানি ভালো হবেনা—" মুকুলের গলা জড়িয়ে গেল—আবারও কাঁদতে সুরু করল ও।

ভালো হবেনা! ওটা কি মার অভিশাপ, না মুকুলের? কি করা উচিত ছিল শিশিরের? কি করবে সে! সবই তার হাতের মুঠোর বাইরে। কাউকে বোঝা যায়না। মুকুলকে পর্য্যন্ত বুঝতে পারছেনা সে—একটি সাধারণ আটপৌরে মেয়ে—তাকেও ধরতে পারছেনা—মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে রূপ বদলে যাচ্ছে তার—কি আর করতে পারে শিশির! সব ভেল্কি—তা-ই ঠিক! মেঘে-আঁকা ছবি, জলের উপর দাগ।

রান্নাঘর থেকে উঠোনে নেমে এলো শিশির। গাড়ির হুইশ্‌ল্‌ শোনা যাচ্ছে—মা গাড়ির কামরায় বসেও হয়ত মুখ ফিরিয়ে আছেন—ষ্টেশনের লোকজনের দিকে তাকাচ্ছেন না, তাকিয়ে আছেন ওধারের ধানক্ষেতের দিকে—। ষ্টেশনে গিয়ে যদি শিশির বলত, মা ফিরে চলো—তাহলে কি সব আবার আগেকার মতো হয়ে যেতো? শুধু এই বলাটুকুর উপরই কি সব কিছু নির্ভর করছিল? তা নয়। কার্য্যের কারণ বলে হয়ত কিছু নেই—কার্য্য একটা ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি আর তা থেকে মন যে ধারণা তৈরী করে তোলে তারই নাম কারণ। বললেই মা আসতেন না। তবু শিশিরের মনে হচ্ছে—আসতেন—ওটা শুধু মনে হওয়া।

"রেলগাড়িতে আমি যাবনা, বাবা?" বাবাকে আসতে দেখে

আপনমনেই জিজ্ঞেস করল ঝুমু।

শিশির অন্যমনস্ক উত্তর দিল: "কোথায়?"

"ওই ওখানে—" ঝুমু মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে থুতনিটা উপরের দিকে তুলে ধরল।

পা ভেঙে পড়তে চাইল শিশিরের—মনে হল তাড়াতাড়ি মার ঘরে উঠে যাওয়া দরকার।

সামনের দিকে দরজা খোলা আর তিনদিককার দরজা জানলা বন্ধ। তারই জন্যে এতো অন্ধকার। বাইরে এখনো ধোঁয়াটে একটা আলো আছে, ঠিক সন্ধ্যা হয়নি। কিন্তু আলোতে আর দাঁড়াতে পারছিলনা শিশির—ঘরের সন্ধ্যাটা বেশ লাগছে।

ঘরের চেহারা একই রকম—শুধু বিছানার উপর রামায়ণটা নেই। আর? শিশির চারদিকে তাকাল। বাবার ছবিটা! নেই। তিতুর ছবিটা রয়ে গেছে—বাবার ওটা নিয়ে গেছেন। মানুষকে একদিন পিতৃমাতৃহীন হতেই হয়! কিন্তু তা-ও ত সাময়িক! মরে গেছেন বলেই কি আর সত্যি হারিয়ে ফেলেছি বাবাকে— জীবনকে কেউ হারাতে পারে? মৃত্যুর মূর্চ্ছায় শুধু রূপ বদলায় জীবনের, নষ্ট হয়না জীবন। কিন্তু মা ভাবছেন হারিয়ে ফেলেছেন বাবাকে! হাতের কাছে যা পেয়েছিলেন মা, ভেবেছেন তা-ই তাঁর পাওয়া—পাওয়ার ধারণা তাঁর এর বেশি আর পৌছুতে পারেনি! আর সবই ছেড়ে দিতে পারলেন, শুধু ছেড়ে দিতে পারলেন না বাবাকে! 'নারী, স্বামীর উপর তোমার বাসনা অক্ষয়—' বাইবেলের কথাগুলো শিশিরের চোখের উপর ভেসে ওঠে। 'প্রজায়স্ব প্রজয়া পুত্রকাম'—স্ত্রীর এই স্বামী-সম্বোধন মনের উপর উঠে আসে। সন্তানের মধ্যে তুমি জন্ম নাও—তুমি—তোমাকেই চাই আবার, সন্তানকে

চাই তোমাকেই পাব বলে! অদ্ভুত, সেই বেদ আর বাইবেলের যুগ থেকে একই রকম ইচ্ছা, একই মন রয়ে গেছে মেয়েদের—জৈব ধর্ম্মের একই গাঢ়তা!

তিতুর ছবিটার দিকেই এগিয়ে গেল শিশির। বাইরে হয়ত আলো নিভে আসছে, ঘরের অন্ধকার তাই আরেকটু গাঢ়। ছবিটার রেখাগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে—কিন্তু তবু ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শিশির তিতুকে। সেই ঘাড়-হেলান তিতু, পাতলা ঠোঁট, চকচকে চোখ! কার মতো ছিল ও দেখতে—বাবার মতো? পিতৃগঠন—দুর্ভাগ্য, মা বলতেন। সন্তানের মধ্যে তুমি জন্ম নাও! কিন্তু তা কি হয়? অবিকল তা হয়না। একটি জীবন আরেকটি জীবনকেই চায়—আরেকটি জীবনের সবটুকু সত্তাকেই চায়—তার অনুভূতি চায়না, ছায়াকে তেমন করে চাইতে পারে না। ছায়াবাজি নিয়ে মন ভুলে থাকতে পারে কিন্তু দেহ থেকে যে বাসনার চীৎকার ওঠে সত্তাকে না পেলে তার চলে না। মার ক্ষুধা সন্তানে মিটাতে পারে, নারীর ক্ষুধা সন্তানে মেটেনা।

আমার কাছে মা তিতুকে রেখে গেলেন—আমাদেরই দিয়ে গেলেন বাড়িঘর, যা তাঁর দেবার ছিল—নিয়ে গেলেন যা তাঁর নেবার! মার কাছে তিতু যতটুকু নয় তার কাছে কি সে ততটুকু? শিশির বলতে পারবেনা মার কাছে কি বড় ছিল, তিতুর মৃত্যু না বাবার মৃত্যু! কিন্তু শিশিরের কাছে তিতুর মৃত্যুই বড়। এ যেন নিজেরই খানিকটা মৃত্যু! ভাবতে গেলে ঠিক বুঝতে পারে শিশির তিতুর মৃত্যুর পর থেকেই মাটি থেকে যেন তার শিকড় উঠে গেছে। খানিকটা রক্ত আর সেইসঙ্গে খানিকটা প্রাণ যেন নষ্ট হয়ে গেছে তার! অথচ সে ত জানে, মৃত্যুটা এমন বেশি কিছু নয়। জীবন আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়

মাত্র! তিতু আছে—আরেক পরিবেশে তিতুর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে তার—সবই ত জানে শিশির! তবু কেন সে সাময়িকতার হাত এড়াতে পারছেনা! এখনকার আকাঙ্ক্ষাটা-ই এতো বড় হয়ে উঠ্‌ছে কেন তার জীবনে!

"তিতু—" চুপিচুপি ডাকল শিশির তিতুকে।

"কেন তুই চলে গেলি, আমায় ত সেকথা বল্‌লিনে একটিবার—" ভারি গলায় মন্ত্রের মতো শোনাল কথাগুলো।

"আমাদের দেখে তোর কষ্ট হয়না রে—" অন্ধকারে শিশিরের চোখ কাকে যেন হাতড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল।

"তিতু—" ভেঙে পড়ল শিশিরের গলা।

"আত্মহত্যা করেছে—আত্মহত্যা করেছে—আত্মহত্যা—" কে যেন, কারা যেন নিঃশব্দে হো-হো করে উঠল চারদিক থেকে।

"আত্মহত্যা করেছে—তিতু?" জলে ঝাপসা হয়ে উঠল শিশিরের চোখ।

"করেছি। সবাই ত আত্মহত্যা করে!" শিশিরের চোখের উপর কে যেন চোখ লাগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—শিশির দেখতে পাচ্ছেনা কে— শুনতে পাচ্ছে তিতুর গলা।

"আত্মহত্যা করেছে?" কথাটা মনের উপর ভেসে উঠে আবার তক্ষুণি ডুবে যেতে লাগ্‌ল। কেমন যেন ভয়-ভয় করে উঠল শিশিরের। কিসের ভয় সে বুঝতে পারছেনা। তিতুকে ভয়? তিতুর আত্মহত্যাকে ভয়? সত্যি কি তিতু আত্মহত্যা করেছিল? না-ত। সুধীন বলেনি তাকে সে-কথা। কে বলল তবে, তিতু আত্মহত্যা করেছে? কে?

ঘর থেকে চুপি-চুপি বেরিয়ে এলো শিশির।

ল্যাম্প হাতে মুকুলকে উঠোনে দেখা গেল, বললে ও: "রুমুর কাণ্ডটা খ্যাখো—তখন থেকে বালিশে মুখ গুঁজে কেমন ধুম কান্না কেঁদে চলেছে!"

উনিশ শ' আটচল্লিশ

এক

ট্রেন ছাড়ল। প্ল্যাটফর্মের গুমোট আর থিঁতিয়ে-আসা হৈ-চৈ ছেড়ে এখন আরেকরকম আবহাওয়ায় মুক্তি পাওয়া যাবে। অনেকখানি আলো-হাওয়া আর আকাশ। ষ্টেশনের পরিশিষ্টটুকু পার হলে ত আর কথাই নেই—সত্যিকারের বাংলা দেশ তখন। শেড, গুদোম, সিগ্‌ন্যালঘর, ছুট্‌কোছাট্‌কা মালগাড়ি আর এঞ্জিন এখনো চোখের উপর শিয়ালদ'কেই ধরে রাখছে—কলকাতা চেপে আছে মনের উপর। আর আঁকাবাঁকা অজস্র লাইনের ছক পার হতে গিয়ে চাকাগুলোর কী ভীষণ আর্ত্তনাদ! প্লেনের কথা বলেছিল শম্পা—মন্দ হতনা—অন্তত এধরণের শব্দের যন্ত্রণা ত থাকতনা। এখন মনে হচ্ছে দু'লাইন বরাবরও যখন গাড়িটা চলতে থাকবে তখনকার সেই পরিচিত শব্দটাও যেন অস্বস্তিকরই মনে হবে মিহিরের কাছে। কলকাতার মতোই অস্বস্তিকর, অস্বস্তিকর তার পুরোনো জীবনের মতো। ঢের ভালো ছিল প্লেন—দেড়ঘণ্টায় চাটগাঁ—তাছাড়া একটা নূতন অনুভূতি! নূতনের জন্যে তার যে কি ভীষণ মোহ শম্পা তা ভালো করেই বুঝে নিয়েছে! কিন্তু সত্যি কি তা-ই? নূতনের মোহটাই কি তার

মনের সবটুকু—সেখানে পুরোনোর বাসা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? তাহলে শেষটায় মিহির এই আঠারো ঘণ্টার ট্রেন-ষ্টীমারের পথটাই কেন বেছে নিল! আর তাছাড়া শম্পাকে নিয়ে সে তাদের পুরোনো সহরের পুরোনো বাসাতেই বা চলেছে কেন? কি আছে সেখানে, কে আছে? একটা ভাঙা মন্দিরে জরাগ্রস্ত পুরোহিতের মতো এক দাদা! মিহিরের প্রস্তাবে ত শম্পা অবাকই হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দিল্লি থেকে মন ফিরিয়ে নিয়ে পাকিস্থানের কথা কেন বলছেন মিতুদা! "দিল্লিতে গেলেও রোজ ফিরোজশা' কোট্‌লা-তেই বেড়াতে যেতাম—সেই তুঘলকী ধ্বংসস্তূপে—একই কথা!"—শম্পাকে বুঝিয়েছিল মিহির আর নিজেও সে বুঝতে পেরেছিল অতীত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ কথা নয়। অতীতের সঙ্গে মন তার প্রেমে পড়ে গেছে বলেই সে শক্ত হাতে মনকে ধরে এনে নূতনের কাছে ভিড়িয়ে দিতে চায়। নূতনের মোহ-টোহ সবই বাজে কথা।

পুরু গদীর উপর হোল্ড-অল্‌টা খুলে, বলতে গেলে, রীতিমত শয্যারচনাই করছিল শম্পা। স্বাভাবিকের চাইতেও আজ একটু বেশি গম্ভীর ও। মনে হয় ঘুম-পাওয়া। সত্যি একটা ঘুমের পর্দা সবসময়ই যেন ওকে জড়িয়ে আছে—যখন মুখে সেই সুন্দর হাসি, যখন খুসীতে আলো-আলো হয়ে ওঠে মুখের চারধার, তখনও মনে হয় ঘুমের পাতলা পর্দাটা উড়ে যায়নি। আর কথা—যেন স্বপ্ন থেকে কথা কয়ে উঠ্‌ছে ও, অস্পষ্ট, নরম কথা, স্বরে ঠাণ্ডা ছায়া মেশানো। সব মেয়েই হয়ত এমন—ঘুম-পাওয়া, তবে শম্পার বেলায় ঘুমটা একটু বেশি। রোদে ঝক্‌ঝক করত সুপর্ণা—তবু রোদের আড়ালে তারও কোথায় যেন খানিকটা

ছায়া ছিল—ঘুম ছিল খানিকটা। মিহিরেরই দোষ, ওইটুকু ঘুমে তার চলবেনা মনে হয়েছে। আলোতে, হয়ত আগুনেই পুড়ে যাচ্ছিল তার সমস্ত জীবন, ওটুকু ঘুমের ছায়াতে চলতনা তার। মগজগুলো শিখার মতো দপদপ করে জলত মিহিরের—স্থপর্ণারও তা-ই। ওরা দুজন আগুনের কুণ্ডই তৈরী করতে পরত—তা থেকে ছুটে বেরুত হয়ত নীহারিকা, কারুকার্য্যময় পৃথিবী নয়।

"ভেবোনা আমি ঘুমোবার আয়োজন করছি—" বিছানা পাতা শেষ করে এনেছে শম্পা।

"ঘুম পেলে ঘুমোও না—" মিহির খবরের কাগজটা কোলের উপর তুলে নিলো।

"ঘুম পাবে কেন আমার ?"

"রাত্তিরে যদি না ঘুমিয়ে থাকো !"

"সকালবেলা কোথাও যেতে হলে রাত্তিরে কেউ ঘুমোয়না—" মিহিরের মুখোমুখি হয়ে বসল শম্পা।

মিহির আদরের মতোই কিছু একটা ফুটিয়ে তুলতে চাইল হাসিতে : "তারপর বাড়ির কেউ যদি কিছু বলে তাহলে ত আরো না !"

"কে কি বলবে আবার !"

"আমার সঙ্গে বিদেশে চলেছ—বাড়ির কেউ কিছু বলবে না ?"

"না।"

"না-বলাটাও ডেঞ্জারাস্।"

"বলাটাও।" শম্পার ঠোঁটে বিন্দু-বিন্দু হাসির ঢেউ খেলে গেল।

"জেদী মেয়েকে নিয়ে কি আর করবেন ওঁরা ?"

শম্পা মুখ তুলে তাকাল মিহিরের দিকে, এতোক্ষণ যে তাকিয়েছিল তা যেন ঠিক তাকানো নয়। চোখের সবটুকু অন্যমনস্কতা ঢেলে

দিতে লাগল ও মিহিরের চোখের উপর। ওর এ ক্লান্ত চোখকে ভয় পায় মিহির। মনে হয়, হয়ত এক্ষুণি জলে ভরে উঠবে!

"অবশ্যি—" নিজেকে শুধরে নিতে চাইল মিহির: "জেদ ছাড়া আর কিছুতেই বিরোধিতা ভেঙে পড়ে না!"

"কেন বারবার ও-কথাটা বলছ? আমার এতো খারাপ লাগে ও-কথাটা শুনতে!"

"একটা কথার ওপর রাগ থাকা ত ভালো নয়—তাই বারবার ওটা বল্‌তে হয়!" ভয় কেটে গিয়ে অসহায়ের মতো হয়ে পড়ে মিহির।

"না, তুমি ওটা বলতে পারবে না!"

মিহির অসহায়ের মতোই হাসতে থাকে।

"সাত বছর ধরে শুনছি বাড়িতে—আরো শুনবার ইচ্ছে থাকে তারপর কারো?"

মিহির অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সাত বছর? হাঁ, সাতবছরই হল শম্পার সঙ্গে তার পরিচয়। '৪২-এ সুপ্রিয় জেলে গেল—তার আগের বছর। দুচারদিন মাত্র তার দেখাশোনা হয়েছিল তখন শম্পার সঙ্গে—আই-এস্‌-সি পরীক্ষা দিয়ে ও তখন দাদার সঙ্গে পলিটিক্স নিয়ে খোঁচাখুঁচি করত। দু-একদিন মধ্যস্থতাও করেছে মিহির, শম্পার পক্ষে রায় দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। মিহিরের দুর্ব্বলতা কি সুপ্রিয় বুঝতে পেরেছিল? না। সুপ্রিয় শুধু জানত, সব মেয়ের উপরই তার একটা সহানুভূতি আছে—তার বেশি জানবার আগ্রহও ছিলনা তার। পলিটিক্সের আগুনেই মগজ বোঝাই থাকত তার সব সময়। জেলেই মারা গেল ও! ভালোই হয়েছে—যতীনদার মতো এমন নিঃস্ব, নিঃসহায় হয়ে মরবার চেয়ে তা-ই ভালো। বিষণ্ণতায় মিহিরের মুখের রেখাগুলো দুর্ব্বল হয়ে আসে—মুখটা তাই নরম দেখায়,

অনেকটা কচি।

"বাঃ--এখানে এসে বস্‌বেনা ?" শম্পাও মিহিরের এ-মুখ চেনে ঃ "আমি একা বসবার জন্যে বুঝি এটা ছড়িয়ে দিলাম !"

"ওখানে বসতে হবে ?"

"হুঁ—"

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে গেল মিহির ঃ "সমস্ত কামরাটাই ত আমাদের—ওখানে বসলেও বা কি ক্ষতি ছিল !"

"ছিল"—তুবড়ানো ঠোঁটে হাসি কুঁচকে নেয় শম্পা।

"কি ক্ষতি !"

"প্লেনের কথা বলেছিলাম বলেই কি শেষটায় আমি প্লেনে রাজি হতাম ! প্লেনে অনেক লোক থাকত—তাই রাজি হতামনা !"

"জানি, তোমার মর্জির ঠিক নেই !" মুখে একটা পরাজয়ের হাসি ফুটিয়ে তোলে মিহির।

"শুধু তোমার সঙ্গে।" শম্পা বালিশ টেনে এনে মিহিরের পিঠের নীচে গুঁজে দেয়।

মিহির হাত বাড়িয়ে দেয়। শম্পার প্রায় কোলের উপর—কোলের উপর হাতটা টেনে নেয় শম্পা—পোষা পাখীর বুকে হাত বুলোবার মতো করে মিহিরের হাতের উপর হাত বুলোয়।

সুপ্রিয় বেঁচে থাকলেও বা কি হ'ত ! জানত যে রাস্তায়-ঘাটে মানুষ না খেয়ে মরে যায়—মান-সম্মান, দেহ বিক্রি করে যুদ্ধের আয়োজন যোগায়—উলঙ্গ থাকবে বলে আত্মহত্যাও করে কেউ-কেউ—মানুষের মানুষ হয়ে থাকতে না পারার ব্যথাই ত জমত তার বুকের তলায় ! কি হত বেঁচে থাকলে ! তার চেয়ে মরে যাওয়াই ত ভালো ! বেঁচে থাক মিহিরের মতো মানুষরা, যারা অনেক সইতে পারে—নীলকণ্ঠ

হতে জানে যারা। সুপ্রিয় সইতে পারতনা এ কালো যুগ—জেলের আড়ালে জীবন শেষ করে না এলেও দাঙ্গার মড়কে মরতে হত তাকে! মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে ওরা চিরদিন মরে। হয়ত মৃত্যুই ওদের জীবন!

"বারবার চুপ করে থাকৃছ—কথা বলৃছনা—" শম্পা আব্দেরে হয়ে ওঠে।

"কথা বলছিনা?" অবাক হয়ে তাকায় মিহির।

"সত্যি ত, আমার সঙ্গে কি আর কথা বলৃবে! আমি হয়ত বুঝবনা তোমার কথা—বোকার মতো প্রশ্ন করবো শুধু—"

"যাঃ—" মিহিরের চোখ নিবিড় হয়ে আসে শম্পার চোখের উপর। "আমি জানি। আর এ ত খুব সত্যিকথা, আমি কী-ই বা জানি!"

মিহিরকে হাল্কা হতে হ'ল। শম্পার কথার পিঠে জুড়ে দিতে হল: "কী-ই বা আছে আমার—"

"নিশ্চয়ই।"

"কিছু থাকলে আমি কি বলতাম জানো?—

Tell me not of your starry eyes
Your lips that seem on roses fade......"

শম্পা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বাংলাদেশের নীল আকাশ আর নরম মাটির রাজ্য সুরু হয়ে গেছে—উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে ট্রেণ। মিহির বাইরে তাকায়—কে যেন আকাশটাকে ছুড়ে দিচ্ছে পেছন দিকে। শম্পাকে বলতে ইচ্ছা করে সে-কথা। সব কথাই বলতে ইচ্ছা করে, যা তার মনে আসে। কিন্তু বলেনা ত। ভয়? সত্যি ভয়। শম্পা সইতে পারবেনা সব কথার ভার—কোনো মেয়েই তা পারেনা। মনে হয়েছিল সুপর্ণা পারবে,

কিন্তু পারল কি ও? অনেকখানি অবশ্যি পেরেছিল কিন্তু মিহির যেন হিংস্র হয়ে উঠ্‌ল, বোঝার উপর বোঝা চাপাতে সুরু করল সে যাতে এক সময় সুপর্ণার মন ভেঙে যায়। ওকে হিংস্রতাই বলে, নিজেকে হাল্কা করবার ইচ্ছা নয়। আচ্ছা, সত্যি বলতে সুপর্ণার অপরাধটা কি ছিল—ওর মেধাটাই ত অপরাধ? ওকে বড় বেশি উজ্জ্বল দেখাত—মিহির চেয়েছিল ও ব্যথা পাক, ব্যথা পেয়ে ম্লান হয়ে যাক ওর উজ্জ্বলতা। ব্যথা পাবার দরকার সবারই। কিন্তু ব্যথা যে দেয়, ব্যথা না দিয়ে যে থাকতে পারেনা তাকে কি মানুষ সুস্থ বলে? আজও কি সে সুস্থ না মুমূর্ষু? হয়ত তার কিছুই নয়, আরেকটি মানুষ। মনের ধার একদিন বেশি ছিল বলেই আজ আর মনের ধার নেই। একটি মানুষ মরে গিয়ে আরেকটি মানুষ আজ মিহির।

"ষ্টেশনগুলো যদি না থাকত—বেশ হত, না মিতুদা?" শম্পা আবার ঘুমের আড়ালে চলে যায়।

"একঘেয়ে স্পীড্‌ ভালো লাগত?—" মিহির পুরোনো মানুষটাকে লুকিয়ে ফেলল। শম্পার কথার উত্তরে তার মনে ঠিক এ-কথাটাই প্রথম উঁকি দেয়নি। "শুধু ষ্টেশন কেন, কিছুরই আর দরকার নেই এখন তোমার—" এ-কথাটাই আপনা থেকে তৈরী হয়ে উঠেছিল মিহিরের মাথার ভেতর—সুপর্ণা হলে তাই বলত সে—কিন্তু শম্পাকে তা বলা যায় না।

"স্পীড্‌টাও ভুলে থাকা যায়!"

"সবই ছেড়ে দিলে কি থাকবে?"

"তুমি!" ছাড়া-ছাড়া গলায়, অস্পষ্ট ঠোঁটে, খুসী-খুসী চোখে বলে ওঠে শম্পা।

মিহির তার হাতটা আরো গভীর করে তোলে শম্পার হাতে। ওটুকুই উত্তর। শম্পাকে আরেক রকম উত্তর দিতে হয়, সুপর্ণার মতো নয়। অভিনয়? তাছাড়া আর কি? অভিনয়ই আমরা করতে পারি, অভিনয়ই করি—সবগুলো নকল মিলিয়ে আমরা আসল। সব মেকির যোগফলে একটা কিছু হয় যাকে খানিকটা খাঁটি বলতে পারো। ছেলেবেলায় অভিনয় করত মিতু, সুন্দর অভিনয় করতে পারত—তার মানে আর কি?—মানে কি এ নয় যে অনেকগুলো চরিত্র ঘর বেঁধে আছে তার মনে, যখন যার দরকার তাকে টেনে বাইরে নিয়ে এসেছে মিতু! মিতু যদি তাই না হবে তাহলে মিহির এতো বিচিত্রের যোগফল হয়ে উঠল কি করে?

"সাতবছর, না? উঃ, কতোদিন!" রোগমুক্তির হাসি ফুটে ওঠে শম্পার মুখে: "অথচ মনে হয় এই ত সেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল! মিহিরদার সঙ্গে—" অনিচ্ছার দোলা লাগে শম্পার চোখে: "মিহির নামটা মোটেই ভালো নয় তোমার —মিতু-মিতুদা—বেশ ভালো!"

"মিতুদাও একদিন ভালো লাগবেনা—" যে-হাসিকে ভয় পায় শম্পা, মিহির তারই আভাস তুলে ধরল মুখের উপর।

"ঈস্—তা কেন—আমি মিতুদা-ই ডাকব!"

এ-ও যে উত্তর হতে পারে খেয়াল ছিলনা মিহিরের—কিন্তু সব কথার জন্যেই তৈরী থাকতে হয়—পার্ট কেউ ভুল বলতে পারে, কথা বানিয়ে সঙ্গীর ভুল দর্শকের কান থেকে ঢেকে রাখতে হয়: "মধ্যযুগে য়ুরোপের পুরুষরা আদর করে 'সিসটার' বলত!"

"কেবল আজে-বাজে কথা বলতে পারো তুমি!"

"কাজ যখন আমার খবর বিলি করা, কথা-বলা ছাড়া কি আর

জানি আমি ?"

"কথা না বলতে বলছি বুঝি আমি ?"

"কথা বলার দোষই যে কাজের কথা বলা যায়না !"

"যা-খুসী বলো। আমি শুনব—" ঘাড় এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে থাকে শম্পা।

"শুনবে ?" মনে-মনে হেসে ওঠে মিহির। বলে :

"I wonder, by my troth, what thou and I
Did, till we loved......"

"কে বলেছে ?" চোখ মেলে তাকায় না শম্পা।

"আমারই মতো কেউ—" হাসিটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মিহিরের। নিজেকে লুকোতে গিয়ে বিষণ্ণ হয়ে যেতে হয় এখনো—আর শম্পার কাছে আরো বেশি। দেশকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরাই ভালো—সুপ্রিয় ভাবত। শম্পাও তা-ই ভাবত। সুপ্রিয়র মতো একটি সহজ ভালো চরিত্র নিয়ে জীবনটা বেশ কাটিয়ে দেওয়া যায়—একসময় মিহিরও তা-ই ভেবেছিল। মিহির তখন তেমন ভালোই ছিল—সুপ্রিয়র কাছে ভালো, শম্পার কাছেও। সেই ভালোর স্মৃতি এখনও চকচক করছে শম্পার মনে। সে-দিনগুলো মিহিরেরও মনে আছে—মাঝে-মাঝে মনে পড়ে—কিন্তু তাদের রং নেই, চমক নেই, প্রাণ নেই। অনেক রকম জীবনের সাজ পরতে হয়েছে তার—অতীতের একটি অভিনয়-রজনী মনে লেগে থাকবার কথা নয়।

"সত্যি আমি ভাবতে পারতামনা তোমার কাছে কখনো আমি আসতে পারব—" শম্পা বলছিল…

ঘাটলার ধারে একটি শিউলিগাছ ছিল—আশ্বিনের কতো সন্ধ্যা ওখানে কাটিয়ে দিয়েছে মিতু—একটি দু'টি করে ফুল ফুটত—কেমন

পারো—"

স্থপ্রিয় তা-ই ভাবত গোড়ায়! কেন ভাবত সে-ই জানে। হয়ত মিহিরকে দেখে তা-ই মনে হত—কিন্তু মনে হত বলেই কি সত্যি সে তা-ই ছিল! একটি মেয়ে ত তাকে লম্পট বলেও মনে করতে পারত—চৌরঙ্গীতে মেয়েটির মুখ ভালো লেগেছিল মিহিরের। হঠাৎ তার পেছনে হেঁটে গিয়েছিল সে লীগুসে ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত! যে-মুখ দেখলে ভালো লেগে ওঠে মনে—কেন ভালো লাগে বোঝা যায়না—তেম্নি মুখ ছিল মেয়েটির। মিহির ভাবছিল সবসময়—ওটুকু পথের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তেই ভাবছিল, পেছন ফিরে কি একটি কথা বলতে পারে না ও? বলতে কি পারেনা: "আপনাকে কোথায় দেখেছি, বলুন ত!"—স্থপর্ণার মতো করে নয়, স্থপর্ণা যা বলতে পারত তা নয়, আরেক রকম করে কোনো কথা কি বলতে পারেনা মেয়েটি? এমন কি হয়না, হতে পারেনা? স্থপর্ণাকে ছেড়ে এসে আর কি আশ্রয় মিলবেনা মিহিরের—একদিনের জন্যে একটু আশ্রয়, কয়েক মুহূর্ত্তের আশ্রয়? মিললনা। মেলেনি। কতো স্থন্দর চোখ কদর্য্য হয়ে উঠল ঘৃণায় —মিহির লক্ষ্য করেছে। টাকার বিনিময়েই যদি কয়েক মুহূর্ত্তের আশ্রয় দিত তারা কেউ তাহলেও কি লম্পট ছাড়া তার আর কিছু পরিচয় থাকত তাদের কাছে? তারা কি জনতে পারত তার রক্তমাংসে, স্নায়ুতন্তুতে কি ব্যথা, কি কামনা অন্ধের মতো তাকে টেনে নিয়ে এসেছে। জানতনা। কেউ কাউকে জানেনা, শুধু দেখে, দেখে যায়! দেখা-টাই জানা হয়ে দাঁড়ায়!

"শুনে কাঁদতে ইচ্ছে করত আমার—জানো? চলে যেতাম ছোড়দার কাছ থেকে। চোখে জলের ঝাপটা লাগিয়ে, চোখমুখ

যেন অদ্ভুত মনে হত তার—তাকিয়ে দেখত পাপড়িগুলো ধীরে-ধীরে মেলে যাচ্ছে!

"যেদিন এলাম, পেছনের সবগুলো দিন মুছে গেল—একে নতুন করে বাঁচা বলে, না?"

কেন প্রশ্ন করে মিহিরকে জাগিয়ে রাখছে শম্পা—ও কি ফুল ফুটিয়ে যেতে পারেনা? চোখ বুঁজে একটু বিশ্রাম নিতে পারেনা কি মিহির!

"ভাবতাম—আমি যেমন ভাবছি মিতুদা যদি তেমন না ভাবে—কি হবে তখন?"

"তা হয়না।" কথা বলতে হল মিহিরকে।

"হয়না, না?"

"কারো মনেই যা সত্য নয় তা কি কেউ ভাবে কখনো?"

"খুব ভাবে।" শম্পার গলায় অন্ধকার জমে উঠ্‌ল।

মেয়েরা ভাবেনা, সুপর্ণাকে কোনোদিন তা ভাবতে দেখেনি মিহির—সুপর্ণার বুদ্ধি, মনন, মেধা সবই ছিল—বাস্তবের উপরকার সব পালিশ—কিন্তু কল্পনা ছিলনা! শম্পার তা আছে কি? গম্ভীরভাবে সব কিছুকে চিনতে পারে, ধরতে পারে ও, কিন্তু আকাশে ইমারত তৈরী করতে পারে কি? হয়ত পারেনা।

"তুমি ত ভাবনি—" মিহির হাসির আরামে ডুবে থাকে।

"আমাকে তুমি ভাবতে না—কেনই বা ভাববে!"

"কেন ভাববনা তা-ও ত তুমি বলতে পারতে না।"

"পারতাম।"

"কি করে!"

"ছোড়দা বলতেন তুমি নাকি জীবনটাকে দুহাতে উড়িয়ে দিতে

মুছে ফিরে আসতাম।"

"যে-সময় পার হয়ে যাচ্ছি আমরা, টুলু—" মিহির নিজের মুঠোতে শম্পার হাত টেনে নিলে—জেগে উঠে শম্পা মিহিরের গা ঘেঁষে সরে এলো: "জীবন তার সব মানে হারিয়ে ফেলেছে! কি সব দেখছ চারদিকে বলোত! নিজেদের আমরা ফিরে পাবো কোনোদিন, ভাবতে পারিনে!" খানিকক্ষণ আগেকার অন্ধকার থেকে ছুটে এসে তীব্র কোনো আলো খুঁজে চলল মিহিরের মন: "গান্ধীজিকে মুছে ফেলতে চায় যে হিংস্রতা তার ছায়াতেই ত আছি আমরা এখনো। কালো চিতাবাঘ আমাদের রক্তমাংস খেয়ে যাচ্ছে—আমাদের কালো রক্তমাংসের কি ভোল ফিরবে তাতে? তেমন রক্তমাংস চাই আমাদের যা দেখে শাদা চিতার লোভ হতে পারে—" মিহির শম্পার ঠোঁটের উপর একটি টুস্‌কি ছুঁইয়ে আনলে: "শাদা চিতা—জানো টুলু—

Lady, three white leopards sat under a juniper tree
In the cool of the day, having fed to satiety
On my legs my heart my liver and that which had been contained
In the hollow round of my skull......"

'স্কাল'-কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে যেন মিহিরের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়ে গেল।

আবৃত্তির সুরটা ছাড়া সবই কেমন যেন ঝাপসা হয়ে উঠছিল শম্পার মনে। তবু সে-ঝাপসা ছবি থেকে কয়েকটি রেখা তুলে নিয়ে বললে: "জীবন কোনোদিন মানে হারাতে পারে?"

"রং মাখতে-মাখতে অভিনেতার মুখের চামড়া স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে।"

"ক'দিন রং না মাখলেই ত স্বাভাবিকতা ফিরে আসে !"

ফিরে আসে ? শম্পার দেহের উষ্ণতায় আজ কি মিহির স্বাভাবিক ?

"তুমি নিজেকে কেন এতো অসহায় ভাবো মিতুদা ?"

"অসহায় কি আমি নই ?"

"মনে তুমি কি জানিনে, কিন্তু বলতে পারি বাইরে তুমি অসহায় নও।"

শম্পাকে জড়িয়ে ধরে মিহিরের হাত : "তাই মনেও আর অসহায় নই !"

"কি সব বল তুমি—আমার ভয় করে !"

"চিতাবাঘের গল্পটা ? বেখাপ্পা কথা বলা আমার ছোটবেলাকার অভ্যেস !"

বিষণ্ণ হয়ে যায় শম্পা—কি ভেবে যেন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বলে : "ব্যথায় কি বড়ো হয়ে ওঠেনা দেশ ? গান্ধীজির মৃত্যুর স্মৃতি কি বড়ো করে তুলতে পারবেনা আমাদের ?"

"শাদা চিতার মতো পারবে আমাদের কালো রক্তমাংস খেয়ে ফেলতে ?"

"তোমার বিশ্বাস হয়না ?"

"বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।"

মিহিরের বুকের বোতামের চারপাশে গোল করে আঙুল বুলোতে থাকে শম্পা : "আমরা পারব।"—মনে-মনে ও যেন একটা শপথ উচ্চারণ করে।

কি পারবে শম্পা ? নূতন জীবন সুরু করতে পারবে, যাতে নূতন মানুষ তৈরী হয় ? নূতন দেশ তৈরী হবে তাতে ? হয়ত তা-ই—আজ সব কিছুর শেষে মনে হয় এখানেই কোথাও—এই ছোট ছোট মানুষের মনে কোনো এক মহতের সূচনার বীজ লুকিয়ে

আছে। নিউজ সার্ভিস ঢাক পিটিয়ে যাবে, বিদেশীরা ভোজসভায় আপ্যায়িত হবেন, রেডিওর কণ্ঠ অক্লান্তভাবে গান্ধীজির নাম চেঁচিয়ে চলবে—এই ঢাকের, কাচের আর ধাতুর কলকণ্ঠে নূতন সজ্জায় দাঁড়াতে পারবেনা ভারতবর্ষ। তপস্যার মতো কিছু চাই যেন তার—চাই। কোনো নির্জ্জন কুটির—নিঃশব্দ মুহূর্ত্ত! রূপসজ্জার আড়ালে কোনো নগ্নতা—অন্ধকারের কোনো রহস্য, দুর্ব্বোধ্য কোনো প্রাণের আবির্ভাব! এতো আলোহাওয়ার কোলাহলে কি প্রাণের জন্ম হতে পারে? মাটির নীচে অন্ধকারে অন্ধকার হয়ে মিশে যেতে হয় সূর্য্যের রশ্মিকে—আলোকে হারাতে হয় অন্ধকারের দুর্ব্বোধ্যতায়, তবেই তৈরী হয় রূপের অঙ্কুর—জীবন! শম্পা পারবে—সৃষ্টির উপাদান নিয়ে প্রতীক্ষায় থরথর করছে তার হৃদয়—একটু ছায়া-রশ্মি দাও তাকে—অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে ভরিয়ে তুলবে সে তার পৃথিবীকে। শম্পা পারে—শম্পার মতো যারা, তারা সবাই পারে। শুধু পারেনা সুপর্ণা, সৃষ্টির অন্ধকার নেই সুপর্ণার—প্রদীপের শিখার মতো নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে ও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে নিভে যায়। খানিকটা মিহিরেরই মতো। সুপর্ণাকে তাই বিশ্বাস করতে পারেনি সে—নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারেনা—কিন্তু শম্পাকে বিশ্বাস করে। প্রথম পৃথিবীর উপাদান আছে শম্পাতে—শীতাতপ থেকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছে ও সে-উপাদান।

"কি পারবে?" শম্পার চোখের উপর থেকে কয়েকটা চুল আলতো আঙুলে সরিয়ে দেয় মিহির।

"জীবনকে ফিরিয়ে আনতে।"

"আর এক নক্সা পায়
ছেঁড়াখোঁড়া ছড়ানো জীবন।"

"না। ইচ্ছাকে ভয় দিয়ে কেন মুড়ে রাখব? কতো কি তৈরী করে তুলতে পারে আমাদের ইচ্ছা!"

"পাতালেও টেনে নিয়ে যেতে পারে!"

"প্রোটিন বিষও হয় শরীরের খাদ্যও হয়!"

হাসির মুক্তিতে নিজেকে ছড়িয়ে দিলে মিহির: "বি-এস্-সি-র ফল ফলছে!"

"আমি যা ইচ্ছে করেছি তা-ই আমার হয়েছে—" কালো পাথরে-খোদাই কোনো দেবতার মূর্ত্তির মতো দেখাতে লাগল শম্পাকে: "যা আমি ইচ্ছে করব, তা-ও হবে।"

মিহির হাসতে লাগল।

"হেঁ—দেখো।"

"কিন্তু এখন এমন ইচ্ছে করতে পারো রাণাঘাটের পর যেন এ-কামরায় কোনো লোক না ওঠে?"

অবাক হয়ে গেল মিহির—কতোদিন পরে সে এমন হাসি হাসতে পারছে—হয়ত ঠিক তেম্নি হাসি যা দেখলে মা বলতেন: "এটা কি রে, মেয়েদের মতো খিল্‌খিল্ করে হাসে শুধু!"

দুই

১

ষ্টীমারের কেবিনে ঝলমল বিকেল। পদ্মার নরম হাওয়া সিল্কের মতো গা জড়িয়ে ধরে। শম্পা ঘুমুচ্ছিল। ট্রেণের দুর্দ্দান্ত গরমের পর পদ্মার এই ঠাণ্ডা, ভিজে হাত না থাকলে কি করে যে মানুষগুলো বাঁচত মিহির ভেবে পায়না। রোদে পুড়ে যাচ্ছ তুমি—আছে তোমার জন্যে কোথাও-না-কোথাও একটু ছায়া—এইত বাংলাদেশ! বাংলাদেশ—মিহির তেম্নিভাবেই উচ্চারণ করে কথাটা হঠাৎ শম্পাকে মনে পড়লে যেম্নি সে বারবার বলতে থাকে: টুলু, টুলু, টুলু। আশ্চর্য্য, বাংলাদেশের উপর অভিমানও করেছিল সে—অভিমান করে দিল্লি চলে গেছে, চাকরি নিয়েছে সেখানে—মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছে আর ফিরে আসবে না। কার উপর অভিমান! — বাংলাদেশ ত তেম্নি আছে — একই রকম! একই রকম পদ্মার হাওয়া, নৌকোর পাল, সাদা জল, রূপোলি চর! একে কি বিদেশ ভাবা যায়? ভাবতে পারবে মিহির কোনোদিন? বরং দিল্লির লালচে মাটিতে যেদিন গান্ধীজির রক্ত পড়ল, ভয়ে তার হৃদ্‌পিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, বুকের ভেতর কে যেন চেঁচিয়ে উঠছিল, দিল্লি তোমার নয়, আমার নয়, ভারতবর্ষের কেউ নয়—এ প্রেতপুরীতে ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যই রচনা হয় শুধু! চিঠিতে শম্পাকে জানিয়েছিল মিহির সে-কথা—চাকরি নিয়ে এখানে আসতে চাও তুমি? বাংলা দেশের মেয়ে তা পারে কখনো?

'রাজর্ষির' 'হাসি'র মতো চমকে বলে উঠ্‌বে: এতো রক্ত কেন? এখানকার ইমারতের পাথরগুলোতেও পুরোনো রক্তের রং। নীল যমুনা হয়ত তা-ই দূরে সরে গেছে। তুমি এসোনা—বরং পারি ত আমি চলে আসব।

ষ্টীমারের উপরে-নীচে পায়চারি করে আধঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়—আগে তা-ই করত মিহির। বিছানা বিছিয়ে মালপত্রের পাচীল তুলে দুধারে সারবন্দী শুয়ে আছে যাত্রীরা। সেই পুরোনো ছবি! তবু যেন চোখে একটা ধাক্কা লাগল—চোখে না কি বুকের ভেতর মিহির ঠিক বুঝতে পারলনা। দাঙ্গার সময়ে হাসপাতালে ঠিক এম্নি সারবন্দী ছবি দিনের পর দিন দেখে এসেছে সে। হাসপাতালে পাশাপাশি শোয়ান মানুষ। সংবাদদাতার নির্লজ্জ কৌতূহল ছিলনা তার কোনোসময়—মৃত্যু যাদের কাছে বস্তুহীন—কতকগুলো রেখা—সংখ্যা! খানিকটা রক্তমাংসের, খানিকটা অনুভব-আকাঙ্ক্ষার অবসান নয়—মানুষের মৃত্যু নয়! ওরা শুধু সংখ্যা জানতে যায়—এক, দুই, তিন, চার। এক একটি সংখ্যা উচ্চারণের সঙ্গেই যেন এক-একটি মৃত্যুর কাহিনী শেষ হয়ে গেল! তবু ওদের তকমা পরেই মিহিরকেও হাসপাতালে যেতে হয়েছে—রিপোর্টার হিসেবেই জানত তাকে সবাই—জানত সংখ্যা কুড়োতেই সে হাসপাতালে যায়। কি করে ওরা জানবে সে যে মৃত্যুকে অনুভব করতে পারে—জীবনের উষ্ণতায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়াতে পারে মৃত্যুর শীতের দিকে! রোজ বিকেলে হাসপাতাল থেকে মৃত্যুই যে তাকে হাতছানি দিচ্ছে, তা ওরা জানতে পারবে কেন? কতকগুলো মানুষ—আর ওরা কলকাতার রাস্তায় হাঁটবেনা, অফিসে-কারখানায় যাবেনা, শিশুর মুখের নারীর দেহের উত্তাপ পাবেনা—আর ওদের সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত নেই, গ্রীষ্মবর্ষা-শীতবসন্ত নেই! গলার ভেতরে গোল

হয়ে ব্যথার মতো কি যেন টন্‌টন্ করতে থাকত মিহিরের। মনে পড়ত তিতুকে—বাবাকে—মাকে।

আজ মনে হয়, হয়ত নিজেকে মৃত্যুর বিষ পান করাতেই হাসপাতালে যেত মিহির। জীবনে মৃত্যুকে অনুভব করতে যেত। তিতুর মৃত্যু, বাবার মৃত্যু, মার মৃত্যু—পুরোনো হয়ে গেছে যেসব মৃত্যু—তাদেরই নূতন করে অনুভব করতে চাইত! মুক্তির নিঃসঙ্গতা তখন তার গলা টিপে ধরছিল—মৃত্যুকেই মনে হত আপন, একমাত্র সঙ্গী। শম্পা কলকাতায় ছিলনা, আর থাকলেও বা কি, তখনও কি মিহির জানে শম্পা কতটুকু এগিয়ে আসতে পারবে! সব ধূমকেতুই ত আর সূর্য্যের কাছে এগিয়ে আসেনা! কে জানে তারা হয়ে দূর শূন্যে যে মিলিয়ে যাবেনা শম্পা একদিন! ছিনিয়ে আনবার তারুণ্য হয়ত ফিরে পাবেনা মিহিরের মন। কেনই বা ফিরে পাবে। বয়েস ত হল! অফিসে তখন সে প্রায় প্রবীণ নিউজ-এডিটর। 'ছেলেটি' কেউ আর বলেনা তাকে, বলে 'ভদ্রলোক'। সেই ভদ্রলোক মরে গিয়ে আবার একটি ছেলে জন্ম নিয়েছে—শম্পার কাছে, শম্পার জীবনের পাশে।

খাবারের দোকানটা ঠিক তেম্নি, টিনভর্ত্তি চিঁড়েমুড়ি, কেকবিস্কুট, দড়িতে কলার কাঁদি ঝোলান—ডাবের কাঁদি এক পাশে স্তূপ করা—চা-পান-বিড়ি-সিগারেটও আছে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে অনবরত লোকের ওঠা-নামা! সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্ধকার সরু গলির পথে এগিয়ে গিয়ে এঞ্জিনের গহ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকত মিতু বলে একটি ছেলে—আগুনের আঁচে সেই লাল মানুষটা এখনও আছে আর সেই কয়লার কুণ্ডটা। একবার মনে হয়েছিল মিতুর—কোন্‌বার?—মা যেবার মারা যান, না কি তিতু মরে যাবার পর?—নিজেকেই জিজ্ঞেস

করেছিল, ওই আগুনের কুণ্ডটায় ঝাঁপিয়ে পড়লে ক'সেকেণ্ড লাগবে পুড়ে কয়লা হয়ে যেতে ?

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো মিহির। গ্যাঙওয়ের তক্তা আর দড়ির স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বর্ষায় চাকার জলের ছাঁট আসে এখানে আর ইলিশ-মাছ রান্নার গন্ধ—সামনের ভেজা দাগটা আরো চওড়া থাকে। বর্ষার পদ্মাকে দেখলে নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে যেতো শম্পা। আর যদি ঝড় উঠত—কালো হয়ে যেতো পদ্মার সাদা জল, সাদা ফেনায় মৃত্যুর হাসি চিকিয়ে উঠত, কোথায় লুকিয়ে রাখত সে শম্পাকে তখন! মৃত্যুকে চায়না শম্পা—সুপ্রিয়র মৃত্যুর পর জীবনকে যেন বেশি করে ভালোবাসতে সুরু করেছে ও। জীবনকে ঠিক এম্নি ভালোবাসতেন মা—আবার একদিন মৃত্যুকেও ঠিক এম্নি ভালোবাসতে সুরু করেছিলেন। কিন্তু এ-ভয়ঙ্কর ভালোবাসা তাঁর ছেলেদের সামনে তুলে ধরতে চাননি—যতীনদার বাড়িতেই, তাঁরই কোলের উপর মাথা রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন মা। মা-ত জানতেন না তাঁরই মতো, তিতুরই মতো মিতুও একসময় মৃত্যুকেই ভালোবাসতে চেয়েছে—আঘাত দিতে চেয়েছে সবাইকে, নিজেকেও! কার উপর যে অভিমান ছিল তার জানতনা কিন্তু অভিমান ছিল। হয়ত জীবনের উপর অভিমান, মৃত্যুর উপরই অভিমান। কেন মরল তিতু? হার মেনে গেল কেন জীবন? কার দোষ, কার অপরাধ? তার কি অপরাধ নেই? ধীরে ধীরে কি মিতু নিজের জীবনের উষ্ণতা সরিয়ে নেয়নি হাবুলের জীবন থেকে, তিতুর জীবন থেকে আর তারপর মার জীবন থেকে? দু'বছর মা যতীনদার বাড়িতে ছিলেন—মাত্র দু'বার গিয়েছিল মিতু তাঁর কাছে—মিতুর মুখের দিকে তিনি তাকাতেন না,

তাঁর মুখের দিকে তাকাবারও সুযোগ দিতেন না! অথচ আশ্চর্য্য, মিতু জানতনা তার কি অপরাধ! তখন জানতনা, আজ জানতে পারছে—শম্পাকে পেয়ে জানতে পারছে আজ!

শম্পাতে সে কি পেয়েছে? হয়ত বিচার করে একটি একটি তা তুলে আনা যায়না—কিন্তু একটা ছবি, ফিকে ছবি পাওয়া যায়। খানিকটা মাকেই পায়নি কি মিহির শম্পার মনে? ঠিক সে মা নয়, বেঁচে থাকতে তিনি যা ছিলেন। মৃত্যুর হাতে মুছে যা তিনি আছেন, তাকেই, সে অনুভবকেই পায়নি কি খানিকটা? ঠিক মার মতোই জীবনকে ও ভালোবাসতে চায় — কয়েকটি মুহূর্ত্তের দাগ — জলের রেখা — তাকে রূপ দিয়ে সাজিয়েগুছিয়ে তোলার সে কী আগ্রহ শম্পার! তাই কি ভালো লেগেছিল তাকে? না কি শম্পার ভীরু-ভীরু মুখ যেদিন প্রথম ছায়া ফেলেছিল মিহিরের চোখের উপর হঠাৎ একটা স্মৃতির দোলায় ঝিন্‌ঝিন্‌ করে উঠেছিল তার স্নায়ুর রূপোলি তারগুলো? মনে পড়ে চমকে উঠেছিল মিহির। কিসের স্মৃতি? কিসের স্মৃতি—কোথায় এ-মুখ দেখেছে সে আর? আগেকার জীবনে? মগজের স্নায়ুগুলো হো-হো করে হেসে উঠেছিল, জন্মান্তর মানো না কি তুমি? মানিনে, কিন্তু কোথায় দেখেছি একে বলতে পারো? দেখেছি—চোখের ভুল নয়—সমস্ত সত্তা আমার বলছে, দেখেছি। মার ভয় পাওয়া মুখ দেখেছ ছেলেবেলায়, তা-ই কি? হবেও বা—মনে নেই আমার সে-মুখ। মনে নেই বললেই কি সত্যি মনে থাকেনা? তোমার মনে ভয় এসে বাসা বাঁধল কোত্থেকে—ভয়কে তুমি ভালোবাস। মাকে ভয় করেছ, ভালোও বেসেছ—ভয়কেই ভালোবেসেছে— তুমি ভীরু হবেনা! ভীরুতার মেরুদণ্ডের ওপরই ত তোমার সমস্ত সত্তা

দাঁড়িয়ে আছে! কি করছিলে মনে নেই? স্বদেশীর আগুন জ্বলল যেদিন সহরে—তোমার বন্ধুবান্ধবরা ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল সে-আগুনে —তুমি সেদিন সহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে কেন? তারপর তোমার কম্যুনিজম—ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে গা বাঁচিয়ে চলবার জন্মেই ত ধরেছিলে এ-পথ! তাছাড়া আর কি? ভাঙার নেশা?—বলতে বটে সব ভেঙে ফেলতে চাও। ভেঙে ফেলবার কি ক্ষমতা আছে তোমার? পরিবারকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসেছ পেছনে, তাই ত তোমার ক্ষমতার পরিচয়! কিন্তু কে তোমার পরিবার? দাদা? দাদা তোমার হাতের ঢিল নয়! তবে আর কে? মা? মাকে সবাই ছুড়ে ফেলে দিতে পারে, ব্যথা দিতে পারে, কাঁদাতে পারে! তা করে নিজেকে গড়তে পারেনা কেউ, ভেঙে, বাঁকিয়ে কদর্য্যই করে তুলতে পারে। তা-ই ত করছিলে তুমি—কোনো ছবি তোমার চোখে সোজা ছিলনা, সব বাঁকাচোরা! সুপ্রিয়র মতো বন্ধু না পেলে ৪২-সনে কি করতে তুমি? 'ন্যাশন্যাল ওআর ফ্রণ্টে' চাকরি খুঁজতে—উইণ্ডমিলের সঙ্গে যুদ্ধ করে মনে ভাবতে দেশরক্ষা করছ! ভীরুতারই একটা জটিল ছবি তুমি—আজ বয়েস হয়েছে আর তাই হয়ত ভয় কাটিয়ে ওঠেছ কিন্তু ভয়ের মায়া কি কাটিয়ে উঠতে পারো তুমি—ভয়ের স্মৃতি কি ভুলে যেতে পারো? শম্পাকে তোমার ভালো লাগবেনা কেন? নিজেকে সেদিন তোমার খুবই ছোট মনে হয়েছিল—ঝকঝকে বুদ্ধির উপর কে যেন হঠাৎ কুয়াশার পর্দ্দা টেনে দিলো—সুপ্রিয় গুণগান করছিল তোমার—মাথা নীচু করে তুমি ভাবছিলে, মুখোস খুলে পড়েছে—অভিনয় আর জমবেনা।

অভিনয় আর জমছেনা, জানে মিহির। শম্পা অভিনেত্রী নয়—

মাত্র একটি চেহারার মানুষ। আশ্চর্য্য, একটি চেহারা নিয়ে আজও মানুষ জন্ম নেয়! আর তার চেয়েও আশ্চর্য্য সে-মানুষ মিহিরকে বদলে দেয়! বদলাবার জন্যে তৈরী হয়েই ছিল হয়ত মিহির—তার বহু রূপ হয়ত একটি রূপকেই হাতড়ে বেড়িয়েছে। কবে কোন্ পূর্ব্বপুরুষের দেহকোষে কি একটা তৃষ্ণা জন্ম নিয়েছিল একদিন—জীবনের পর জীবন পার হয়ে এসেছে দেহের সেই প্রাণকণা কিন্তু তৃষ্ণা তার মেটেনি। অতৃপ্ত তৃষ্ণা আজ কতো জন্মের পর মিহিরে এসে পেয়েছে তার পানীয়—পেয়েছে শম্পাকে। একেই আমি বলি জন্মান্তর। নারী তার পুরুষকে বারবার জন্ম দেয় নূতন করে—প্রেমে জন্ম দেয়, তারপর জন্ম দেয় ভ্রূণে। চন্দ্রকে আকাশে দশবার আসতে হয় নারীর জঠরে মানুষের জন্ম, নূতন মানুষের জন্ম, সন্তানের জন্ম দেখবার জন্যে। আজও সেই একই চন্দ্র উঠবে আকাশে—একটি তৃষ্ণার জন্মমৃত্যুর সাক্ষী।

আঃ, কতো জল পদ্মায়—সমুদ্রের মতো জলের মরুভূমি নয়—জলের ফসল! জলের ফসল ওই জেলে ডিঙি, গ্রামের সবুজ ছায়া, চরের বালুতে পানকৌড়ির সার। মনে হাওয়া দিল মিহিরের। অনেকক্ষণ হয়ে গেল—ঘুম ভেঙেছে কি শম্পার? মনে হল, অনেকক্ষণ মিহির নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। এতোক্ষণ কি করে সে দাঁড়িয়ে আছে—একা?

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগল মিহির। এমন অদ্ভুত ভালো লাগছিল কেন নদীটাকে তার? অনেকদিন পর দেখছে বলেই কি? না কি ভালো-লাগার ক্ষিদে ফিরে পেয়েছে তার চোখ। যেদিন দিল্লিকে শেষ নমস্কার জানিয়ে মিহির তুফান মেলে-এ এসে উঠেছিল, মনে পড়ে, সেদিন থেকেই এই ক্ষিদে একটু-একটু করে জমতে সুরু

করেছে। বরাকরের পুল পেরিয়েই বাংলাদেশ, আর—বারবার মনে পড়ছিল— বাংলাদেশের একটি মেয়ে—শম্পা! শম্পা অবাক হয়ে যাবে —চাকরি ছেড়ে চলে এলো বলে নয়, অবাক হবে বাংলাদেশেই সে থাকবে, শুনে। কিন্তু অবাক হলনা শম্পা, শুধু বল্‌লে: "দিল্লিতে আমারও যদি একটা কাজ হত তাহলেই সবচেয়ে ভালো ছিল!" ভাঙা বাংলায় থাকতে ইচ্ছে করেনা বলেছিল আধ-আধ গলায়। হাসি পাচ্ছিল মিহিরের, বাংলা কি সত্যি ভেঙে গেছে না কি! ভাঙা বাংলা কথাটা শুধু অভিমান! কি করে ভাবা যায় এই পদ্মা আমাদের নয়, ওই গাঁগুলোকে আমি চিনিনে—ষ্টীমারের এ মানুষগুলো আমার অচেনা হয়ে গেছে! "নতুনভাবে জীবন সুরু করতে হলে চারদিকটাকেও খানিকটা নতুন হতে হয়—ভাঙা বাংলাকে না পেলে তার জন্যে কোথায় দৌড়ুতে হত কে জানে!"—মিহির তার হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেদিন চোখের খুসীতে সমস্ত কলকাতাটাকে গ্রাস করতে সুরু করেছিল। "আচ্ছা, ভাঙা বাংলায় বাড়ি কোথায় পাও, দেখব!"—শম্পা ঝগড়াটে বোনের মতো শাসানি এনেছিল চোখে। "পাব, সব পাব।" শম্পার গালে মিহির একটা গোল রেখা বুলিয়ে দিয়েছিল। গোল রেখা —বৃত্ত। জানেনা কেন ওটা আঁকতে ইচ্ছে করেছিল। সরল রেখায় সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়, আবার গোল হয়ে সব মিলে আসে—তাই কি? আজ মিহিরের মনে হয়—যা হবার নয় তা-ও হয়ে যায় একেক সময়—অদ্ভুত, ম্যাজিকের মতো। "তোমাতে আমাতে এক জনমের ব্যবধান'—তুমি কি আসতে পারো আমার জীবনে? কিন্তু এলে। ভেবেছিলাম আমার শুধু পথ আছে, গলিপথ, সুড়ঙ্গপথ, মরুপথ, রাজপথ—শুধু আঁকাবাঁকা, ছককাটা রেখা—সে-রেখা গোল হয়ে জীবনকে জড়িয়ে ধরবে, ভাবতে কি পেরেছিলাম কোনোদিন?

কোথায় ছিলে তুমি আর কোথায় বা আমি! আমার জীবনে আসতে পারত সুপর্ণা, কি আর কেউ—আসতে পারত ছোটবেলাকার সেই বল্লরী—বুলু। মা বলতেন বুলুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। হয়ত বলতেন তিতু ওরকম করেছিল বলে—আমি যেন তিতুর মতো ঝাঁপিয়ে না পড়ি তার জন্যেই বুলুকে বেছে নিয়েছিলেন মা। বুলুকে ভালো লাগত মিতুর — ওর চোখেও ঘুম ছিল মনে পড়ে। ভালো লাগত কিন্তু এমন ত লাগেনি টুলুর বেলায় যেমন হয়েছে তার। হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ড থেমে যায়নি বুলুকে দেখে—কানের ভেতর অনেকগুলো গলা চেঁচিয়ে ওঠেনি 'পেয়েছ-পেয়েছ' বলে। টুলুকে পাবে বলেই চুপ করে ছিল তারা তখন? তারা কি জানত একদিন টুলু আসবেই? রক্তমাংসের, আর স্নায়ুর প্রাণ যা জানে, জানতে পারে যা, আমাদের স্থূল জীবনের জানা কি তা জানবে কোনোদিন? মানুষ দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারেনা, তার মনের মূল তা পারে। মনের মূল--রক্তমাংসের প্রাণ আর স্নায়ু-গ্রন্থির প্রাণ থেকে যার জন্ম।

"হাল্লো—মিহির না?" বাক্স-প্যাঁটরা আর মানুষের আশ-পাশ দিয়ে তৈরী সরু গলিটাতে পা বাড়াচ্ছিল মিহির—পেছন থেকে শব্দটুকু উঠে তাকে চমকে দিলে।

কে? পেছনে তাকাল মিহির। পরিচিত গলা নয় কিন্তু স্যুট-পরা যে ভদ্রলোক হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন তিনিও কি পরিচিত? জানে সে অনেককে কিন্তু পরিচিতদের ত হাতে গোনা যায়।

"চিনতে পারলেনা?" ভুল করেননি ভদ্রলোক—মিহিরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন।

"ওহো—" অনেকক্ষণ অন্ধকার ভেঙে হঠাৎ আলোতে এসে পড়ল

মিহির: "আলম নও তুমি?"

"যাক্ বাঁচা গেল!" অভিনয়ের ভঙ্গীতেই বললে আলম: "সাফ বলে দিতে যদি চিনিনে, কি উপায় হত ভাবছি!"

"দোষ হতনা!" আলমের কাঁধের উপর হাত রাখল মিহির: "কতো বছর পর? থার্টির পর এই প্রথম—আ-ঠা-রো বছর!"

"কিন্তু আমি ঠিক ধরতে পেরেছি।"

"আমিও ত পারলাম—তবে একটু দেরি হল!"

"তারপর—দেশে এলে বুঝি? মাঝে আসোনি একবারও?"

"না আসারই মতো।" আলমের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল মিহির। ছোট-ছোট করে ছাঁটা গোঁফ—তবু কয়েকটা রূপোলি চুল দেখা যাচ্ছে। মুখে অজস্র রেখা—সেই ফার্ষ্ট-ইয়ারের আলম কোথাও নেই—চোখে নেই, নাকে নেই, ঠোঁটে নেই—তবু যেন চোখে-নাকে-ঠোঁটেই কোথায় লুকিয়ে আছে সে-আলমের মুখ।

"বুড়ো হয়ে গেছি—তাই দেখছ বুঝি—" আলম তার শক্ত হাতে মিহিরের একটা হাত চেপে ধরল: "তোমার ওখানে চল, না-হয় আমার ওখানে—এখানে নয়!"

ভালো লাগছিল মিহিরের, পদ্মাকে দেখার চাইতে ভালো। কলেজের দিনগুলোর শোভাযাত্রাই কি চলে যাচ্ছে তার চোখের উপর দিয়ে? কলেজে যেবার বিসর্জ্জন নাটকে জয়সিংহের অভিনয় করেছিল মিহির, আলম ঠিক এম্নি হাত চেপে ধরেছিল তার, বলেছিল: "এতো সত্যি অভিনয় কি করে করো তুমি ভাই—আমার মনে হল সত্যি একটা লোক আত্মহত্যা করছে!" আলমের শুধু এই একটি কথাই মনে পড়ে—আর কোনো কথা নয়—অনেক কথা মরে গিয়ে এ-কথাটিই আঠারো বছর বেঁচে আছে

দেখতে পেলো মিহির। প্রশংসা বলে নয় হয়ত সত্য বলেই বেঁচে আছে। —আত্মহত্যা! কি করে সেই অদ্ভুত সত্য সেদিন উচ্চারণ করেছিল আলম! সে নিজেও যা জানতনা, আলম তা জানতে পেরেছিল কি করে! তা-ই কি ঠিক, নিজের চোখের চেয়ে বন্ধুর চোখেই যে আমরা বেশি সত্য! মায়াবী আয়নার মতো বন্ধুদের আমরা তাই সাজিয়ে রাখি—আমরা যা পাইনে তার ছায়া পাব বলেই হয়ত সাজিয়ে রাখি।

"কেবিনের পেছনে 'দুটো চেয়ার নিয়ে নিরিবিলি বসা যাবে—চলো—"

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকাতে লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ল মিহির আর মনে হল যা বলবার ছিল এখন আর তা বলা যায়না, দেরি হয়ে গেছে। "আমার ওখানেই চলো"—বলতে পারত মিহির—ঘুম ভেঙে থাকলে মিহিরকে খুঁজতে সুরু করবে শম্পার মন—তার জন্যেই বলা উচিত ছিল ও-কথা। তাছাড়া শম্পা অবাকও হত আলমকে দেখে—মিহিরের বাল্যবন্ধু—এই মুসলমান ভদ্রলোক!

মানুষের গা'-পা' বাঁচিয়ে ওরা কুঁজো হয়ে পথ করে নিতে লাগ্‌ল। কিন্তু আলম এ বেয়াড়া দশাতেও কথা ছাড়ছিলনা: "রায়টের পরে কাগজে কতগুলো আর্টিক্‌ল্ বেরিয়েছিল মিহির চৌধুরীর। পড়ে ভেবেছি এ নিশ্চয়ই আমাদের মিহির।"

"তখন ভেবেছিলাম ফ্রি-লান্সার জার্ণেলিষ্ট হব!"

"লেখাগুলো চমৎকার। আমি তখন উইল্‌কির 'ওআন ওআল্ড' পড়ছিলাম আর ভাবছিলাম আমরা এক বাংলাদেশেই দু'টো জগৎ তৈরী করতে চলেছি!"

"তৈরী ত হলই !"

"হল।"

ইণ্টার-ক্লাশের খাঁচাগুলোর কাছে এসে পৌঁছুল ওরা—সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাওয়া গেল। কিন্তু ডাইনিংরুমের টেবিল-চেয়ার-পাতা চৌকো ফাঁকা জায়গাটুকুতে না এসে আর ওরা থামলনা।

"দু'কাপ চা আনতে বলি, কি বল?" আলম একদম দাঁড়িয়ে গেল: "আর টোষ্ট?"

"যা বল্‌! জানো ত বামুনের ছেলে আমি!" হাসতে লাগল মিহির।

দু' পা এগিয়ে আলম হেড-বাবুর্চ্চিকে অনুরোধ জানিয়ে এলো।

প্লেট-গ্লাস ধোওয়ার শব্দ আসছে—এঞ্জিনের একঘেয়ে শব্দটা আর আলাদা হয়ে কানে আসছেনা। ওই টুং-টাং ধারাল মিষ্টি ধ্বনিটুকুই ধরে নিচ্ছে কান। আর কাঠের উপর দুপ্‌দাপ ভোঁতা শব্দ। দুটো শব্দ বেশ মিলে যায়—দু'টোতেই চমক আসে। সেই চুপ-করে-থাকা মেয়েটি কি আর আজ আছে শম্পা—আর সূক্ষ্ম চক্‌চকে নিবের জার্ণেলিষ্ট—বহুরূপী জার্ণেলিষ্টও কি আর আছে মিহির? ওরা দুজন কেউ আর কারো আগেকার জায়গায় নেই!

"প্রায়ই ভাবি আমি মিহির—" হ্রস্ব ব্যবধান রেখে আলম একটি চেয়ার টেনে বসল: "পলিটিক্স আমাদের আরো কোথায় নিয়ে যাবে!"

"সবাই মিলে ধর্ম্মচর্চ্চা করতে সুরু করলে নরক তৈরী হয় জানো ত —পলিটিক্স আপামর জনগণের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ালে ত মুস্কিল হবেই।"

"এ থেকে সরে আসতে পারিনে আমরা এখনো?"

"পারি কিন্তু আসতে চাইনে—কণ্ডিশন্‌ড্‌ হয়ে গেছি।"

"এ নিয়ে তোমাদের প্রোপ্যাগাণ্ডা করা উচিত, ভাই!"

"একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল—বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ মানুষ ভিক্ষা করত—" আলম চোখ ফিরিয়ে আনল: "ওটা একটা মস্ত ঘটনার সিম্বল আমার মনে হয়। একদিন আমরা সবাই ভিক্ষে করব বলেই পঞ্চাশ সালে ও-দৃশ্যটা তৈরী হয়েছিল।"

"আফশোষ করে কি হবে আর বলো—এখনও আমরা ইকনমিক্সে বাস করতে শিখিনি, পলিটিক্সেই বেঁচে চলেছি। একদিন হয়ত সব শুধরে নিতে পারব!"

"ঘা পুরোনো হলে সারে না।"

"চা জুড়নো হলে চলে কি?"

আলমের কালৃসে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল আবার, একটা পুরো টোষ্ট মুখে পুরে দিয়ে ওটাকে কাবু করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার মুখের পেশীগুলো।

মিহির একটু-একটু করে টোষ্ট ভেঙে চলল: "তুমি এখন কোথায় আছ আলম?"

"ফরিদপুর।"

"সপরিবারে?"

"হেঁ—দুটো বাচ্চা আর স্ত্রী—তুমি? তোমার—"

"আমার পরিবার নেই!"

"বিয়ে করোনি?

"তোমাদের মতো বিয়ে আর হল কই!"

"সত্যি ভালো করেছ।" সিগারেটের বাক্স বার করে টেবিলের উপর রাখল আলম: "বড্ড ঝামেলা। ভাগ্যকুলে আমার এক বোনের মেয়ের বিয়ে—শ্বাস ফেলবার সময় নেই, তবু স্ত্রী বললেন যেতেই হবে। এদিকে সারা আদালতে আমি সবেধন মুন্সেফ—

"প্রোপ্যাগাণ্ডা কিছু নিয়েই করা উচিত নয় আলম—জার্ণেলিজ্‌ম্ ছেড়ে দিলাম তা-ই—চাকরি ছেড়ে দিলাম। প্রোপ্যাগাণ্ডায় ধর্ম্মগুলোর জাত গেছে—পলিটিক্সেরও জাত নষ্ট হচ্ছে।"

"এ-ভাবেই আমাদের থাকবে হবে?"

"কোন্ ভাবে?" মিহির হাসতে লাগল।

"তুমি আর আমি বিদেশী হয়ে?" আলমের চিবুকের ধারটা শক্ত হয়ে এলো: "কোনো মানে হয়না—ওটাকে ম্যাজিক বলতে পারো, রিয়্যালিটির কিছু নেই এতে!"

"ইলিউশন চর্চ্চা যখন মানুষ করে যাচ্ছে, তাকে রিয়্যালিটি বলতে কি দোষ?"

"ওসব ফিলসফি করে এখানকার মানুষের ক্ষিদে মিটবেনা, মিহির! ফিলসফির চোখ নিয়ে আমিও দেখতে চাইতাম সব—কিন্তু কি হচ্ছে চারদিকে! মানুষের জীবন যেন নলখাগড়ার বন—ভেঙে যাক্, মটকে যাক্, কারো কিছু যায় আসেনা! কি করে মানুষ বাঁচবে কেউ দেখবেনা—একটা দেশের ইকনমি ভেঙে গেল, কেউ তাকাবে না, এর চেয়ে তাজ্জব ব্যাপার আর কিছু আছে না কি?"

ভেঙে গেল? মিহির তাকিয়ে ছিল পদ্মার পাড়ের দিকে—পাড় ঘেঁষে ষ্টীমার চলেছে। সবসময়ই পদ্মা পাড় ভেঙে চলেছে—গ্রাম ভেঙে, ক্ষেত ভেঙে, বাড়িঘর মন্দির-মসজিদ ভেঙে চলেছে। একটি চাষী কি তার ভাঙা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠেনা ভেঙে গেল বলে? কিন্তু তাতে কার কি হয়? একটুও ঘুরপাক খায়না পদ্মার জল—সময়ের গায়ে টোল পড়েনা একটুও।

"তোমার চা এসেছে—আলম।" মুখ ফিরিয়ে মিহির দেখতে পেল আলমও আরেকদিকে পদ্মার নিঃসীম মরুভূমিতে চোখ পেতে রেখেছে।

ফাইলের গাদা জমে যাচ্ছে—ফাঁকি দিচ্ছনা তবু ফাঁকিতে পড়ে যাচ্ছ—একদম মন নষ্ট হয়ে গেছে। ওদিকে স্ত্রী ভুগছেন—একটা এক্স-রে করানো দরকার—যেতে হবে কলকাতা। বর্ডারের হাঙ্গামা শুনে ভয় পেয়ে গেছেন উনি! আর বলো কেন!"

"ঝগড়া-ঝাটির বিপদই তা-ই, মনে একটা সন্দেহ কায়েম হয় যায়।"

"তোমরা চলে যাচ্ছ এখান থেকে—আমরা চলে আসছি ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ন থেকে—আল্লা, কোথায় যাচ্ছি আমরা! কোন জাহান্নামে!"

চা-টুকু খেয়ে নিয়ে হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে রইল মিহির।

"সিগারেট নাও—" অতিথিপরায়ণের ব্যস্ততা ফুটে উঠল আলমের চোখে।

"খাইনা।"

"সে কি? তামাম দুনিয়া টহল দিয়ে বেড়াও—ঠোঁটে সিগারেটটিও লাগাওনি?"

"সিগারেটই শুধু লাগাইনি—" ত্বরিত হাসিতে চোখ সরু করে তুলল মিহির।

"তাই না কি?" আলম হাসিতে ফেটে পড়ল।

বেশ জোরে হাসতে পারে আলম—সুন্দর। ব্যথার দাগ আছে মনের উপর, মধ্যবিত্ত মগজে অস্বস্তির পোকাও ঢুকে গেছে তবু যেন পেশীতন্তুগুলো হাসির আগ্রহ হারিয়ে ফেলেনি। আর কিছু কি দরকার আছে—? এ-ক্ষমতাটুকু দিয়েই কি বিষণ্ণ জীবনকে পেছনে হটিয়ে দেওয়া যায়না? যদি এরা গড়ে ওঠে একদিন, দেহের সুস্থতার জন্যেই হয়ত গড়ে উঠবে।

"জন্মভূমিতে বেড়াতে এলে তাহলে, মিহির—" আলম সিগারেটে মন দিলে।

"মানুষ ত কতোবারই জন্ম নেয়—আরেকবার জন্ম নিতে এলাম !"

"হিন্দু ফিলসফিটা বেশ। কবিতার মতো।"

"ফিলসফি নয়। আমরা সবসময়ই নূতন হয়ে উঠছি না কি ?"

"আরেকরকম হয়ে উঠছি।"

"বেশ তাই। হচ্ছি ত ?"

"তোমার দাদা আছেন বাড়িতে না ? সহর ছেড়ে সব হিন্দু চলে গেলেও ও-ভদ্রলোক যাবেন না।"

"আমিও যেতাম না। কিন্তু চাকরি-বাকরি ত তোমরা দেবেনা কিছু।"

"কম মাইনেতে অসুবিধে সয়ে তোমরাও বা চাকরি করবে কেন ?"

"চাকরির মতো অসুবিধেগুলোও মধ্যবিত্তের ধাতস্থ।"

"মধ্যবিত্তকে কি এতো গোবেচারী মনে ভাবা যায় আর মিহির ? আমাদের দেশে ওরাইত সব, লীগ-কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট ! ওরাই বড়লোক হতে চায়—বড়লোকদের ঈর্ষা করে।"

"আমাদের দেশের পলিটিক্সের মেরুদণ্ডই ঈর্ষা—ভেতরের তাগিদে পলিটিক্স না জন্মালে তার এ-চেহারাই হয়।"

"কিন্তু তুমি পলিটিক্সে কি করে ভিড়লে—আমি ভেবেছিলাম কলকাতা গিয়ে ব্যবসা-ট্যাবসা করবে !"

"একা কেউ ব্যবসায়ী হতে পারে আলম ?—সমস্ত দেশের মন ব্যবসায়ী হয়ে উঠলে তবে আমাদের মতো লোক সেখানে পা বাড়াতে পারে। দেশ পলিটিক্স করছে—সোজা রাস্তা সামনে ওটাই খোলা ছিল, হেঁটে গেছি !"

"জেল-টেলও হয়েছে তাহলে !"

"তেমন গভীরে যেতে পারিনি—ইলিশিয়াম রো পর্য্যন্তই।"

"এবার বে-থা কর। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছ—নূতন জন্ম নাও—" আন্তরিকতায় গাঢ় হয়ে উঠল আলম।

"নূতন জন্ম!" মিহির ঘাড় নাড়তে লাগল: "বামুনদের দ্বিজ বলে, জানোত আলম—এবার হয়ত সত্যি তা-ই হব।"

"স্বাধীন দেশের নাগরিক !" সহজ ব্যাখ্যায় খুসী-খুসী শোনাল আলমের গলা। সিগারেটের ধোঁয়ার মতোই একটা পাতলা হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর সমস্ত মুখে।

মিহিরও চুপচাপ হেসে চল্‌ল—কিন্তু তার মনে হচ্ছিল এ হাসির ভেতরে আরেকটা হাসি আছে। তা হয়ত ফাঁকি নয়, ফাঁকি হতে গেলে তার রক্তমাংস মেরুমজ্জা সবই ফাঁকা হাসিতে মিলিয়ে যাবে।

২

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়াতেই হয়ত শম্পার এমন মনে হল। মনে হল, চোখের কাছে এখন মা-বাবা দাদা-বৌদি সবাইকে পাওয়া যাবে। সেই মানুষগুলোকেই পাওয়া যাবে একদিন যাঁরা তার স্বজন ছিলেন আর এখন যাঁদের সঙ্গে তার সৌজন্য ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ নেই। হাড়ের মতো নিরেট, জমাট হয়ে গেছে ওঁদের মন, কেউ তাকে আর আঘাত করতে চাননা। ওঁদের সব কিছু সয়ে যাওয়াটা কেমন একটা বিশ্রী খট্‌খটে হাসির মতোই শোনায়। সেই নিঃসঙ্গ জনতায় জেগে উঠেছে শম্পা, ভেবেছিল। উঠে এখন স্নান করতে যেতে হবে—ফালি বারান্দাটুকুতে দাঁড়িয়ে

চুল শুকোবে খানিকক্ষণ—ঘরের ভেতর বাবা চুপচাপ খবরের কাগজ দেখে যাচ্ছেন, ও-ঘরের জানালায় দাদার মুখ দেখা যায়, শেভ করছেন। বৌদি আর মা নীচে রান্নাঘরের ভেতর-বাইর আগলে আছেন। দাদার অপিস ক'টায় তার জানা নেই—কিন্তু কাঁটায়-কাঁটায় ন'টাতে গিয়ে শম্পাকে ট্র্যামষ্টপে দাঁড়াতে হয়, তখনও ভীড় আছে ট্র্যামে, তবে একটা-দুটো ট্র্যাম ছেড়ে দেওয়ার সময় থাকে। সাড়ে ন'টায় টেবিলের সামনে শম্পাকে অপিসের দারোয়ানরা দেখতে পাবেই। ঘড়ির-কাঁটার মতো অপিসের দারোয়ান, কেরাণী, অফিসরদের চোখের উপর ঘুরে বেড়াক শম্পা—দাদা-বাবা-মা কেউ তা চাননি, কেবল ছোড়দা চাইতেন। বৌদি এক-আধদিন ঠাট্টা করতে সাহস করেন: "তোমার অপিসে কি ঘড়ির দরকার আছে, টুলু?" সময় নিয়ে ছেলেমানষি কেন করেনা শম্পা—এ অভিযোগটাই হয়ত ওঁদের খুঁচিয়ে দেয়! শুধু সময় নিয়ে কেন, সব কিছু নিয়েই ছেলেমানষি করতে জানে শম্পা কিন্তু তোমরা কি তাকে ছেলেমানষি করতে দাও? তোমরা কি জানো ঘুম ভেঙেও যে সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে?—তার যে ইচ্ছে করে ওই পার্কের দোলনায় গিয়ে বাচ্চাগুলোকে দোল দিতে! চেঁচিয়ে গানও গাইতে পারে সে কিন্তু তোমরা আঁৎকে উঠ্‌বে! গল্প শুনে অবাক হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে সুরু করবে এখনও তার মন, কিন্তু কেউ কি তোমরা গল্প বল্‌তে চাও তার কাছে? দাদা জিজ্ঞেস করবেন: "তোমাদের অপিসে ষ্ট্রাইক হবে না কি?" ধর্ম্মঘট নিয়ে তর্ক চলবে হয়ত পাঁচমিনিট। অপিসের একটি বিষণ্ণ মুখ হয়ত তাকিয়ে থাকবে তার দিকে—ডেকে যদি নাও তাকে, দেখবে ভাঁড়ামি সুরু হবে তার! তার চেয়ে বরাবর ওর বিষণ্ণ

থাকাই ভালো। কেউ কাউকে আমরা ব্যবহার করতে জানিনে—কোনো জিনিষ ব্যবহার করতে পারিনে। কোথায় যেন একটা খিঁচ রয়ে গেছে। ছোড়দারই আরেক বন্ধু—এখন হয়ত মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখ্ছেন—তখন চিঠি দিয়েছিল শম্পাকে : "ভয় পেয়োনা, আজকের দিনের প্রেম মরুশিখার মতো। মশাল হাতে নিয়ে আমরা একসঙ্গে দাঁড়াব মাত্র ......" কানে ভালোই লেগেছিল কথাগুলো—পা-ও এগোতে চেয়েছিল মগজের পরামর্শে কিন্তু মন পেছিয়ে পড়ল। বুকে হাত দিয়ে দেখেছিল শম্পা, তেতে ওঠেনি বুক। আশ্চর্য্য, অনেকে কি করে যেন মগজেই ধরে রাখতে পারে ভালোবাসাটাকে। অনেক মেয়ে। সারাজীবন বৈধব্য নিয়েও ত কাটায় কেউ-কেউ, ঠিক তেম্নি। আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন! স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস মায়াদি—কলেজে পড়বার সময় একটি ছেলের সঙ্গে না কি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন! তা নিয়ে ঘরে-বাইরে অনেক কাদা ছিঁটাছিঁটি হল—ছেলেটি বিদেশে চলে গেছে আর আসেনি, না কি আত্মহত্যা করেছে ঠিক বলতে পারবেনা শম্পা। মায়াদি আর বিয়ে করেননি। গল্পটা যেদিন শম্পা শুনতে পেয়েছিল সেদিন থেকে মায়াদির বিষণ্ণ হাসির আড়ালে একটা সাদা দীপশিখা যেন দেখতে পেত সে : আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন! কার কাছে এ দুঃখ নিবেদন করে যাচ্ছেন মায়াদি? আমাদের কাছেই নয় কি? আমরা যেন না জীবনকে এম্নি পরাজয়ের মালা পরিয়ে দিই—মায়াদির জীবন কি তা-ই বলতে চাচ্ছেনা? এম্নি আরো কতো মায়াদি ঘরের বাঁধনকে ব্যর্থ করেছেন নিজেকে উপোসী করে তুলে!—কঙ্কালের গায়ে বাঁধন আলগা হয়ে

যাবেই ত! ত্যাগ। ওঁদের ওই ত্যাগই আমাদের পথ দেখাচ্ছে। গায়ে তোমার একটু কাদা লাগতই না-হয় মায়াদি, তোমার প্রেমের গায়ে ত তাতে কাদা লাগতনা! প্রেমকে বাঁচাতে পারলেনা তুমি। প্রেম বলতে আজ তোমার মগজে কেবল কতগুলো আঁকিবুকি, কতগুলো কথা আর শব্দ। প্রেমের খোলসটাকে কেউ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, কেউ প্রেমের আরকটুকু হোমিওপ্যাথি-অষুধের শিশিতে তুলে রাখে। এই আরক খেয়ে তোমার সূক্ষ্ম শরীর ঠাণ্ডা হয় সত্যি কিন্তু বাইরে আজও ত তোমার একটা স্থূল শরীর আছে।

আজ যে মিহিরদার সঙ্গে কলকাতা থেকে তিনশ মাইল দূরে চলে যাচ্ছে শম্পা তাতে ত তার বাড়ির হাড়গুলো ভূকম্পের দোলায় খট্‌খট্ করে নড়ে উঠতে পারে—কাদা ছিঁটোতে পারে দূরাত্মীয়রা—বন্ধুবান্ধবরা ঈর্ষা ঢাকতে পিউরিটান হয়ে উঠতে পারে। মা ব্যথা পাবেন, বাবা ব্যথা পাবেন, এসব ভাবনার শেষেও একটা কথা থাকে মায়াদি—আমাদের অন্তরাত্মাও ব্যথা পেতে জানে, তাকে ব্যথা দেবার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের পিতামহরা লুকোচুরি করেছেন, এঁচোড় চিবিয়ে মাংস খাবার লালা সম্বরণ করেছেন।—তোমাদের অবশ্যি লুকোচুরি নেই, নিরেট ইণ্টেলেকচুয়্যাল তোমরা কিম্বা সুপবিত্র ইমোশন্যাল কিন্তু তা-ই কি জীবন? কি যেন হারিয়ে গেছে জীবন থেকে, মনে হয়না তোমাদের? তোমাদের কাছে যখন আমার শিক্ষা, ইমোশনকে বেছে নিয়েই আমার ছেলেবেলা কেটেছে। মা কিছু বললে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম—বড়দার অবহেলায় মরে যেতে ইচ্ছে করত, দিদিরা আমার বয়েসের অপমান করতেন, থার্ড ক্লাশে পড়বার সময়ই শাড়ি পরবার প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন—শুনে

কি যে মনে হতে লাগল আমার, দেখলাম কান্না ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। ছোড়দা—শুধু ছোড়দা আমায় ও-দশায় পেলে কেমন যেন কালো হয়ে যেতেন, বলতেন: "তোর চোখ খারাপ হয়ে যাবে দেখিস্!" আজ আর আমার সে-কান্না নেই—কেউ আর পারবেনা আমায় কাঁদাতে। সাহস করে সবকিছুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, মায়াদি। নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই যদি সাহস দেখাতে না পারি, তাহলে কোথায় কোন্ বক্তৃতামঞ্চে উঠে চেঁচিয়ে এলাম, ট্রেনে-ষ্টীমারে কুলির বা ক্রুম্যানের সঙ্গে ঝকাঝকি করলাম, কি কমিটিমীটিং-এ বুকনিতে মেম্বরদের তাক লাগিয়ে দিলাম—তাতে কিছু যায় আসেনা। নিজের বেলায় সাহস দেখানোটাই বড় জিনিষ—নিজের অন্ধকারকে বাইরে টেনে আনার সাহসই সবচেয়ে বড়। মনের একটা দিক নিয়ে বাঁচতে সুরু করে লাভ কি মায়াদি—সবদিক নিয়ে বাঁচাই কি সত্যিকারের বাঁচা নয়?

ছোট্ট কেবিনটাতে হাওয়ার টুকরো এসে ঢুকছে—গুড়িগুড়ি হাওয়া, তবু কি উদ্দাম। পদ্মার হাওয়া বলেই কি? মার কাছে পদ্মার গল্প শুনেছে শম্পা ছোটবেলায়। ভাঙনের গল্প—বানের গল্প—জলের গল্প। ভয় পেতেন না তাঁরা একটুও—সব সময় চোখের উপর দেখছে যাকে তাকে কি ভয় করে? কিন্তু সে-সাহসী মেয়ে বড় হয়ে যখন শম্পার মা হলেন তখন আর কোথায় সে-সাহস তাঁর? একটি দিনের জন্যেও মাকে সাহসী হতে দেখেনি শম্পা। বাবার অন্যায়কেও অকাতরে সয়ে গেছেন। হাইকোর্টের উকীল বলে যেন বাবার অন্যায়গুলোরও যুক্তি ছিল! অন্ততঃ মা তা-ই মনে করতেন। অন্যায়ের জন্যে বাবাকে মাথা নোয়াতে হয়নি, মা-ই অন্যায়ের কাছে মাথা নুইয়েছেন। এতো জোর কোথায় পেয়েছিলেন বাবা?

বিয়ের কয়েকটা মন্ত্রের বাঁধনেইত! ছোড়দা অবশ্যি বলতেন: 'মার ইকনমিক ডিপেণ্ডেন্স থেকে।' ও ত একটা সাধারণ প্রকাশ্য সত্য। কিন্তু শক্ত বাঁধন ওতে দেওয়া চলেনা—ও-বাঁধনও ছিঁড়তে পারে মর‍্যালিটির অদৃশ্য বাঁধন না থাকলে! মনের যে অন্ধকারে মর‍্যালিটির জন্ম, দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রের বিভীষিকা সে অন্ধকারে গিয়েই পৌঁছয়। মনের উপরতলা নিয়েই ইকনমিক্সের কারবার, নীচেকার মাটির জন্যে ম্যাজিক চাই, মন্ত্র চাই, কবিতা চাই।

কিন্তু মিহিরদা কোথায়? ঘোরাঘুরি করতে বেরিয়েছেন! ওর ঘুম হবেনা—কেমন যেন অন্যমনস্ক—জানে শম্পা। শম্পার কি পরিচয় দেবে দাদার কাছে—সমস্যাটা ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আসছে! মিহির নিজে থেকেই বলেছে অনেকদিন--স্ত্রী কথাটায় তাঁর জিভে না কি হুল ফুটতে থাকে—বান্ধবী কথাটাও না কি এমন আধুনিক যে সেকেলে মনে হয়। শম্পা চুপ করে হাসতে সুরু করে—মিহির নিজে-নিজেই কথা কাটাকাটি করুক।

মিহিরদাকে কেন সে ভালোবাসল? কেন তা বলতে পারবেনা। ক্লোরিন গ্যাসের অ্যাটম কি করে ক্যালসিয়াম অ্যাটম্‌কে খুঁজে নেয়—কেন তৈরী হয় লবণের একটি স্ফটিক, তা কি বলতে পারে কেউ? খুঁজে নিয়ে জড়িয়ে ধরে তা-ই আমরা জানি। ছোড়দার চেয়ে বয়েসে ঢের বড় অথচ তাঁর বন্ধু—শুনে কেমন অদ্ভুত লাগছিল শম্পার। "মিহিরদাও বলেন—" ছোড়দার সব কথারই ভণিতা সুরু হত এ-ভাবে। মানুষটাকে তাই দেখতে ইচ্ছা করত তার। নিশ্চয়ই তিনি ছোড়দার আর-আর বন্ধুর মতো নন—তাঁর কথায়ই মনে হত। দাদার বিয়ে উপলক্ষে মিহিরদাকে প্রথম সে দেখতে পেল—ছোড়দার মাননীয় অতিথি মিহিরদা এলেন তাদের বাড়িতে। অন্যমনস্ক একটা লোক—

পাতলা ঠোঁট, টিকলো নাক, চকচক করছে চোখের তারা! এম্নি কোনো মুখ শম্পার মনে কি আঁকা হয়েছিল কোনোদিন—মনে পড়ে, যেন আঁকতে চেয়েছিল সে, যখন ছোড়দার মুখে মিহিরদার নাম শোনেনি তখনও। সবই পুরুষের মতো, তবু যেন মুখে কোথায় মেয়েলি ছাঁদ আছে—মেয়ের মনের আঁকা বলেই হয়ত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সত্যিকারের মানুষের মুখে—পুরুষের মুখে সে মেয়েলি ছাঁদ কি করে এলো? চমকে উঠেছিল শম্পা—কাঁপতে সুরু করেছিল তার বুক। ছাদে উঠে গিয়ে সামিয়ানার নীচে খামকা সে খানিকক্ষণ পায়চারি করে এলো। ছোড়দা ডাকবেন না কি তাকে মিহিরদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে? ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে কি বল্‌বে শম্পা—বলতে পারবে কি কোনো কথা? ছোড়দা হয়ত অবাক হয়ে যাবেন যখন দেখা যাবে টুলু বোবা হয়ে গেছে! যাক্, কথা বলতে তাকে হয়নি সেদিন—মিহিরদা চলে গেলেন, কিছুই খেলেননা একটি মিঠে পান ছাড়া। "খেলেন না কেন উনি ছোড়দা",—শম্পাকে কৌতূহলে হাল্কা করে তুলতে হল গলা। "এ ধরণের বিয়ের সঙ্গে ওঁর অসহযোগিতা—আসতেনই না—অনেক বলে-কয়ে তবে রাজি করেছিলাম।" "ব্বাবা—" শম্পা চলে এসেছিল তার বন্ধুদের জটলায়। কিন্তু জটলায় ঠিক জমতে পারলনা। কে-কে বিয়ের জন্যে তিল-তিল করে তৈরী হয়ে চলেছে তারই রসাল বর্ণনা করছিল লীলা—শম্পাকে দেখেই ও লুফে নিলে: "তোর হাসি এতো সুন্দর কেন জানিস্—গলার গ্ল্যাণ্ডগুলো তোর সুপুষ্ট হয়ে গেছে—এবার তোর বিয়ে হওয়া উচিত!" শম্পা কেমন যেন কালো হয়ে গেল—ধারাল হয়ে জবাব দিতে পারলনা—অলকা জানলা থেকে দু'পা এগিয়ে এসে বলেছিল: "রাস্তায়-রাস্তায় মোড়ে-মোড়ে ছেলেগুলো যে ঘোরাঘুরি করে মরে, তাদের গিয়ে তুই বিয়ের

প্রেস্‌ক্রিপশন দিতে পারিসনে ?" "সবাইকে ? আমি একা ?" ভয়ার্ত্ত হয়ে উঠ্‌ল লীলার গলা। হাসির ফুলঝুরি ফুটল ঘরে।

ঘুম ভেঙেছে কিনা জানেনা বলেই মিহির পা-টিপে এসে কেবিনে ঢুকল। পেছন ফিরে তাকিয়েই শম্পা খিলখিল করে হেসে উঠ্‌ল— উঠে পা ঝুলিয়ে বসল।

"ছোট্ট পৃথিবীটা ঘুরে দেখে এলাম—" পাশের বিছানায় বসল মিহির।

"বাঃ—আমায় ডাকলেনা—"

"ঘুমুচ্ছিলে—ঘুম নষ্ট করে দেখবার মতো কিছু নেই—"

"তাহলে তুমি ঘুমোলেনা কেন ?" অবুঝ আব্দার ফুটে উঠল শম্পার গলায়—ঠোঁটে ঢেউ ভাঙতে লাগল।

"বুড়ো মানুষদের ঘুম কম—তা জানোনা বুঝি ?" মিহির একটি খুকীর কাছে গল্প বলছে।

"ঈস্‌ বুড়ো সাজবার কী সখ !"

"বুড়োর পার্ট সত্যি করেছি দু'বার—" মিহির ভ্রমসংশোধন করতে চাইল।

"দুবার নয়, তিনবার হচ্ছে—"

ছোট একটি হাসিতে হজম করে নিতে হল শম্পার কথা। আরেক কথায় আরেক দৃশ্য সুরু করতে হ'ল মিহিরকে: "ছোটবেলাকার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—শাহ আলম !"

"ও"—একটু যেন সংযত হয়ে পড়ল শম্পা—নিজেকে একটু গুছিয়ে নিল। যেন শাহ আলম দোরের ও-পাশে অপেক্ষা করছেন, এক্ষুণি একটি নমস্কার তুলে এসে সামনে দাঁড়াবেন।

"তোমার মতোই আলম—গান্ধীজির হত্যার খবর পেয়ে উপোস

করেছিল!"

"ওঁর সঙ্গে খানিকটা পলিটিক্স করে এলে বুঝি?"

"পলিটিক্স আমি করিনে—বলেইছি ত আর করবনা।"

"কিন্তু কম্বল কি তোমায় ছাড়বে?"

"বাবা পুলিশের চাকরি ছেড়েছিলেন—কাজেই আমাকেও পলিটিক্স ছাড়তে হবে!"

"কিন্তু থিয়োরীগুলো কখ্খনো ছাড়বেনা তোমায়—বাবা পুলিশ হলে ছেলে পলিটিক্স করবে এ-থিয়োরী তোমারই শুধু আর কারো নয়।"

"ল'-এণ্ড-অর্ডার বহাল রাখতে যিনি মাথা ঘামান, তাঁর মাথা ল'-এণ্ড-অর্ডার ভাঙবার জন্যেও ভেতরে-ভেতরে ঘামতে থাকে—তবে নিজে হয়ত তিনি তা করতে পারেন না, ছেলেকে এসে তা করতে হয়।"

"পিতৃঋণ?" হাসতে সুরু করে শম্পা।

"তা-ই।"

"ঢের অবসর থাকলে আকাশ-পাতাল এমন অনেক কথাই ভাবা যায়।" মনে হয় শম্পাও যেন একটু অবসর নিয়ে ভাবনাগুলোকে আকাশে ছেড়ে দিতে চায়।

আবার আরেকটি দৃশ্যের উপর যবনিকা তুলতে হয় মিহিরকে: "জানো টুলু, আমাকে দেখলে দাদা অবাক হয়ে যাবেন—"

"না, আমাকে দেখলে।"

"তুমিও অবাক হবে দাদাকে দেখলে।"

"কেন?"

"আমরা কেউ কারো মতো নই।"

"কেউ আবার হুবহু কারো মতো হয় না কি?"

"হয়না, তবু মনে ত হয়।"

"মনে হয়, তারপর ভুল ভেঙে যায়।"

মিহির অস্বস্তি বোধ করে। কেন এমন হচ্ছে? শম্পার সঙ্গে তার কথাগুলো বাঁক নিয়ে এমন বাঁকা পথে চলে যাচ্ছে কেন? কেন সে ওকে ফেলে বাইরে ঘুরে আসতে গেল! চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারতনা কি বিছানায় — শম্পা চোখ মেলেই দেখতে পেতো তাকে—তারপর অস্পষ্ট ঠোঁটে হয়ত তাকে যেতে বলত ওখানে, ওর পাশে—হয়ত আব্দার করত : আমার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দাও! আজও মিহির নিজেকে তৈরী করে নিতে পারছে না শম্পার এম্নি অসংখ্য, অজস্র ছোটখাট মুহূর্ত্তের জন্যে! গত পনেরো বছরের রূঢ়তার শিক্ষা তাকে অন্য দিকে টেনে নেয়। নিজেকেই যদি সম্পূর্ণ ভেঙে না নিতে পারল নূতন করে কি তৈরী করবে সে? লক্ষ্যহীন যৌবনের উত্তরাধিকার নিয়ে যদি তার প্রৌঢ়তা তৈরী হয়, ব্যর্থ দুর্ব্বলতা ছাড়া সেখানে আর কি থাকবে? আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, স্বপ্নে, শপথে খানিকটা যৌবন তৈরী হোক ত আগে—প্রৌঢ়তার প্রভাতের আগে যৌবনের খানিকটা উজ্জ্বল রাত্রি তৈরী হোক। অনেক অভিনয়ের শেষে এ সত্য অভিনয়টুকু কি সে করতে পারবে না? একটি ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়তে পারবেনা আরেকটি ঢেউ-এর গায়ে—তারপর এম্নি লক্ষ্মী জল, শরতের পদ্মার মতো — অনেক দূরে ছড়িয়ে আকাশের সঙ্গে মিশে থাকা জল!

কপাল থেকে বারবার চুল সরিয়ে নিচ্ছিল শম্পা— ভ্যান্ গগের আঁকা মেঘ পদ্মার দিগন্তে — সেদিকেই যেন তাকিয়েছিল ও :

"ভুল ভেঙে যায় কেন, মিতুদা, বলতে পারো? তা থাকলেও বা কি ক্ষতি?"

"থাকলে ক্ষতি নেই—আর যতদিন তা থাকে ততদিন ত তা ভুলও নয়।"

"দীপ্তি বলে আমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়ত—হষ্টেলে থাকত। তার মানে হষ্টেলে থাকতনা প্রায়ই—বানিয়ে-বানিয়ে আত্মীয়স্বজনের নাম বলত, ওদের বাড়িতে না কি যায়। আমরা জানতাম কোথায় কোন রেষ্টুরেণ্টে, বোটানিক্যালে, যশোর রোডে, সিনেমায় ও যাচ্ছে! কি রকম হয়ে যাচ্ছিল যে ওর চোখ-মুখ চেহারা—তবু যেতো। হষ্টেলে ফিরে এসে না কি একেক দিন ছাদে গিয়ে কাঁদত। ওকে ভালো লাগতনা কিন্তু তাকালে কষ্ট হত আমার।" শম্পা অন্যমনস্ক হয়ে চলল: "ও পলিটিক্যাল দলে গেছে, টেলিফোনে চাকরি করেছে—ওআক্-আই হতে চেয়েছিল, একই কারণে। জানিনে এখন ও কোথায়। প্রথম-প্রথম হয়ত ভুল ভেঙে যেত ওর, তাই কাঁদত। তারপর আর ভাঙেনি।"

"তারও পরে যদি ভেঙে থাকে, তাহলে ভাবতে পারো কি অবস্থা ওর?" কেমন যেন প্রশান্ত শোনাল মিহিরের গলা।

"দেখতে পাবে আমরা যেমন মুখটিপে হাসতাম, সবাই আজ ওর দিকে তাকিয়ে তেম্নি করে হাসছে—এইত! কিন্তু কেন আমরা হাসতাম, কেন মুখটিপে হাসাহাসি করবে আজ সবাই, বলতে পারো, মিতুদা? কেন?"

কেন! তার উত্তর কি মিহিরকে দিতে হবে! মিহির দেবে সে-উত্তর!

"মানুষ যা করতে পারে তা নিয়ে মানুষই আবার হাসাহাসি করে কেন?" মিহিরের দিকে তাকাল শম্পা—ঘুম ভেঙেই তাকাল যেন—চোখের উপর চোখের ছায়া ফেলে যেন তাকে ডাকল, যেন বল্‌লে: পাশে এসে বোসো—

তিন

১

ষ্টীমার-ঘাট থেকে রাত নটায় ট্রেন ছাড়ে—অনেক অন্ধকার সাঁতরে এসে সহরের ষ্টেশনের আলোতে বারোটায় পৌঁছয় ট্রেন। মাঝে একটি জংশনের সোরগোলে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে, ঝিমোতে হয়। নইলে শুধু ছোটা—প্রাণপনে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটা। জোনাকির আকাশ ভেঙে, গাছগুলোর জটলা ভেঙে, অন্ধকার ভেঙে পরিচিত কোনো আলোর দিকে ছুটে চলছে যেন একটি বিরাট প্রাণ। রাত্রির ট্রেনে কোথাও যেতে থাকলে মিহির নিজেকে কেমন অসহায় বোধ করে—সেই বিরাট প্রাণের কোটরে সে যেন একটি নির্জীব জড় কণা। দেহে একটি গতি বহন করা ছাড়া আর কিছু তার করবার নেই — কারো সঙ্গে কথা বলতে গেলেও কেমন যেন হঠাৎ কথা ফুরিয়ে যায়—চুপ করে গিয়ে চাকার শব্দ আর হাওয়ার শব্দ শুনতে হয়—অন্ধকারে ডুবে যেতে হয়।

কিন্তু আজ ন'টার আগেই তৃতীয়ার চাঁদ উঠ্‌ছিল। চাঁদ যে উঠ্‌বে ভুলেই গিয়েছিল মিহির। অথচ ভোলা উচিত ছিলনা। দু'দিন আগে শম্পাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিচ্ছিল সে ঠিক সন্ধ্যায়—বিবেকানন্দ রোডে চাঁদ উঠ্‌ছিল তখন। ওদের মুখোমুখি চাঁদ উঠ্‌ছিল। "কলকাতার আর কোনো রাস্তায় এমন চাঁদ-ওঠা পাবেনা, জানো?"—শম্পা বলেছিল তাকে। সত্যি, কতো বড় মধুবর্ণ চাঁদ। চাঁদের খবর মিহির কোনোদিন রাখেনি—শম্পার কথায়

মনে হয়েছিল কেন সে চাঁদের খবর রাখেনি আগে! আজকের চাঁদ আরেক রকম—জলের দেশের নীলচে চাঁদ। অনেক চেনা-চেনা মনে হল মিহিরের কাছে—মনে হল শিউলি ফুলের গন্ধ পাচ্ছে সে, ছেলেবেলাকার গন্ধ। বিবেকানন্দ রোড-কে একটা ধূসর স্মৃতি বলে মনে হয়—কনট্ সার্কাস ত কুতুবের পাশাপাশি চলে গেছে। স্থুরু-টা ঘুরে এসে যেন তার চোখের উপর দাঁড়াল! এই মেঘনার বাঁক, গাছের ভীড়ে গাঁয়ের ছবি, পোকা-ধরা ষ্টেশনের আলো, তারপর চল্লিশ মাইল অন্ধকার, পাহাড়ের ছায়া, মাঝে-মাঝে ঝিলের জলের ঝকমকি, ধান-সায়র, তারপর সেগুনের সারি—লাল স্থুরকি—তাদের সহর! এদের কি খুব ভালোবাসত মিহির? নইলে জীবনের পনেরোটা বছর ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে কেন তার—শুধু সেখান থেকে উঠে এসেছে একটি অনুভব—তাঁর অনুভবেরই মতো শম্পা। সেই পনেরো বছরের যোগফলে মিহির কি মিতুর ভবিষ্যৎ তৈরী করতে পেরেছে? সে তৈরী করতে চেয়েছিল মুক্তি—নিজেকে সংস্কারের নাগপাশ থেকে, পরিবারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে এনে নগ্ন আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বলতে চেয়েছিলঃ আমি মুক্ত। মিহিরেরই নিজের হাতে তৈরী সেই বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ মুক্তির মূর্ত্তি—মিতু তা চায়নি, কল্পনা করেনি, তার দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেনি। তাই আজ পনেরো বছরের সেই প্রাচীন মূর্ত্তি এতো সহজে ভেঙে গেল—মিতুর ছেলেমানষির কাছে হার মেনে গেলে প্রৌঢ় মিহির। মিতু হয়ত শম্পাকেই খুঁজে চলেছে—তার পুতুলের মুখে, সাতভাইচম্পার বোন পারুলের মুখে, অভিমন্যুর উত্তরার মুখে, ক্লিওপাট্রার মুখে, ভ্রমর-পার্ব্বতী, বিয়াত্রিচে-ওফেলিয়ার মুখে। শম্পা। ঠিক শম্পার মতো

ওরা সবাই তাকিয়েছে মিতুর মুখের দিকে, মনে পড়ে মিহিরের। আর কেউ নয়, স্থপর্ণা নয়—মিতুর সঙ্গে স্থপর্ণার পরিচয় ছিলনা, মিহিরের আত্মীয় ছিল সে, তাই তার মূর্তিও ভেঙে গেল। পনেরো বছরের একটি রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—দাঁড়িয়ে রইল একটি ছেলে তার পুরোনো নদী, পাহাড়, গাছ, মাঠ, আকাশ আর জ্যোৎস্না নিয়ে। ও ছিল—সবসময়ই ছিল মিহিরের সত্তায়, ওর বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি মিহির, ওকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি তার রাজত্ব থেকে। কেউ তা পারেনা। প্রথম চেতনাকে ভুলিয়ে ভ্রান্ত করে দিতে পারেনা অন্ত কোনো চেতনার চক্র।

In my beginning is my end—এতো বড় একটা মিথ্যা-ই কি শেষে সত্য হয়ে উঠল? কিছুই তার করবার নেই। কোনো মানে থাকবেনা বলেই কি জীবনে ধূলোকাদার দাগ লাগিয়েছিল মিহির? বুলুকে মুছতে মাকেও মুছে ফেলেছিল—তারপর দারিদ্র্য আর সাম্যবাদের তিমিরতপস্যা—স্থপর্ণার রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত—কী দগ্ধ দিন তারপর—শেষে সন্ধ্যা! সন্ধ্যার বীভৎস ছায়া—নিজেরই নিঃসঙ্গ ছায়া, তিতুকে যে আত্মহননের স্থড়ঙ্গপথে টেনে নিয়ে গেছে। দুর্ব্বল তিতু বাঁচতে পারেনি—কিন্তু তার চেয়েও বীভৎস ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে এসেছে মিহির। রয়টারের নিখিল সেনকে একদিন বলেছিল মিহির চৌধুরী: "বলতে পারিস ক'গ্লাস, ক'বোতল টেনে নিলে আমি এই টেবিলের উপরই মরে পড়ে থাকতে পারি!" মিহির চৌধুরীকে একটি মেয়ে বলেছিল: "তুমি বিকাশবাবুর সঙ্গে কেন আসো এখানে?" কেন আসে! একটি মেয়ের কাছে মিছিমিছি কেন আসে সে! তার চোখ কি ছিল বুলুর মতোই দেখতে—ঠোঁট স্থপর্ণার মতো? একদিন সে একা

ছিলনা, একথা ভাবতেই কি আসে মিহির?···তারপর সুপ্রিয়। উষার পৃথিবী ফিরে এসেছিল আবার। আবার তার জন্ম হল—এবার সিংহরাশিতে জন্ম—বুকের নীচে সাহস কেশর ফুলিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সুপ্রিয় আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল হঠাৎ, মিহির বুঝতে পারেনি লগ্ন এসেছে কি না। বুঝতে কি পারত সে? পারত ঝাঁপিয়ে পড়তে? হয়ত পারত। জীবনের সব ভয় কেনো এক মুহূর্তে হয়ত জয় করা যায়।

সেই প্রভাতের একটি ফুল ছাড়া সবই মুছে গেছে! জানলায় শম্পার পাশাপাশি মুখ রেখে তা-ই ভাবছিল মিহির।

"অনেকদিন মনে থাকবে তোমার বন্ধুকে—" অনেকক্ষণ চুপ থেকে এক-একটি কথা বলছিল শম্পা।

"আলমকে?"

"আত্মীয় হতে পারেন ভদ্রলোক।"

ভাগ্যকূলের ঘাটে যতক্ষণ ষ্টীমার দাঁড়িয়েছিল, আলম নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিল—মুখে তার সেই হাসি—যে-হাসিতে শম্পাকে প্রথম দেখে বলে উঠেছিল: "মিহির আমায় ফাঁকি দিয়েছিল!" ফাঁকির জটিলতা থেকে একমুহূর্তে সহজের মুক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে যেন একটি ছোট্ট ছেলে। দুঃখ নেই, গ্লানি নেই। অবশ্য মিহিরকেই প্রথম ফাঁকি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল—সে নিজে থেকেই শম্পাকে সঙ্গে নিয়ে আলমের খোঁজ করেছিল।

"আত্মীয় করতে পারেও ত কেউ-কেউ!" হাসতে লাগল মিহির।

"আ-হা, তুমি যেন পারোনা আর কি!"

"বোধহয় পারিনে!"

"ইস্পাতের তৈরী বলে নিজেকে সবাই ভাবে একসময়।"

"ভাবে,—না ?"

"হাসছ কেন ?"

"ভাবলে কিছু যায়-আসেনা ?"

"না।"

"ওটা পৌরুষ হল।"

"মেয়েদের তুমি ভারী চেনো!"

"একটি মেয়েকে ত চিনি!"

"তা-ও নয়। তুমি কতো কিছু ভাবো আমাকে—আমি তা কিচ্ছু নই। শেষে দেখতে পাবে কতো সাধারণ আমি!"

"সাধারণ বলে মেনে নিয়ে কি অসাধারণ বলে ভাবা যায়না ?"

"শেষটায় দুঃখ পাবে।"

"পাবনা। ওটাও আমার পণ।"

"সুপর্ণাকে নিয়ে দুঃখ পাওনি তুমি ?" ট্রেনের গতিতে চাঁদ আর অন্ধকারে শম্পার চুলগুলো গভীর কোনো সঙ্কেতের মতো মনে হচ্ছে—কথার শব্দগুলোতে মিহির শুনতে পাচ্ছে কোনো অশরীরী পাখীর গলা।

"বন্ধু পাওয়া যায়, বন্ধু হারিয়ে যায়—দুঃখ একটু হয় কিন্তু তা পাওয়া আর হারানোর মতোই সাময়িক—" মিহির মেধাবী হয়ে উঠ্‌তে চাইল।

"মেয়েরা কি বন্ধু হতে পারে ? বলেছি তো, মেয়েদের তুমি চেনোনা!"

"বন্ধু হবার পরও আরো কিছু চায়, না ? কিন্তু সুপর্ণা চাইতনা।"

"তুমি ত মেয়ে নও—সুপর্ণাকে কি করে বুঝবে!"

মিহিরের মনে হচ্ছিল কোথায় যেন সে হেরে গেছে। নিজের কাছে? সুপর্ণার কাছে? মেধাবী হতে গিয়েই সে হেরে গেল! ধরতে পারল না তার হৃদয়কে। হৃদয় কি ছিল সুপর্ণার, না সবটুকুই আদর্শ, যুক্তি, তর্ক!…"বিয়ের দাসত্ব পাপ, তা জানো মিহির? আমি ভাবতে পারিনে, এক-গা গয়না পেলেই মেয়েরা কি করে একজন পুরুষের দাসত্ব অম্লানবদনে স্বীকার করে নেয়! ভাবতেই আমার ঘৃণা হয়। স্বামী হওয়ার পাপে পুরুষদেরও ঘৃণা করতে ইচ্ছে করে!" ভালো লাগত সুপর্ণাকে। ভালো লাগত হয়ত মুক্তিকেই, সুপর্ণার শরীরের ঋজু রেখায় আকাশ ছুঁয়ে যেত যে-মুক্তি। "সুপর্ণা মুক্ত—" মনে-মনে বলে উঠত মিহির: "আমিও মুক্ত।" মুক্তিই চাই আমি—চাইতাম। কোথাও বন্ধন নেই তেমন একটা জীবন! কাজ থাকবে বন্ধন থাকবেনা—প্রেম থাকবে বন্ধন থাকবেনা তেমন একটা জগৎ। তৈরী করা যায় তা। হোয়াইট-ওয়ের আয়নায় নিজের উদ্ধত ছায়ার দিকে তাকিয়ে মিহির অনেকদিন ভেবেছে—সে-জগৎ তৈরী করে তুলছে সে মিনিটে-মিনিটে। জীর্ণ বেশবাসের আড়ালে ওই ছায়ার মতোই উদ্ধত মুক্তিতে হেঁটে চলেছে তার ভেতরে একটা মানুষ। কিন্তু সে-মানুষটা যে মুক্তি চায়না, সেদিন কি ভাবতে পেরেছিল মিহির? হয়ত সুপর্ণাও মুক্তি চায়নি—একটি বন্ধনের বেড় ছেড়ে আরেক রকম বন্ধনেই যেতে চেয়েছিল—তারই মতন। অবিকল তার মতন। অথচ কেউ কাউকে তারা বুঝতে পারেনি—মুক্তির একটা সাদা পর্দার এপাশে-ওপাশে থেকে কেউ কাউকে দেখতে পায়নি! আজ সে বুঝতে পারছে—পারছে কি?—তার হৃদয়ের মতো সুপর্ণারও একটি হৃদয় ছিল। সবারই তা থাকে—সব কথার শেষে, সব আদর্শের শেষে,

সব সংযমের শেষে একটি আশ্চর্য্য অনুভূতির জায়গা থাকে—সেখানে কতো অসহায়, কতো একা, কতো নম্রই না মানুষ! যৌবনের রৌদ্রের পর বিকেলের ছায়ায় বসে আজ মিহির তা বুঝতে পারছে! মনে হচ্ছে শম্পার কাছেও সে হেরে গেছে। ছোট্ট একটু মেয়ে টুলুর কাছে। মেধা হেরে গেল। সত্যি কি তা হেরে যাওয়া, না কি অন্য চেহারায় মেধাকে ফিরে পাওয়া? গভীরতায় ডুবে গিয়ে অন্য রকম হয়ে ওঠা নয় কি? একটি জীবনকে চারদিক থেকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ধরা—তার আলো আর অন্ধকার নিয়ে, প্রভাত আর সন্ধ্যা নিয়ে জড়িয়ে ধরা। একটি ঢেউ নিয়ে সমুদ্র নয়—একটি রঙ নিয়ে নয়—অনেক তার ঢেউ, তার রঙ বিচিত্র।

"হয়ত তোমাকেও বুঝতে পারেনি সুপর্ণা—ও ত' পুরুষ নয়!" মনে-মনে বলে উঠ্‌ল যেন শম্পা।

"তুমি?—" ভয় করতে লাগল মিহিরের।

"চিনতে পেরেছি কি! হয়ত আশ্চর্য্য মনে হয় তোমাকে---তাই—"

"তাই! কিন্তু—"

"তার বেশি কি দরকার! নিজেকেও কি চেনা যায় সবটুকু?" রাত্রি-ভাঙা পাখীর শব্দে হেসে উঠ্‌ল শম্পা।

চমকে উঠ্‌ল মিহির। অন্ধকার হয়ে উঠ্‌ছিল তার বুক, সেই অন্ধকারে চক্রান্ত করবার জন্যে রক্তকণাগুলো কালো হয়ে এসেছিল—ভাবছিল, হয়ত শম্পার কাছ থেকে সুপর্ণাকে লুকিয়ে ফেললেই ভালো হত, লুকিয়ে রাখলে ভালো হত তার অন্ধকার রাত্রিগুলো। কিন্তু মেয়েরা হয়ত তা জান্‌তে পারে, কি করে যেন জেনে

নেয়! তাই, শুধু তাই শম্পাকে মিহির তার আলো আর অন্ধকার সবটুকুই নিবেদন করেছিল। হাঁ, নিবেদন করেছিল! শুধু পুণ্য নয়, পাপও আমার নৈবেদ্য—ছাখো তুমি নিতে পারো কি না! কিন্তু এক মুহূর্ত্ত আগেই অন্যরকম ভাবছিল মিহির, তার মনে কে যেন এসে উঁকি দিয়ে বলতে সুরু করেছিল, ভালো করনি, ভালো করনি! শম্পার হাসিতে অন্ধকারের উপর আলো ছড়িয়ে পড়ল। মিহির চমকে উঠ্‌ল।

"তুমি যখন দিল্লীতে ছিলে—" আবার সেই অশরীরী পাখীর গলা—ট্রেনের মতো এতো তীব্রতায় নয়, একটা করুণ আর্ত্ততায় যা রাত্রিকে ভেঙে দিতে চায় তেম্নি—রাত্রির ভেতর থেকেই যেন শম্পার গলা শোনা গেল: "মনে হতো—কোথায় কতো দূরে তুমি চলে গেছ, বুঝি হারিয়ে গেছ! ভাবতাম বুঝি আমার উপর অভিমান করে হারিয়ে যেতেই চাও তুমি। ভাবতাম। কেন ভাবতাম জানিনে!"

"আমারও ভয় করত—কি করে তোমায় বল্‌ব—যদি সব ভেঙে যায়, যদি বলতে গিয়ে তা-ও হারিয়ে ফেলি যা পেয়েছি—তাই ভয় করত?" হারানোর ব্যথায় থমথমে হয়ে উঠ্‌ল মিহিরের গলা।

"কি করে তা হতে পারত—" শম্পা অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

"যদি হতো—"

"হতোনা।"

"শ্রদ্ধা করলেই তো সব কিছু হয়না—তুমি আমায় শ্রদ্ধা করতে!"

"ভালো না বাসলে কি শ্রদ্ধা করতে পারতাম—কোনো কাজই কি করতে পারে মেয়েরা ভালো না বেসে?"

পেছন থেকে আলো পড়ে কেমন যেন মনস্বিনীর মতো দেখাচ্ছিল শম্পাকে—অদ্ভুত সুন্দর! বিবেকানন্দ রোডে সেদিন যেম্নি সুন্দর

দেখিয়েছিল তার চেয়েও নিবিড় যেন ও এখন। শম্পা এতো সুন্দর হতে পারে? শুধু মিহিরের চোখেই নয়, সবার চোখেই আশ্চর্য্য সুন্দর দেখাবে শম্পার এই মুখ। কি করে বদলে গেল শম্পা—কি করে বদলে যেতে পারে? নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল মিহিরের—বয়েসের একটা অনিবার্য্য রূঢ়তা নিয়ে এ-সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি কি করে সে বসে আছে? শম্পার মুখের আয়নায় নিজেকে যেন সত্যি-সত্যি দেখতে পাচ্ছে সে এখন। বয়েসের থাবায় আঁচড়-কাটা মুখ—কপালে, নাকের দুপাশে, চোখের নীচে, ঠোঁটের ধার ঘিরে আঁচড়। বাতাবির খোসার মতো চামড়ার কোষগুলো উঁচু-উঁচু হয়ে উঠেছে। শম্পা কি ভয় পায়না? হিংস্রই কি দেখায় তাকে, না কি অসহায়? ছোট বেলাকার একা-একা থাকবার বিষণ্ণতা কি একটুও আর নেই মুখে? হয়ত আছে। কখন যে তা মুখে ভেসে ওঠে মিহির জানেনা। হয়ত শম্পা—শুধু শম্পাই তা দেখতে পেয়েছে—মুখভার অভিমানী একটি ছেলেকে দেখতে পেয়েছে। তাকেই ভালোবেসেছে শম্পা, তার মুখের দিকেই এখন তাকিয়ে আছে।

শম্পা মিহিরের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল— আশ্বস্ত হল মিহির, হাতে তার বয়েসের কঠোরতা নেই। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বল্ল: "ক'টায় পৌঁছুবে?"

"এক ঘণ্টা পর!"

"না—" অনিচ্ছার একটা ঢেউ উঠ্ল শম্পার সমস্ত শরীর বেয়ে।

আবছা হাসিতে চুপ করে রইল মিহির।

"আরো অনেক পর—কাল ভোরে নয় কেন?" ছেলেমানষিতে শম্পা আরেক চেহারায় ফিরে এলো।

"নয় এজন্যে যে ষ্টেশনে-ষ্টেশনে লোক উঠ্‌বে—খালি থাকবেনা কামরা—" বয়েসের পাথর সরিয়ে মাষ্টারের ভঙ্গীতে ফুরফুরে হয়ে উঠল মিহির।

"কেন, তোমার ষ্টেশন-মাষ্টার বন্ধুটি ত রিজার্ভ-টিকিট লাগিয়ে দিলেন!"

"কিন্তু যাত্রীরা সবাই কি আমাদের বন্ধু?"

"তা উঠতই বা ওরা—কি আর হত!"

"দেখতে, এম্নি সময় আর থাকতনা!"

"খুব থাকত। তুমি আছো না?" ঘাড় নুইয়ে মিহিরের কাঁধের উপর মাথা রাখল শম্পা।

নিজেকে সত্যি সাহসী মনে হল মিহিরের — তাকে পাশে পেয়ে শম্পা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারে বলেই সাহসী মনে হল। শম্পা কি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারত যদি জীবনের অনেক রৌদ্রজলের, ঢের আলো-অন্ধকারের চিহ্ন লেগে না থাকত তার কপালের বলীরেখায়? বয়েস তার কাছ থেকে রূপ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—কিন্তু দিয়ে গেছে একটি মন, সমুদ্রের মতো একটি মন। সে-মন দিয়ে আকাশ ছোঁওয়া যায়, মাটিকে বার-বার জড়িয়ে ধরা যায়। সেই জড়িয়ে ধরা কোনোদিন জুড়িয়ে যাবেনা, তার শেষ নেই, থেমে-থাকা নেই।

মিহির আর ভাবতে পারছিল না। ভাবনাগুলো কেমন যেন হিজিবিজি রেখায় তার মাথার ভেতরে কতগুলো ছক এঁকে দিচ্ছিল, তারপর তা-ও না—সব দাগ মুছে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। কিছুই নেই আর মাথায়, শুধু একটা মিহি অনুভব—ঘুম পাওয়ার মতো ফিকে একটু নেশা। শম্পার মন থেকেই যেন

তার মন ঘুম টেনে নিচ্ছে—ছড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীরে। শম্পা যেন মিশে মিলিয়ে যাবে তার শরীরে—যেন পৃথিবীর ঠিক সেই মুহূর্ত্তগুলোই আবার ফিরে এসেছে যখন একটি প্রাণ আলাদা হয়ে দুটি প্রাণ তৈরী হয়েছিল—দুটি দেহ—নারী আর পুরুষ—সেই আদি কাণ্ডে যেন ফিরে যেতে চায় পৃথিবী—একটি প্রাণের পৃথিবীতে ফিরে যেতে চায়। এক দল তারাই কি ওরা নয়—আকাশ থেকে ছুটে এসে সারবন্দী হয়ে যারা তার চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে? পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশের ভেতর দিয়েই কি ছুটে চলেছে মিহির?

বাঁক ঘুরছে ট্রেন। জংশনের বাতির সার দেখা যাচ্ছিল। এমন রূঢ়তায় আর কখনো জেগে ওঠেনি মিহির।

২

জল খেয়ে জিরিয়ে নেবে এখানে এঞ্জিন—রাত্রির খাওয়া খাবেন গার্ড আর ড্রাইভার, ডাক-কামরার বাবুরা। খানিকটা শরীর কাটা যাবে, খানিকটা জুড়ে দেওয়া হবে ট্রেনে। আসামের পাহাড়ে গিয়ে ভোর—এদিককার প্রয়োজন শেষ, এখন আসামের প্রয়োজনে তৈরী হতে হবে ওকে। প্রায় এক ঘণ্টার জন্মে তাই থামল ট্রেন।

"প্লাটফর্মে পায়চারি করে আসি খানিকক্ষণ, চলো—" মিহির তাই প্রস্তাব করেছিল।

"আবার তোমার কোন্‌ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—সুরু হবে দুই ডোমিনিয়নের খবরের লেনদেন, কার কতো দুঃখ হচ্ছে, কে কাকে দুঃখ দিচ্ছে সেই হিসেব···"

"এখানে কেউ বন্ধু নেই আমার !"

"তুমি কি করে জানো ?"

"তা অবশ্যি জানিনে !"

দুজনকেই হাসতে হ'ল আর পায়চারি করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লও ওরা দুজনেই।

ফিরে এসে আর কামরাটাকে খুঁজে পাবার উপায় ছিলনা। যেটাকে তাদের বলে মনে হল তার ভেতরে মস্ত এক ভীড়। ছেলে-মেয়ে পাঁচটি—একজন মেদবহুল প্রৌঢ় আর কৃশাঙ্গী এক মহিলা। কামরার আলোটাকে ঘিরে ধরেছে যেন ওদের মূর্তিগুলো। কুলী আর সাঙ্গোপাঙ্গের দরুন বাকি জায়গাটুকু ঠাসা।

"নেক্‌ষ্ট ষ্টেপেজই আমাদের—মাত্র আধঘণ্টা!" মিহির একটা জেদ নিয়েই যেন হাতল ধরে লাফিয়ে উপরে উঠে গেল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল শম্পাকে, উঠবার জন্যে।

শম্পা হাসছিল—পায়চারি করতে করতে এই মাত্র না বলে এলেন মিতুদা: "যে স্বপ্নটুকু ভেঙে গেল, আধঘণ্টায় তা আবার তৈরী করে নোব!" সবই কি ইচ্ছামতো হয়? যতোটুকু হয়, তা নিয়েই খুসী থাকা ভালো। তা নিয়ে মিতুদা খুসী নন—মার্ক্স ওঁকে শিখিয়ে দিয়েছেন, ইচ্ছা করতে হয় আর পেতে হয়—তার আর সীমানা নেই!

কৃশাঙ্গীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপর দিয়ে মিহির আর শম্পা এক কোণে তাদের হোল্ড-অল্ আর স্যুট্‌কেসের সীমা ঘেরা জায়গাটুকুতে এসে পৌছল।

স্থূলাঙ্গ প্রৌঢ় হাত-পা ছড়িয়ে ঠোঁটে একটা সিগারেট চড়িয়ে ধুঁকছিলেন—মনে হচ্ছিল মুখে একটা সাদা নল লাগিয়ে তিনি ফুসফুসে

হাওয়া টেনে নিচ্ছেন।

চুপচাপ বসে থাকবারও উপায় ছিলনা মিহিরের, অনুভব করছিল কৃশাঙ্গী তাকে দৃষ্টি দিয়ে বিঁধছেন। মুখ ফিরিয়ে জানলারই শরণ নিত মিহির, যদি না স্বস্তি পাবার মতো একটি ঘটনা তখনই ঘটতে সুরু করত। ছেলে-মেয়েরা সঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে একে-একে নেমে যাচ্ছে। দু'কামরা পেছনে একটি থার্ড ক্লাশ কামরায় না কি ওদের জায়গা। মা-বাবাকে নিশ্চিন্ত আরামে আপার-ক্লাশে রেখে দিয়ে ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। সিলেট যাচ্ছেন ওঁরা, সারারাত ট্রেনে থাকতে হবে—কৃশাঙ্গী ছেলেমেয়েদের চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়তে আদেশ দিয়ে দিলেন, সাঙ্গোপাঙ্গদের সাবধান করে দিলেন ওরা যেন না ঘুমোয়।

"কখন ছাড়বে ট্রেন ?" আধো-আধো গলায় জিজ্ঞেস করল শম্পা।

"ছাড়বে কি ?" হতাশায় হাসল একটু মিহির।

ছোট একটা হাই তুলে চুপচাপ হয়ে গেল শম্পা।

মাছির মতো ট্রেনটাকে ছেঁকে ধরেছিল হকাররা—ফ্লিটের তাড়া খেয়ে যেন ওরা প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে ওয়েটিংরুমের বারান্দায় ধুঁকতে চলে গেছে। বারবার হুইস্‌ল্ শোনা যাচ্ছে—ঘণ্টা বেজে গেছে। একটা দুলুনির অপেক্ষা করছে প্রত্যেক সেকেণ্ডে মিহির, তবু মনে হল, ট্রেন কি ছাড়বে! যেন বিদ্যুতের তার কেটে গেছে—বাতি আর জ্বলবেনা। কতোক্ষণ এই অন্ধকার কে বলবে? অন্ধকার তাকে ছাড়বেনা—আলোর পেছনে ছুটলেই কি অন্ধকার ছেড়ে দেয় ?

হঠাৎ—চমকে উঠ্‌ল মিহির—আশ্চর্য্য নরম গলায় ওপাশ থেকে কে যেন—কৃশাঙ্গী সে-মহিলাই কি ?—সে-মহিলাই বলে উঠ্‌লেন: "আপনার নাম মিহির—মিহির চৌধুরী নন আপনি ?"

নরম করে তাকাতে হল মিহিরকেও—কে? কিন্তু এই বিগত-যৌবনার চোখে-মুখে পরিচয়ের কোনো স্মৃতি খুঁজে পেলনা সে। লজ্জা করতে লাগল তার, কায়ক্লেশে বল্‌লে: "হাঁ।"

একটা খুসীর হিল্লোলে স্থাণু স্বামীকেও উদ্বোধিত করে তুল্‌তে চাইলেন মহিলা: "আমি বলিনি, নিশ্চয় আমি ভুল করিনি, আমাদের মিতুদা—"

"বুলু?" সময়ের কঠিন পর্দা ঝুর-ঝুর করে ঝরে গেল হঠাৎ চোখের উপরি থেকে। মিহিরের মনে থাকলনা তার পাশে বসে শম্পাও যে হঠাৎ চমকে উঠতে পারে।

সিগারেটের আগুনেই স্বামীর স্থূল মুখটা একটু উজ্জ্বল দেখাল: "ও বল্‌ছিল বটে আপনিই সেই!" সিগারেট নিব্‌লনা কিন্তু কথাটা বলেই নিভে গেলেন ভদ্রলোক।

"অনেকক্ষণ থেকে বলব ভাবছি এ আমাদের মিতুদা না হয়ে যায়না—" বুলু জায়গা ছেড়ে উঠে এলো এবার, তারপর শম্পার দিকে তাকিয়ে বললে: "তোমাকে কিন্তু বাপু আমি তুমিই বলতে পারি!"

"তা-ই বলবেন।" হাসতে লাগল শম্পা।

শম্পার পাশে শীর্ণ শরীরটার জন্যে ছোট্ট একটু জায়গা করে নিয়ে বুলু মিহিরকেই ঘিরে ধরল: 'দ্যাখো আমি কেমন তোমাকে চিন্‌তে পারলুম—তুমি ত চিনতে পারলেনা আমায়!"

"তোমাকে আর চেনা যায় না কি!" স্বামীটি ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছেন মনে হ'ল মিহিরের।

"বুড়ো ত হচ্ছি—বুড়ো হইনি, কি বলো?" বুলু শম্পাকে সাক্ষী মানলে: "এই দ্যাখো, তোমার নামটা পর্য্যন্ত জেনে নিইনি, সব ভুল হয়ে যায়!"

"টুলু।" শম্পা হাল্কা হাসিতে নিজেকে ভোলাতে সুরু করল।

"ঈস্, কী রকম মিল!" হাসিতে আতঙ্কের ছোঁওয়া লাগল বুলুর ঃ "আমার ছোট বোন—ওরও তো টুলুই নাম—না, মিতুদা?" এবার মিহিরকে সাক্ষী ডেকে আনতে হল—নিজেকে হয়ত সত্যি-সত্যি ভুলে যাচ্ছিল বুলু।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস চাপল মিহির--যাক ট্রেন ছাড়ল! মাত্র আর আধ ঘণ্টা। লাইনের তেমাথা-চৌমাথা পার হতে যমযন্ত্রণা ভুগতে হচ্ছে চাকাগুলোর। তারপর ত সুরু হবে দুলকি চাল! গাড়ির চলায় মন দিল মিহির। সাক্ষী ছাড়াও বুলুর চলবে—তার ঠোঁটের মরা হাসিটাই ত বুলুর সব কথার সাক্ষী—কথা বলতে হবে কেন তাকে? কিন্তু এ-হাসি ত শম্পাও দেখতে পাচ্ছে। শম্পাকে বুলুর কথা কি বলেছে সে কোনদিন? মনে পড়ছেনা ত! বুলু তার মনে ছিলনা বলেই বলেনি। মনে ছিলনা? ফলের ভেতর তক্ষকের মতো একটি কালো বিন্দু হয়েও কি ছিলনা বুলু তার মনে? তা-ই যদি না হবে, তাহলে কি করে বুলুর নাম বারবার মনে পড়েছিল তার আজ, আর কি করে বা তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল মিহিরের? হয়ত কিছুই ছেড়ে দিতে পারিনে আমরা—কিছুই হারাইনে—কাছে-কাছে, না-হয় দূরে-দূরে সবই জড়িয়ে থাকে—সবই থেকে যায়! কঠোর দার্শনিকতায় নিজেকে টেনে নিয়ে চলল মিহির—তাছাড়া আর যেন তার পথ ছিলনা।

ওরা কথায় জমে গেছে—বলুক ওরা কথা। মিহিরের কিছু বলবার নেই—শুধু শুনে যাক সে। মিষ্টি-মিষ্টি ধ্বনি, হাসির ছোট-ছোট টুকরো কুড়িয়ে চলুক তার কান। একজন স্থূলকায় প্রৌঢ়ের স্ত্রী—রুগ্না, মনহীনা, বহু-সন্তানবতী মহিলা কি আশ্চর্য্য যাদুতে বুলু

হয়ে গেল—সেই আগেকার লাজুক মেয়ে বুলুর চোখের আর ঠোঁটের হাসির ছায়া পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছে মিহির। কি চমৎকার ব্যাপার! খুসীতে—হাঁ খুসীতেই ভরে উঠ্‌ছে তার মন, তাই আর কথার ঠাঁই নেই সেখানে। সুখেই আছে বুলু, এই নিরুত্তাপ স্বামীর কদর্য্য শীতেও খুসী আছে সে—সুখী থাক্ বুলু। সিলেটের চা বাগান নিয়ে সুখে থাক—ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সুখে থাক্। মিহির মনে করতে চেষ্টা করল ওর চারটি সন্তানের মুখ। মনে এলোনা। ওরা সুখী করুক ওদের মাকে। ভুলিয়ে রাখুক নিজেদের জীবনের উত্তাপ দিয়ে। ভীরু স্বামীর পাশে-পাশে থেকে নিজেকে ভুলে থাকুক বুলু—চা-রপ্তানীর কাজে স্বামীকে একা চাটগাঁতে যেতে না দিক—বাগান পরিদর্শনে স্বামী-সঙ্গিনী হোক, তারপর টাকার গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিক—তবু ভুলে থাক নিজেকে। কিন্তু ভুলে কি আছে বুলু? আরেক রকম কি হয়ে যেতে পারে কেউ ভেতর থেকে—আরেকটা ছবি শুধু তুলে ধরতে পারে—তার মানে কি আরেক রকম হওয়া? স্থান আর কাল জুড়ে যে জড়-পদার্থ আছে তা হয়ত স্থানকালভ্রষ্ট হয়ে আরেক রকম হয়ে যায়। কিন্তু এই চার ডাইমেনশন দিয়ে যাকে ধরা যায়না—পাঁচ ডাইমেনশনের মন এসে যার সঙ্গে জুটে গেছে, সেই পাঁচ ডাইমেনশনের মানুষ শুধু কি স্থান আর কালের ধর্ম্মে নিজেকে সবটুকু বদ্‌লে ফেলতে পারে? তা হয়না! দার্শনিকের মতো মনে মনে মাথা নাড়তে সুরু করে মিহির। চার ডাইমেনশন বদলে গেলেই মানুষ বদলায় না—মার্ক্সীয় রীতি মাথা কুটলেও না। বদলায়, হয়ত বদলাতে পারে, মন যদি মর্জ্জি দেখায়। কিন্তু মর্জ্জি হতে হবে তার। গান্ধীজির অনুরোধে তা হয়নি—এ-মর্জ্জি তৈরী করতে পারবে ভবিষ্যতের কোন্ মনের ডাক্তার কে বল্‌বে?

"তুমি যাবে ত মিতুদা ?" বুলু উঁকি দিয়ে শম্পাকে ডিঙিয়ে এলো : "টুলু বল্‌ছে যাবে—আমাদের সিলেটের বাসায়, ফেরবার পথে ?"

কেন যাবে তা যেন ঠিক বুঝতে পারছিলনা মিহির অথচ বুলুর মুখের পাশ কাটিয়ে শম্পার মুখের দিকেও তাকাতে পারছিলনা। শম্পা কেন যাবে, তা-ও সে জানে না।

"বেড়াতেই ত এসেছ দু'জন—আমাদের ওখানে থেকে যাবে সাতদিন !"

"তোমার একার নিমন্ত্রণে ?" বলবার মতো একটা কথা যেন এতক্ষণে খুঁজে পেল মিহির।

"তুমি ত আমারই মিতুদা, ওঁর ত নও।"

আতঙ্কে শিউরে উঠল মিহির। এতো ভালো দেখাচ্ছে কেন বুলুকে—এতো ভালো কি ও এখনও দেখাতে পারে ? মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিহিরকে গভীর অন্যমনস্কতায় ডুবে যেতে হল। জানলা দিয়ে আকাশের গায়ে ছোট ছোট টিলার ঢেউ দেখা যাচ্ছে—লাল মাটির পাহাড়—এ পাহাড়ের পরই সমতল—তাদের সহর। সিলেটের পাহাড়গুলো কি ঠিক এম্নি দেখতে ? অন্যমনস্কতা থেকে ছুটে পালিয়ে আসতে চাইল মিহিরের মন।

"বুলুদি কি বল্‌ছেন জানো ?" শম্পা হাসতে লাগল : "ছোটবেলায় দেখতে নাকি উনি অনেকটা আমার মতোই ছিলেন !"

"তা-ই না মিতুদা ?"

বিনীত, নম্র, করুণই বুঝিবা হয়ে উঠল মিহিরের শরীরের ভঙ্গী। আর সে অভিনয় করতে পারছেনা। বুলুই কি তাকে অভিনয় ভুলিয়ে দিচ্ছে না কি শম্পাই তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল অভিনয় ? কোথায় যেন

ওরা তুজনেই এক। কোথায়? সেখানে কি পৌছুতে পেরেছে মিহির — মানুষের মনের অন্ধকারে, পঞ্চম ডাইমেনশনে? কি যে ষড়যন্ত্র করছে ওদের মন সেখানে, কেউ জানবেনা, ওরা তিনজনও একে অন্যকে জানাবেনা। ওরা তিন জন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন।

চার

১

সমস্ত শরীরেই ট্রেনের দোলা ছিল শম্পার যখন ঘোড়ার গাড়িতে ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে সহরের দিকে যাচ্ছিল ওরা। ঝিম্‌ঝিম্ করছিল মাথা। কিন্তু আশ্চর্য্যভাবে সামলে নিয়েছে মিহিরদা ষ্টীমার-ট্রেনের একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা ধকল। গাড়োয়ানের সঙ্গে আলাপ করলেন, পরিচয় ঝালিয়ে নিলেন, যেন তাঁর অবসরের সীমা নেই, মনে ক্লান্তি নেই। যেন সহর থেকে পনেরো মিনিটের পথ ষ্টেশনে বেড়াতে এসেছিলেন মাত্র! ঘোড়ার গাড়িতে বসে-বসে ঝাঁকুনি খাওয়া—কেমন যেন ঘুম পাইয়ে দিচ্ছিল শম্পাকে—একা থাকলে যেম্নি ঘুম পায় ঠিক তেম্নি। সত্যি, একাই মনে হচ্ছে এখন — কোথায় পালিয়ে গেল ট্রেন ওদের এখানে একা ফেলে রেখে?

"রাস্তাটা এমন কেন—আর গাড়ির চাকাগুলো?" মিহিরও চুপচাপ হয়ে গেছে—তাই জেগে উঠতে হ'ল শম্পাকে।

"যুদ্ধের সময় মহোৎসব ছিল—প্রচুর খেয়েছে—এখন কয়েকদিন উপোস করতে হচ্ছে!

"যুদ্ধত কবে শেষ হয়ে গেছে—"

"কিন্তু যুদ্ধের শেষে উপোস শেষ হবেনা আবার যুদ্ধ না এলে!"

"থাক্—জার্ন্যালিজমের ভাষায় আমার দরকার নেই।

"দরকার আমারও নেই—তবে জিহ্বার কুঅভ্যাস কি শিগ্‌গীর যাবে?" অপরাধের খোঁচায় নিজেকে বিনয়ী করে তুলবার আগ্রহ

দেখা গেল মিহিরের চোখে !

দুঃখিত হল শম্পা—রাস্তার কথায় মিহিরদা নিজেকে টেনে এনে হাজির করবেন তা সে ভাবতে পারেনি।

"তোমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি আমি, না মিতুদা ?" মিহিরের পাশে নড়ে-চড়ে একটু ব্যবধান তৈরী করতে চাইল ও।

"মানে ?"

"হুঁ—তোমার কষ্ট হচ্ছে, আমি বুঝতে পারি !"

"আমার কষ্ট তুমি মুখে বানিয়ে তুললে কি আর করা যায় বলো !"

প্রশ্ন নিয়ে আর এগিয়ে যেতে সাহস হলনা শম্পার। প্রশ্নের ধারালো আলোতে যদি মিতুদাকে অন্যরকম দেখায় ? কোথায় সরে যাবে সে তখন ? কোথায় আর যেতে পারে শম্পা—কি করে বা যেতে পারে ! হীরে নিয়ে কি খুশী নয় শম্পা—তাকে কয়লাতে টেনে আনতে হবে ? বৈজ্ঞানিকের রূঢ়তা এখানে নয়—তার দরকার নেই — একটু অন্ধকার থাক্ — তাই ভালো।

"দাদার সঙ্গে ঝুমু আছে বাসায় ?—ঐটুকু মেয়ে, এতো একা !" শম্পা আবেগের একটি নীড় খুঁজতে লাগল।

"ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব—চিঠিতে তা-ই ও লিখ্ছিল ক'মাস থেকে আমাকে !" মিহির সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল : "বোর্ডিং-এ থেকে পড়বে—রুমুকে কথা দিয়ে পড়াতে পারিনি, ঝুমুই পড়ুক !"

"আই-এস্-সি, তারপর এঞ্জিনিয়ারিং।"

"উঁহু—নিওক্লিয়ার ফিজিক্স—"

"আ-হা, যদি পড়ি তা-ই পড়ব বলেছিলাম, পড়ব না ত আর !"

"কেন — না-পড়ার জেদ আর আবহাওয়া ত কেটে গেছে।" মিহির হাসতে লাগল।

"পড়াটাই ত জীবন হতে পারে না!"

"জানা-টা?"

"জীবন অনেক কিছু জানিয়ে দেয়!"

তা-ই। মিহিরেরও মনে হয় তা-ই। জীবনের আদ্ধেক সময় তার জীবন একটা কথা হয়েই ছিল — নাটকে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, রাষ্ট্রআন্দোলনে ব্যবহৃত একটা কথাই শুধু। একটা চিহ্ন, উল্লেখ করবার একটা চিহ্ন। সেই চিহ্নের সঙ্গে চেহারার মিল নেই। চিহ্নের সঙ্গে চেহারার মিল হারিয়ে গেছে মানুষের ভাষা থেকে। জীবন কথাটা উচ্চারণ করে কি মিহির কোনোদিন এমন স্বাদ পেয়েছে যা তার শরীরের প্রত্যেকটি অণু অনুভব করে এলো গত ছাত্রিশ ঘণ্টা? সমুদ্র বললেই কি তুমি সমুদ্রকে পেতে পারো? অসম্ভব। তার ছবিতেও তাকে পাবেনা, যদি পেতে চাও গায়ে লাগাতে হবে তার লোনা জল। শিল্প দিয়ে কি পাও তুমি—ভাষা দিয়ে, সুর দিয়ে, রঙ দিয়ে জীবনের অনুভূতিকে কতটুকু পাওয়া যায়? যা পাও তা যান্ত্রিক, মনের সত্তায় তার রঙ টেঁকেনা, ঝুরঝুর করে ঝরে যায়—কোনো শিল্পে অন্তরঙ্গ আবরণ পায়না মন—নগ্ন হয়ে উঠতে চায় তা-ই তারপরও। পৃথিবীর সমস্ত প্রেমের কবিতা তোমাকে যতটুকু দিতে পারে, তার চেয়ে ঢের বেশি পেতে পার তুমি একটি মুহূর্ত্তের প্রেমে। কবিতা কি বাঁচাতে পেরেছে তিতুকে? প্রেম তাকে বাঁচাতে চায়নি, তাই সে বাঁচলনা, কবিতার আবরণে জীবন বাঁচলনা।

কিন্তু অদ্ভুত, ঘুরে-ফিরে বারবার একটা কবিতার লাইন-ই মনে উঁকি দিচ্ছে মিহিরের। ট্রেনেও মনে পড়ছিল—এখনও আবার:
I have been faithful to thee, Cynara, in my fashion!
নিখিল প্রায়ই বলৃত লাইনটা—মিহিরের মনে লেগে আছে—আর

আশ্চর্য্যভাবে মনে পড়ছে তার। বুলুর জন্যেই মনে পড়ছে—বুলুকে দেখে। তাকে ভালোবাসত বুলু—কিন্তু মুখ লুকিয়ে রেখেছিল সে-ভালবাসা—আজ হঠাৎ মুখ তুলে তাকাবার লগ্ন এলো! কিন্তু সে তাকানো আরেক রকম, নিঃসঙ্গ পঞ্চদশী পূর্ণিমাতে পৌঁছিয়ে যেমন তাকিয়েছিল তেমন নয়—অনেকগুলো জীবনের পাকে নিজেকে জড়িয়ে রেখে আরেক নক্সায় তাকাল আজ বুলু। তবু তাতে তেমনি অন্তরঙ্গতা, অন্তরের রঙ তেম্নি। I have been faithful to thee, Cynara, in my fashion! আর মিহির? এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কি মিহির পূর্ণিমার সেই বল্লরীকে অনুভব করেনি? করেছে। একা বুলুই কি তার চিঠি পাবার জন্যে অনুরোধে উতলা হয়ে উঠেছিল—মিহিরের মন কি চিঠি দেবার জন্যে মনে-মনে প্রতিশ্রুতি দেয়নি? এক ঝাঁক হারানো স্বপ্ন কি মনের উপর দিয়ে উড়ে যায়নি তার? পাশে শম্পা ছিল, তবু। পরে অবশ্যি স্বপ্নের সবটুকু রঙ শম্পার চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে মন তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কিন্তু মনের মনে-মনে কবিতা বলা থেমে যায়নি। মিহির যেন কোথায় কতগুলো শব্দের ছবি দেখতে পেয়েছে —ধ্বনির ছবি: I have been faithful to thee, Cynara, in my fashion!

"তুমি এতো চুপ করে আছ—ভালো লাগছেনা আমার!" মিহিরের চুপ করে থাকা-কে আব্দারের অবুধ খাওয়ায় শম্পা।

"জার্ন্যালিষ্টেরও কথা ফুরিয়ে আসে একসময়।"

"ফুরিয়ে আসবার কাজ নেই!"

"তুমি কি আমায় তাহলে জার্ন্যালিষ্টই থাকতে বলো না কি!" আতঙ্কের অভিনয় করল মিহির।

"ছেড়ে দিয়ে লাভ ?"

"একটি লোক অন্তত দেশের মানুষের মাথা খারাপ করে তুল্বে না—এই লাভ !"

"ভারি লাভ তাতে দেশের !"

"দেশের লাভ না হলেও আমার লাভ আছে !"

"চাকরী খুইয়ে লাভ ?" হাসতে লাগল শম্পা ।

"আমার বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে যদি দেশকে সেবা করতে চাই—দেশ আমায় তুটো খেতে দেবেনা ?"

"দিচ্ছে কি ?"

"দিচ্ছে না । কিন্তু আশা ত করব দেবে !"

"কতোদিন ?"

"যতোদিন আশা করতে পারি ।"

"তারপরও যদি না হয় ।"

"রাষ্ট্র বলতে ত দিল্লীর যন্তর-মন্তরের মতো ইঁট-পাথরের কতগুলো জিওমেট্রি নয়—আমরাই । আমাদের আশাই ত রাষ্ট্রের আশা । নিজেদের আশা আমরা নিজেরা নষ্ট করতে যাব কেন ?"

"গান্ধীজি বেঁচে নেই বলেই নষ্ট করবে ।"

"গান্ধীজি আছেন—লেনিনের মতো অনেকদিনই থাকবেন ।"

"থাক্গে ।" মুখটা থম্থমে করে তুল্লে শম্পা : "হয় চুপ করে থাকবে, নয়ত পলিটিক্স করবে—আর যেন কিছু নেই !"

"জার্ন্যালিজমের কুফল দেখাচ্ছি তোমায় !"

"কিচ্ছু আমায় দেখাতে হবে না !"

"তোমার চরকা-কাটা কিন্তু আমায় দেখাতে !" এবার মিহিরের হাসির পালা ।

"কথা বলতে পারো বলে কতো রকমেই ঘোরাও কথা!" জানলার দিকে যতোটা সরে আসা যায়, সরে এলো শম্পা।

মিহি রাগে বেশ দেখায় শম্পাকে—একটু রাগুক ও। মিনিট খানেক চুপ করে রইল মিহির। সামনে একটা অশরীরী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যেন একটি মিনিট সময় পার হয়ে এলো সে, তারপর বিজ্ঞ বিচারকের মতো রায় দিতে মুখ খুল্ল: "রাইচ্যুয়েলকে আমাদের দেশে রীতকাম বলে—জানো টুলু? কাম মানে কাজ—কাজকে কাম বলাটা বেশ, প্যাশন অর্থও হয়। আমার মনে হয়, চরকা-কাটাটা আমাদের আত্মনির্ভরতার রীতকাম হয়েই থাকা উচিত।"

"কেটো চরকা।"

"আমি?" মিহির হাসতে লাগল: "এম্নিতেই আত্মনির্ভরতায় হাঁপিয়ে উঠছি!"

"কারো উপর নির্ভর করলেও হাঁপিয়ে উঠতে!" অনেকক্ষণ একটা কাচের বাসন আগলে রেখে এখন যেন ছুঁড়ে ভেঙে ফেল্‌তে ইচ্ছে করল শম্পার। ব্যথা পাবে মিহিরদা? একটু ব্যথা পাক। কি অধিকার ছিল তাঁর বুলুদির কাছ থেকে সরে আসবার? হয়ত চমৎকার একটি রঙ তৈরী হতে পারত—কিন্তু আলকাতরা আলকাতরাই রয়ে গেল! একটি জন্মকে উপেক্ষা করবার কি অধিকার ছিল মিহিরদার?

মিহির অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারেই মিশে রইল খানিকক্ষণ। তারপর যেন বিধাতা-পুরুষের কণ্ঠই বেজে উঠল তার সমস্ত শরীরে: "তবু একদিন নির্ভর করতেই হয়।" আর তারই আঘাতে পরাজিতের ক্লান্ত, কাতর গলায় নিজেকে সে উৎসর্গ করে দিতে চাইল অন্ধকারের পায়ে।

শম্পা কাঁদতে পারত। মিতুদার ব্যথায় নয়, নিজেরই কঠোরতায়। বুলুদিকে সে কতটুকু জানে? তার চেয়ে ঢের বেশি কি জানে না সে মিতুদাকে? তাহলে কি করে সে বুলুদির পাশে গিয়ে দাঁড়াল, মিতুদার পাশ থেকে সরে এল সে কি করে? চৌদ্দ বছরের ভগ্নাবশেষ থেকে কতটুকু পুরাতত্ত্ব খুঁজে আন্‌তে পারে শম্পা—কতটুকু তার তত্ত্ব হবে, সত্য হবে? মিতুদাকে যেভাবে সে আজ পেয়েছে তা কি সত্য নয়? এ-সত্যে কি ভরে উঠছে না তার বুক? তবে আর কি চাই তার? কি তার জানবার আছে—শোনবার আছে—দেখবার আছে? প্রশ্নের উত্তাপে চোখের জল শুকিয়ে উঠল—শম্পা কাঁদতে পারল না। প্রশ্নই যদি এসেছিল মনে, প্রশ্নের দেয়ালেই তা মাথা খুঁড়ে মরুক—চোখের জলে তাকে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না।

"সত্যি বল্‌তে"—সেই অদৃশ্য দেবতার কাছে আত্মনিবেদন করেই চল্‌ল মিহির: "সত্যি বল্‌তে, কথা আর কল্পনা ছাড়া কি ছিল আমার? তা দিয়ে ঘটনা তৈরী হয় না। ইমোশনের যুগ চলে গেছে—যখন আমার বয়স হয়েছিল—ঘটনা কি করে তৈরী হবে ইমোশন ছাড়া? তাই যেখানে ছিলাম, সেখানেই রয়ে গেছি--জংশনে থেমে এঞ্জিন হুইস্‌ল্‌ দিয়েছে, ধূয়ো ছেড়েছে এগোয়নি একটুও। এড্‌গার স্নো, লুই ফিশার হবার পথ আমি খুঁজে পাইনি। নিজের সত্যিকারের চেহারাটা আর কেউ না দেখুক, আমি নিজে ত দেখতে পাই!"

শম্পা গাড়ির জানলায় মুখ গুঁজে কাঁদছিল—বুঝতে পারলে মিহির। শম্পা কাঁদতে পারে—কিন্তু মিহিরত কাঁদতে পারে না! কাঁদতে পারেনি তিতু যখন মারা গিয়েছিল, যখন মা মারা গিয়েছিলেন,

তার সমস্ত জীবনের চোখের জল হয়ত বাবার মৃত্যুতেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর সে কাঁদেনি। কাঁদতে পারেনি বলেই কি শুকিয়ে উঠেছিল তার মন? এম্নি শুকনো যে কাঁদতেও ভুলে গিয়েছিল! শম্পা কাঁদছে—কাঁদতে ইচ্ছে করছে মিহিরের, কিন্তু, কই, পারছেনা ত সে কাঁদতে!

"নিজেকে খালি-খালি ছোট ভাববে তুমি!—কেন?" কান্নার জল মেশানো বাধ-বাধ খানিকটা ধ্বনির সঙ্গে যুদ্ধ করে চল্‌ছিল শম্পার প্রশ্ন-চেতনা: "আমি তোমাকে ছোট করে তুলছি বলেই ত!"

মিহিরের মনে হল নিজেকে আর অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখলে চলবেনা। বুদ্ধিমান মিহির জেগে উঠল: "এসব তুমি কি ভাবছো টুলু—আর আজ!"

চুপ করে রইল শম্পা।

"তুমিই ত বলেছিলে, আমার ছেলেবেলাকার ঘর-বাড়ি, আকাশ-মাটি দেখে যাওয়া-টাই হবে আমাদের রাইচ্যুয়াল!"

আকাশ-জোড়া কালপুরুষ আর চন্দ্র—কি স্পষ্ট আকাশ এখানে—শম্পা তাকিয়ে রইল।

"আর একমিনিট—তারপর আমার সেই মাটি—" নিজে থেকেই হঠাৎ থেমে চুপ করে গেল মিহির! তার সেই ছেলেবেলাকার মাটি, সেই গাছগুলো, দালানের সেই ছবিটা—ঘরের ছকে, গাছের আঁকিবুকিতে আড়াল-করা খানিকটা আকাশ! সবই হয়ত তেম্নি আছে—পুরোনো হলেও একই নক্সা! কিন্তু সত্যি তা একই রকম আছে কি? বাবা কোথায়, তিতু কোথায়, কোথায় তার মা? বৌদি বা কোথায়? বুলুর মতোই একটি মেয়ে বৌদি হয়ে এসেছিল তাদের বাড়িতে—ওই মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল,

সিঁদুরমাখা কপালে তার ডিম ছুঁইয়ে বরণ করেছিলেন মা, কাঠির দীপ সাজিয়ে তার চোখের উপর ধরেছিলেন, মধু দিয়েছিলেন মুখে—কোথায় সে মেয়েটি আজ? কি করে ভাবছে মিহির সবই তেমি আছে! দাদা-ও আর নেই তার। সেই শিশির নেই! ভস্মাবশেষ, ছাই। অথচ দাদার কাছ থেকেই শিখেছিল মিহির কল্পনা করতে! দাদার বড় হবার স্বপ্ন হয়ত তাকেও উতলা করে দিয়েছে কোনো-কোনো মুহূর্ত্তে—আর আজ হয়ত সেই স্বপ্নের অদৃশ্য শব নিয়ে দু'জনে তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকবে! কেউ কথা বলতে পারবেনা। অনেক কথা বলেছিল বলেই আর কথা বলতে পারবেনা।

শম্পার দেহ আবারও ছুঁয়ে যেতে লাগল মিহিরকে--ফাঁকা জায়গাটুকু ভরে গেল। মনের ফাঁকা জায়গাটুকুও ভরে উঠ্ছে বুঝতে পারল মিহির। সেই গলির মোড়টা পার হয়ে যাচ্ছে গাড়ি —বুলুর ইস্কুলে যাবার গলি ছিল যেটা। ইস্কুলে যাবার পথে মিতুর সঙ্গে একদিন এই মোড়ে দেখা হয়েছিল বুলুর—ফিক করে হেসে শরীরটাকে ভেঙে-চুরে দৌড়ে গলিতে ঢুকে গিয়েছিল মেয়েটা। অনেকদিন সে-হাসি মনে ছিল মিতুর। মা যখন বলতেন বুলুর সঙ্গে তার বিয়ে হবে—ওই হাসিটাই মনে পড়ত তার। বুলুর মা কি বলতেন বুলুকে মিতুর কথা? মিতুকে কি মনে পড়ত ওর? হয়ত মনে পড়ত। নইলে আজ—আজ যখন ছেলেবেলার স্মৃতি কুড়িয়ে নিতে চলেছে মিহির—হঠাৎ এসে বুলু তার গা-ঘেঁষে দাঁড়াবে কেন? মনের ঋণ শোধ করে দেবার আকুলতা বা ফুটবে কেন ওর কথায়? চারদিককার প্রাচীরের ব্যবধান ভেঙে ফেলে কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্যে কি ও এই মোড়ের

বুলু হয়ে উঠ্‌তে চায়নি আজ? কিন্তু প্রাচীর ভাঙবার সাহস বা কোথায় পেল সে! না কি এ শুধু যৌবনের উপর বিগতযৌবনার ঈর্ষা? টুলুকে সহ্য করতে পারেনি বলেই কি আড়াল ভেঙে বেরিয়ে এলো বুলু?

ব্রণ হয়ে শরীরের বিষ ফুটে ওঠে আজ। রক্তের ভেতর গলে, মুছে, ধুয়ে যায় না। তবু মিহির সে মন্ত্র জানে, রক্তের প্রহরীদের জাগিয়ে তুলবার মন্ত্র। হয়ত বাবার কাছ থেকেই পেয়েছে এ-মন্ত্র। নইলে সুপর্ণাকে সে কোনোদিন মুছে ফেলতে পারত কি? বুলুকেও মুছেই ফেলেছিল — মুছেই ফেলবে!

"জানো — বুলুর মতোই ভেঙে-চুরে গেছে সহরটা—" হঠাৎ হেসে উঠল মিহির।

"ভেঙে গেলেও গয়নার ভারে ওঁর ওজন ঠিক আছে—" হাল্কা হয়ে আসছিল শম্পার মন—মিহিরের হাসিতে ফুরফুরে হয়ে উঠল: "আমাকে গয়নার ফর্দ্দ শোনাচ্ছিলেন। আমি নামও শুনিনি অনেক-কিছুর!"

"অদ্ভুত—পুরুষরা এখনো মেয়েদের এই গয়নার আফিং খাইয়ে চলেছেন!"

"উড়েদের মতো মেয়েরাও ত তা খেয়ে চলেছে!"

"যাক্, চুরির ভয়ে গয়নাগুলো গায়ে ছিলনা বুলুর—খুব বাঁচা গেছে!"

শম্পা চুপ করে রইল।

"এই মোড় বাবু?"—গাড়োয়ান রাশ টেনে ধরল।

দুজনেই জেগে উঠল ওরা। এবার সত্যি-সত্যি যাত্রা শেষ। সত্যি থামতে হবে এবার। মাটিতে নামতে হবে।

২

ঘুম ভেঙে মিহির আর শম্পাকে দেখবার জন্যে কেউ তৈরী ছিলনা— শিশির-ঝুমু কেউ নয়। "আজই যে আস্‌বি তুই, এমন ত লিখিসনি— মহিমকে পাঠাতাম তাহলে ষ্টেশনে!"—অবাক আর খুসী হবার পালা শেষ করে শিশির বলেছিল। তখনও মিহিরের ঠোঁটে সেই ভীরু হাসিটা লেগে আছে — সেই ভয় ভুলতে পারছিলনা শম্পাকে নিয়ে বাড়ি ঢুকতে এইমাত্র বুকের ভেতর যা সে অনুভব করে এসেছে। দিল্লীর একটি সন্ধ্যায় ফিরোজ শা' কোট্‌লায় ঢুক্‌তে গিয়ে এম্নি মনে হয়েছিল তার। ইতিহাসের কতগুলো ধূসর জীর্ণ পাতা যেন গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে মিশে গিয়েছিল সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে! আজও ঠিক তা-ই। এম্নি একটি রাত্রিতে প্রথম সে কলকাতা গিয়েছিল — তাদের আম-কাঁঠালের গাছে—দালানের আর ঘরের চৌকো ছবিতে ঠিক এম্নি রাত্রি ছিল—একটি ল্যাম্প হাতে নিয়ে গলির মুখ পর্য্যন্ত তার পেছনে-পেছনে এসেছিলেন মা—কথা বলেননি, এসেছিলেন। আজ কি ঠিক তেম্নি মনে হলনা—যেন—যেন মা-ই এসে আবার তার পেছনে দাঁড়িয়েছেন—মনে কি হলনা তার যেন পেছনে তাকালেই মাকে শম্পার পাশে দেখতে পাবে? এ-মাটিটুকুর কোথায় ছিলেননা মা? কোথায় দাঁড়াননি? একটি ধূলোর কণা, একটি গাছের পাতা-ও ত অপরিচিত ছিলনা তাঁর চোখে! এখান থেকে হারিয়ে যেতে পারেন না তিনি। যতীনদার বাড়ি চলে গিয়েছিলেন বলেই কি সত্যি চলে যেতে পেরেছিলেন? অসম্ভব। কিন্তু মা তার পেছনে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন আজ? মিতু ফিরে এসেছে বলে কি ভরে উঠেছে তাঁর

বুক? যে-বুক থেকে ঝরে গেছে তিতু, সরে গেছে হাবুল—মিতু আর শম্পা কি ভরিয়ে তুলতে পারবে সে-শূন্যতা? ভীরু গলায় যেন জিজ্ঞেস করেছিল মিহির: "পারব?"

"মুড়ি আর দুধ খাবে, না কি সেদ্ধ আর ভাত—বল কাকিমা—" ঝুমু রান্নাঘরে যাবার জন্যে কোমর বাঁধল।

কাকিমা! কথাটা কেমন বিশ্রী শোনাতে লাগল শম্পার কানে—কথার শব্দগুলো। কিন্তু আপত্তি জানাতে হলে ঝুমুকে একলা পাওয়া দরকার। তাই বল্‌লে: "চলো, দেখব তোমার ভাঁড়ারে কি আছে!"

"দেখবে চিনির কৌটোয় চিনি নেই, তেলের ভাঁড়ে তেল নেই!" হাসতে লাগল ঝুমু।

"চলো ত—" ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শম্পা—ঝুমুকেও তার পেছনে আসতে হল।

কিন্তু উঠোনে নেমে এসে শম্পা পায়চারির ধরন ধরলে—রান্নাঘরে ঢোকবার যেন তার মতলব নেই! ঝুমু রান্নাঘরের তালা খুলে পেছন ফিরে তাকিয়ে বল্‌লে: "বারে, রাতদুপুরে তুমি হাওয়া খেতে সুরু করলে না কি!"

শম্পা এসে ওর সামনে দাঁড়াল: "বলো, কাকিমা বলবে না!"

"তাহলে?" ফিক্ করে হেসে ফেলল ঝুমু।

"টুলুদি।"

"বেশ—বেশ—তাই!" খুসীতে চোখমুখ নেচে উঠল ঝুমুর: "তোমাকে কাকিমা বল্‌তে আমারও ভালো লাগছে নাকি!"

"কিন্তু দাদার সামনে তা-ই বলো—শুধু দাদার সামনে!"

"মুস্কিল, ভুল হয়ে যাবে!"

"এক-আধটু ভুল হোক—এ বয়সে ভুল হয়ই!" শম্পা ঝুমুর হাত

থেকে কুপিটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

হাবুলের পাশে মিতু নয়, শিশিরের মুখোমুখি মিহির বসে আছে—দেয়ালের ইঁট-বেরিয়ে-আসা দালানটার মতোই হাবুল আর মিতুর ভগ্নাবশেষ যেন তারা। মিহিরের মনে হচ্ছিল, একসময়ে সে মিতু ছিল আর সামনের এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাবুল ছিলেন, তা-ই শেষ অঙ্কে নাট্যকার তাদের ধরে এনে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। নইলে আর কোনো কারণ নেই তাদের পাশাপাশি দাঁড়াবার।

"সহরে কা'রা-কা'রা আছেন?" সামনের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করল মিহির।

"আমার মতো যাঁরা কোথাও আর যেতে পারেন না—যাঁরা চাকরি করতেন না, তাঁরাই!" ঘোলাটে চোখদুটো জোর করে মেলে ধরতে চেষ্টা করল শিশির—যাঁরা ছিলেন, এখন নেই, তাঁদের ছবিগুলো যেন খুঁজে আনতে হবে।

"কি হবে!"

"ভগবান জানেন!"

চমকে উঠল মিহির—ঠিক বাবার গলা, বাবার কথার মতো কথাই শুনতে পেল যেন সে। এই ঘরেই—এখানেই সে বাবাকেও ঠিক এম্নি বলতে শুনেছে কোনো এক জ্ঞানী ভগবানের নাম। 'ঠাকুর জানেন'—নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন বাবা। অনেকদিন এ-নাম শোনেনি বলেই কি আজ মিহিরকে শুনতে হ'ল এই নাম?

"তাজুকে দেখলাম গাড়োয়ান হয়েছে—" জোর করে মিহির বাইরের মুক্তিতে এসে দাঁড়াল: "ওর মিস্ত্রির দোকানটাও নেই আর! ওদেরও বা কি হবে!"

"তোমরা. ত বলতে—" মনে-মনে হেসে উঠল শিশির : "পলিটিক্স মানুষকে বাঁচায় !"

"মনের ধর্ম্ম না হয়ে বাইরের পোষাক হলে"—মিহির অন্যমনস্ক হয়ে গেল : "কিছুই মানুষকে বাঁচায় না !"

শিশির চুপ করে রইল। কার্লাইলের মতো একটি বলী-বন্ধুর মুখ গ্রীক্‌ভাস্কর্য্যে স্থির হয়ে আছে যেন। ভাস্কর্য্যে যতটুকু শান্তি তা কি আছে দাদার? মিহির জানেনা, কে কোথায় শান্তি খুঁজে পায় কি করে জানবে তা দ্বিতীয় ব্যক্তি! দাদার জীবনে যদি ধর্ম্ম কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডের মতো মিশে গিয়ে থাকে—মেকানিক্যাল মিকশ্চারের স্তর পার হয়ে গিয়ে থাকে যদি তাহলে সত্যি-সত্যি শান্তি পেয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু তা কি হয়েছে? তাহলে এমন গভীর বলীরেখা কেন দাদার মুখে—সে-মুখে হাবুলকে পাওয়া যাচ্ছেনা কেন আর?

"দুঃখ হওয়া উচিত নয়—" শিশিরের মুখ স্মিত হয়ে উঠল : "তবু বাড়িটা ছেড়ে চলে যাব ভাবতে গেলে কোথায় যেন একটা টান পড়ে! জংলা, ভাঙা বাড়ি, কি-ই বা তার টান থাকতে পারে, তবু এই গাছপালা, খড়-কুটো, ইঁটপাথর ছাড়া-ও এখানে যেন আরো কি আছে মনে হয়!" হাসিটা হঠাৎ অদ্ভুত হয়ে গেল শিশিরের মুখে : "জানিস মিতু—মনে হয় বাবা-মা দুজনেই এখানে আছেন—আর—"

রাত্রির অন্ধকারে কি আরেক রকম হয়ে যায় মানুষ—তার মনের সমস্ত অন্ধকার খুলে নিয়ে চোখের উপর তুলে ধরে? মিহিরের সমস্ত শরীরে ক্লান্তি ছড়িয়ে যেতে লাগল যেন এতোক্ষণে—আঠারো ঘণ্টা পথের সমস্ত ক্লান্তি দলবেঁধে স্রোতের মতো ঢুকতে লাগল তার রক্তে। ক্লান্তি? না কি ভয়? কেউ আছে—যাকে সে দেখতে পাচ্ছেনা—

সে-ভয়? ঘরের সবগুলো দেয়ালের দিকে তাকাতে সুরু করল মিহির। তিব্বতের কোনো নির্জ্জন গুম্ফায় যেন কোনো লামা তাকে মন্ত্রের ধ্বনি শোনাচ্ছেন: "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ—"! হাত বাড়িয়ে ল্যাম্পটা তুলে নিল মিহির, নেড়ে নেড়ে তেল পরীক্ষা করল, তারপর সল্‌তেটা উস্কিয়ে দিল একটু।

"তোমার এখানে থাকা উচিত নয়, দাদা—" মিহির সাহস সঞ্চয় করে নিল।

"ঝুমু আছে—" রহস্যের আরেক রকম অন্ধকারে শিশিরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

"ঝুমুকে আমি নিয়ে যাব—ও পড়ুক কলকাতায়!"

"ও কি পড়বে? রুমুকে পড়ালে হয়ত পড়ত!" শিশির একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে গেল: "সবই ভুল হয়ে যায়! রুমুর বেলায় ভেবেছি মেয়েদের যে-কেউ একজন স্বামী হলেই বুঝি চলে!"

মিহির কথা বল্‌লনা। ছোটদের গোপন কাম আর কামনা নিয়ে কথা বলবার অভিভাবকত্ব করতে রাজি হচ্ছিলনা তার মন। কামনার রাজ্য থেকে সে শিশিরের মতো হয়ত অনেক দূরে চলে আসেনি—নিরপেক্ষ, অনাসক্ত রূঢ়তায় সে তাকাতে পারেনা সে-জগতের দিকে — সে-জগতের মহাকর্ষে, দৃষ্টিপথ তার বেঁকে যায়।

"রুমু পড়তে চেয়েছিল—আমি ভেবেছিলাম পড়ার চেয়ে মেয়েদের বিয়েটাই বড়ো! ঝুমুর হয়ত বিয়ের দরকার, আর আমি ওকে পড়াতে চাই!"

"ঝুমুর বিয়ের দরকার কে বলেছে তোমায়?" মিহির অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল।

"দরকার।" একটু ম্লান হেসে চুপ করে রইল শিশির।

কিন্তু কে বললে? মিহির খুঁজতে লাগল। শিশিরের মুখে খুঁজে পেলনা সে কিছু। তার কাছে লেখা ঝুমুর চিঠিগুলো কি কিছু খোঁজ দিতে পারে? "আমার পড়া হবেনা মিতু-কা, এখানে ত অসম্ভবই—আর অন্য কোথায় যাবো বলো, বাবাকে এখানে একা ফেলে?" —নিজের একাকিত্বের বন্ধনে ঝুমুকে ফেলেছেন বলেই কি দাদা তাকে বিয়ের বন্ধনে মুক্তি দিতে চান? "তুমি একবার এসো"—শেষ চিঠিতে: "আমি যাব, তুমি এলে"। ঝুমু কি ভাবল শেষটায়, বিয়ের চেয়ে বাবাকে একা ফেলে যাওয়াই ভালো? বিয়ে নয়—দাদা ভাবছেন—পড়া-ও নয়, তবে? কি চায় তবে ঝুমু? মিহির খানিকটা চমকে উঠল—সে নিজে একসময় যেমন চাইত, তা-ই কি চায় ঝুমু? কিন্তু তার চাওয়া-টা ঝুমুর মনে ফিরে এলো কি করে? তার চাওয়ার কাহিনী কি করে শিখে নিল ঝুমুর মন? কোনো বন্ধনের ফাঁস পরাবেনা জীবনের গলায় —কেন এ-শপথ ইচ্ছা হয়ে একটি কুমারীর মনে জেগে উঠল! কেন! প্রশ্ন নয়, বিষণ্ণতাই যেন কথা কয়ে গেল।

"প্যাশন-কে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারো না তুমি—" শিশির খানিকক্ষণ থেমে রইল, নিজেকে উপলব্ধি করবার জন্যেই যেন থামল, মিহিরের চোখ অস্থির হয়ে উঠেছে কি না তা দেখবার তার দরকার ছিলনা: "কিন্তু আমার মনে হয় বড় বেশি স্বীকৃতি হবে তার এ-যুগে! পলিটিক্যাল প্যাশন ছাড়া পেয়েছে—রক্তমাংসের প্যাশন ছাড়া পাবে এবার!"

অনেকদিন আগেকার পুরোনো মিহিরকে খুঁজে নিল মিহির, যখন সে ভাবত দাদার সঙ্গে কোনো বাঁকে, কোনো রেখায়,

কোনো কোণে তার মিল নেই। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে : "মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো হলে তোমরা ভয় পাও!"

"পাই।" শিশিরের ঠোঁটে বিনীত হাসি ফুটে উঠল।

অস্বাভাবিক উঁচু শব্দে হেসে উঠল মিহির।

"পাই।" আবারও বললে শিশির : "ঈশিত্ব-বশিত্বের পেছনে ঘুরেও মনকে পবিত্র রাখা যায়না বলেই ভয়!"

হাসির শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল মিহিরের গলায়। ল্যাম্পটাও কি নিভে গেল হঠাৎ! কেমন যেন অন্ধকারের আঁকিবুঁকি দেখা যাচ্ছে দাদার মুখে—ভাস্কর্য্যের শান্তি নেই, মসৃণতাও নেই--অন্ধকারেরই গভীর, অতল ষড়যন্ত্র শুধু। সব মানুষের মতো একটি অন্ধকার মানুষ মিহিরের সামনে বসে আছেন। এপাশ-ওপাশ থেকে তুমি তার ছবি তুলে নিচ্ছ কিন্তু তবু তার সবটুকুকে পাচ্ছ না। কতো আলো ঘোরাবে, মনের, মেধার, আবেগের, অনুভূতির যতো আলো ঘুরিয়েই দেখতে চাও তাকে সবটুকু দেখা হবেনা! আশ্চর্য্য, এই মানুষকে মিহির একসময় শুধু রাজনীতির আর্ক-ল্যাম্প জ্বালিয়ে ধরতে চেয়েছিল, সমাজবিজ্ঞানের ফাঁস জড়িয়ে টেনে আনতে চেয়েছিল কাছে! সব কিছুর বাইরে চলে গিয়ে হো-হো করে হেসে উঠতে পারে মানুষ—ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, তর্ক, নীতি, আর্ট, ইতিহাস, সব কিছু—মানুষের হাতের তৈরী, মনের তৈরী সব নক্সার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারে সে। যা তার তৈরী নয় শুধু তারই বাইরে সে যেতে পারেনা—পারেনা প্রেমের অনুভূতি থেকে পালিয়ে যেতে! ওই এক নোঙর, ওই একটা মাত্র নিয়ম—মানুষের সত্যিকারের নিয়ম, যা মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে। বস্তুর বস্তু হয়ে ওঠবার নিয়ম, বস্তুকে জড়িয়ে ধরবার নিয়ম—আর সব জ্যামিতি, ছবি, কল্পনা!

ক্লান্তিতে হাই উঠছে দেখাতে লাগল মিহির—দাদার কথায় যে কথার স্রোত তৈরী হয়ে চলছিল মনে, তার উপর সে হাই-এর পর্দা টেনে দিল : "ওরা কি করছে ও-ঘরে এতোক্ষণ? এতো রাত্তিরে ভাত কে খাবে?"

"ঘরের ছোট ছেলের জন্যে গরম দুধ এনেছি—" ঝুমু বাটি-হাতে ঘরে এসে ঢুকল। গগ্যাঁর আঁকা তাহিতি মেয়েদের মতো মজবুত ভঙ্গী, পুরু ঠোঁট, আঁটসাঁট ঘাড়, চোখে ওর হাসির ঝিলিক।

পাঁচ

১

"কাল রাত্তিরে ঘুমুতে পারোনি তুমি টুলুদি—" ঘর পরিষ্কারের পালা চলছিল ঝুমুর।

শম্পাও তোষকবালিশ চাদর মশারিকে রোদ খাওয়াবার ব্যবস্থা করছিল: "কেন?" বালিশের অর খুলতে-খুলতে হাসতে লাগল সে।

"ওরকম লুটোপুটি করে ঘুমোনো যায় কখনো? মশারি পর্য্যন্ত খাটানো হয়নি — হাতের দিকে তাকিয়ে গ্যাখো — শেষটায় বলবে তোমাদের দেশে এসে ম্যালেরিয়া নিয়ে গেলাম!"

"না-হয় ম্যালেরিয়াটাও নিলাম!" শম্পা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

ঝুমু টীচারি ভঙ্গী এনে বললে: "মিতুকা বেশি গম্ভীর বলেই তুমি এতো বেশি হাসো—বুঝেছি!"

"তোমার বাবা-কাকা দুজনেই একরকম—পৃথিবীর দুশ্চিন্তা বয়ে বেড়াচ্ছেন!"

ঝুমু দেওয়ালের ঝুল ঝাড়তে মন দিলে—বেশ একটা মাঝারি রকমের কাজ, পাঁচসাত মিনিট চুপ করে থাকলেও টুলুদি কিছু মনে করবেন না। একটা বাঁশের আগায় সুপুরির শুকনো ডালা বেঁধে দিয়ে গেছে মহিম—তা-ই হাতে তুলে নিল ঝুমু। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকা দরকার। টুলুদির কথাটা তার মাথায় নানারকম শব্দ তুলে চলেছে। বাবা না কি দুশ্চিন্তা করছেন! তাহলে এখানে এভাবে সে আছে

কি করে? বাবা কি জানেন না পাড়ায় যে আর একটি মেয়েও নেই—সেরেস্তাদার বাড়ির সবাই দমদম চলে গেছেন—জায়গা নিয়ে বাড়ি করেছেন ওখানে—শুধু নিমু ছিল বাড়ি-পাহারায়, হোটেলে খায়, জুয়ো খেলে আর উর্দ্দু কথা বলে! বাড়িটা রিকুইজিশনে পড়েছে, আর-ও এসে বলে বাবাকে, ভালোই হ'ল দাদা—রাস্তাতেই আমাকে মানায় বেশি! সবই ত জানেন বাবা, ঝুমু যে বাইরে বেরোতে পারেনা এক পা-ও, কারো বাড়িতে যে যাবার তার উপায় নেই! বুড়ো মহিমের সঙ্গে রাতদিন বসে-বসে বকর-বকর করো, সহরের বাসিন্দেরা কে কবে কোথায় চলে যাচ্ছে তার হিসেব রাখো, রান্নাবাড়া করে তারপর খেয়েদেয়ে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ো! মাসের পর মাস চলেছে এভাবে—একটা বছর ঘুরে এলো, বাবা কি ভাবছেন কিছু? মাঝেমাঝে বলেন, কলকাতায় পূব-বাংলার মেয়েরা বানভাসি হয়ে চলেছে! ও শুধু ঝুমুর চোখের উপর নিরাশার ছবি তুলে ধরা—বলতে চাওয়া, এজায়গা ছেড়ে কোথায় যাবে, যাবার জায়গা নেই কোথাও! যুদ্ধে হেরে গিয়ে বাবা যেন দাসত্ব করছেন সবার—দাসত্ব করেই সুখ পাচ্ছেন—ভাবছেন তাতেই তাঁর মুক্তি! তা নয়ত কি! ক'দিন আগে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঝুমু লালঝাণ্ডার একটা শোভাযাত্রা দেখতে—শোভাযাত্রা চলে গেল পরও দাঁড়িয়েছিল সে অনেকক্ষণ, ভাবছিল, তার ছোটবেলায় একবার মিতুকা এদেরই গল্প করেছিলেন তার আর রুমুর কাছে! কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলনা ঝুমু বেশিক্ষণ—কোত্থেকে টুক করে অনেক ভাঁজের একটা চিঠি এসে পড়ল তার গায়ে! চিঠি কে ছুঁড়ল, বাবা তা জানতে চাইলেননা, শুধু ভাবলেন, ঝুমুর বয়েস হয়েছে! ভয় পেয়ে গেলেন বাবা। ভয় পাওয়াটা-ই তাঁর অভ্যাস। সব কিছুকে ভয় পান তিনি—ভয় পেয়ে

নিজের অদ্ভুত অবস্থাটা বারবারই মনে পড়ছিল শম্পার। জানবার যেন কোনো দরকার নেই এদের, শম্পা কে? মিতুদার সঙ্গে দেখছে তাকে—আর যেন কোনো প্রশ্ন নেই! তাদের বিয়ে হয়ে গেছে ধরে নিয়েছেন দাদা — ঝুমু তার কাকিমাকে পেয়ে গেছে! কিন্তু এদের ধারণাকে শম্পাও ত নির্ব্বিবাদে মেনে নিলো! কোথাও ত অস্বস্তির কাঁটা ফুটে উঠলনা তার। মনে ত হলনা, কোথাও ফাঁকি রয়ে গেছে! কোনো যজ্ঞের আগুন সাক্ষী থাকল না বলে' বা রেজিষ্ট্রারের খাতায় নাম উঠলনা বলে' যে ফাঁক পড়ে রইল কোথাও, মনের ভেতর একথা ত একবার খুঁত-খুঁত করে উঠছেনা তার! এমন অদ্ভুত হয়ে গেল সে কি করে? আসবার সময়ও ত ভাবছিল এবার কলকাতায় ফিরে এসে রেজিষ্ট্রারের অফিস হয়ে তবে বাড়ি যাবে সে-কাজ যেন তার ফুরিয়ে গেছে। বুলুদির সঙ্গে যখন গাড়িতে কথাবার্ত্তা বলছিল তখনও এমন ছিলনা—মাত্র বারোটা ঘণ্টায় অদ্ভুতভাবে সব বদলে গেল।

বিছানার কাজ সেরে শম্পা ঝুমুর কাছে এগিয়ে এলো: "দাও এবার আমায়। দুটো দেয়াল তোমার, দুটো আমার!"

"আমি ভাগাভাগি করতে রাজি নই!" দেয়ালের দিকে মুখ রেখে ঝুমু ঝাঁটা চালিয়ে যেতে লাগল।

"গুরুজনের কথা শুনতে হয়।"

"গুরুজনের কাজও করে দিতে হয়!" হাসতে সুরু করেই হঠাৎ থেমে গেল ঝুমু। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে বললে: "এ-ঘরে আমার মা থাকতেন, টুলুদি!"

শম্পার মুখে কথাই থেমে গেল।

"মার ঘরের চেয়ে ভালো জায়গা ত আর নেই—তাই তোমার জন্যে

কালো হয়ে যেতে সুরু করেন আর কিছু করতে পারেন না !

একটা দেয়াল শেষ করে ঝুমু পেছন ফিরে তাকাল : "আচ্ছা টুলুদি, তুমি ভয় পাও ?"

রোদ খুঁজতে উঠে দাঁড়াল শম্পা : "মানে ?"

"মানেটাই বুঝলেনা ? তুমি সাহসী কি ভীতু তা-ই জিজ্ঞেস করছি।"

"ওদ্ভুটোর একটা আবার কেউ হয় না কি কোনোদিন ? যে সাহসী সে-ই ভীতু—কি একটা সমাস আছে না, সে-রকম !"

"কিন্তু মিতু-কা ভীতুই বেশি !"

"কিন্তু তোমার অতো সাহস দেখিয়ে কাজ নেই—টেবিলের উপরে নিয়ে চেয়ার তুলেছ, এক্ষুণি পড়ে যাবে !"

"মাদ্রাজী মেয়েদের মতো আমরা সার্কাস দেখাতে পারিনে, টুলুদি ?"

"পারি ! একসময় মনে হয় সব কিছুই করতে পারি—তোমার এখন যেমন মনে হচ্ছে !"

"তোমার মনে হয়না ?"

"উহুঁ—"

"মনে হয়না ? অথচ মিতু-কা তোমায়—" হাসির শব্দে কথাটা মিশিয়ে দিল ঝুমু।

বারান্দা আর দরজা জুড়ে রোদ-পড়া খানিকটা জায়গায় একটা পাটি বিছিয়ে—পাটির উপর তোষক-বালিশ জড়ো করতে লাগল শম্পা। তারপর হঠাৎ ঝুমুর হাসিটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে : "কিছু বলেন না।"

"মিতু-কা আরেক রকম হয়ে গেছেন !" হাসির সান্ত্বনা খুঁজে নিল ঝুমু।

"আনতে ত হল শেষটায়!" ঘরের ভেতর থেকে হেসে উঠল ঝুমু।

ঘরে গিয়ে ঝুমুর সঙ্গে খানিকটা ঝগড়া করে আসবে কি না ভাবলে শম্পা, কিন্তু পাগুলো তাকে উঠোনেই নামিয়ে দিল—মিহিরকে একটু অসহায় মনে হচ্ছিল, তাই। নিজেকে সামলে ঝুমুর কথার জবাব দিতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল মিহিরের: "কি আর করা যায়! লোকে যদি হঠাৎ কবি ভেবে বসে?"

দরজায় এসে দাঁড়াল ঝুমু: "কবি হতে তোমার এতোই ভয়?"

"হতে নয় কবি-কবি দেখাতে। আর ভয় নয়, হাসি পায়।"

"তিতু-কা কবিতা লিখতেন—বাবার কাছে তাঁর কবিতার খাতা দেখেছি!" একদৃষ্টে মিতুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সরে গেল ঝুমু।

তিতু! পায়ের নীচে আমগাছের ছড়ানো ছায়াটা যেন ঘন হয়ে মিহিরের চোখের সামনে উঁচু হয়ে দাঁড়াল। এখানে এসে তিতুকে ত একবারও মনে পড়েনি তার! দীঘির পাড়ে গিয়েও মনে পড়েনি তিতুর কথা! কিন্তু এম্নি পূজোর ছুটির আগে—যখন ইস্কুলে পড়ত তা'রা—ভোর বেলা তিতুর সঙ্গেই দীঘির পাড়ে বেড়াতে বেরুত মিতু। মুখে-মুখে কবিতা বলত ও— রবিবাবুর শারদোৎসবের গানগুলোর একটা-দু'টো লাইন বলে যেতো—বলত, জানিস মিতু দুর্গোপূজোটার মতো এতবড় কবিতা আর হয়না—আমাদের সবগুলো পার্ব্বণই কবিতা! মিতু মনে-মনে ভাবত, নিশ্চয়ই তা নয়। তিতু যা বলছে তা সে বলবেনা বলেই ভাবত। তিতুর কথায় সায় দিতে চাইতনা কিছুতেই তার মন—তিতুকে খুসী করতে চাইতনা। কিন্তু তিতু চাইত মিতুকে খুসী করতে—মিতুর অনেক কথাতেই সায় দিত ও—ছোট ভাই-এর

এ-ঘর!" ঝুমু পেছনে তাকাল।

"ঈস তুমি ঘেমে গেছো—" শম্পা ঝুমুকে অন্যকথায় ফিরিয়ে আনতে চাইল: "ঝাঁটা-টা দাও আমায়—লক্ষ্মী—দাও—"

"ঠাকুমাও নাকি বলতেন, এ ঘরটা মিতু-কার, মাঝেরটা তিতু-কার, ওপাশেরটা বাবার!"

"তুমি দেবেনা?"

আবার মাষ্টারি চোখে ধমক নিয়ে বলে উঠল ঝুমু: "কি শুধু দাও-দাও করছে—ঘরের কথা শুনবেনা!"

সহর চক্কর দিয়ে ফিরে এসেছে মিহির—মাত্র আধ ঘণ্টাতেই রাস্তা ফুরিয়া গিয়ে বাড়ির উঠোনে এনে হাজির করেছে তাকে—ডাকাডাকি স্নুরু করেছিল সে ঝুমুকে।

"মিতু-কা ক্ষেপে গেছেন—দেখে এসো টুলুদি—" আরেকটি দেয়ালের জন্যে দাঁড়াবার জায়গা তৈরী করছিল ঝুমু।

শম্পা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

"কেউ চেনেনা—একটি চেনা মুখ নেই—" মুখে রুমাল ঘসতে স্নুরু করলে মিহির: "অদ্ভুত! সব গেল কোথায়? দোকান-পাটগুলো তেম্নি আছে অথচ সেই মানুষগুলো নেই! চিনলে হয়ত আমায় টাউনহলের বাদাম গাছটা—কাছারীবাড়ির বুড়ো বট-টা আর দিঘীর পাড়ের ঝাউ-গাছগুলো! রাস্তার ধারে বুনো সেগুনগুলো-ও নেই, যুদ্ধ এসে গিলে খেয়েছে সব!"

"সকালবেলা বেড়াবার সখ ত নেই সবার তোমার মতো!"

"এমন সকালবেলা বেড়াবার যাদের সখ হয়না এসহরে তাদের থাকবার সখও মানায়না! দীঘিতে যা পদ্ম, চোখ ফিরিয়ে আনা যায়না!"

মতোই সায় দিত। বড় ভাই-এর মর্য্যাদা ও চায়নি, হয়ত ভাবত মিতুকে খুসী করতে পারাটাই ওর কাজ। মিতু মনে করেছিল তিতুর সবকথাই ফাঁকি, ছায়া — ও-ছায়ার মায়ায় কিছুতেই সে ধরা দেবেনা, ছায়ার ওপারে সে চলে যাবে যেখানে হয়ত আলো আছে। তিতু কবিতা লেখে বলেই কোনোদিন কবিতা লিখতে বসেনি মিতু! দাদার বেলায়ও ঠিক এম্নি। দাদা মহাপুরুষদের কাহিনী শোনাতেন—ভোগ নিয়ে যেতেন দশভুজার বাড়িতে—চোখ-কান বন্ধ করে রাখতে ইচ্ছা করত মিতুর। কিন্তু দাদার কাছ থেকে, তিতুর কাছ থেকে কি সে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে? সে-ও ত বুকে ঠিক তেম্নি আবেগ বয়ে বেড়াচ্ছে, যা থেকে কবিতার আর ধর্ম্মের জন্ম হয়! সে-আবেগের সঙ্গে আজ যেন দাঁড়াতে হচ্ছে তাকে! ঝিমিয়ে পড়ছে তার রোদ বিকেলের ছায়াচ্ছন্নতায়। 'I understand all things, and yet I see that I can suffer.' ছায়ার হিজিবিজিতে তিতুর মুখের জ্যামিতিক রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার চোখের উপর।

খানিকক্ষণ—মাত্র দশবারো সেকেণ্ড—তারপরই মিহির মনের অন্ধকার থেকে উঠে এলো। এতো বড় একটা আলোর ধারে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অন্ধকারের স্বপ্ন দেখা যায়না। পাশে শম্পাকে অনুভব করছিল মিহির—এ অন্ধকারের সঙ্গে শম্পার কোনো পরিচয় নেই। তার এ-অন্ধকার কোনো দিন দেখতে পায়নি শম্পা। কতো আর দেখাতে পারে সে? চল্লিশ বছরের জীবনটাকে কি আট বছরে কারো চোখের উপর তুলে ধরে দেওয়া যায়?

"তোমাদের সায়ান্সে আছে না টুলু?" খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠতে হল মিহিরকে: "একই জিনিষ আলাদা পদ্ধতির

এলাকায় এলে, তার সময়, গতি, অবস্থানের মাপ সব বদলে যায় ?"

বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল শম্পা—বিষণ্ণ থেকেই বল্লে : "আইনষ্টাইনে আছে !"

"ধরো এই বাড়িটার বিচারে আমরা পাশাপাশি আছি—" মিহির উৎসাহিত হয়ে নড়ে-চড়ে উঠ্‌ল : "কিন্তু আমাদের নিজেদের বিচারে, মানে মানুষের মনের মাপে আমরা হয়ত এক থেকে অপর অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছি।"

"সায়ান্সে মনের মাপ নেই — আলোর কথা আছে—" ম্লান হাসি ফুটে উঠল শম্পার মুখে।

"আলোর কথাই শেষ কথা নয়—মনের গতির কথাও তারপর থেকে যায়!"—মিহির হঠাৎ হেসে উঠল : "যুধিষ্ঠির কথাটা বলেছিলেন বলে তার ধার কিছু নষ্ট হয়ে যায়নি!"

শম্পা হাসতে পারলনা। মুখ থেকে ওর ম্লান হাসিটুকুও মুছে গেছে, দেখতে পেল মিহির। তাই আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল সে কথা বলতে : "বাড়িটা দেখবেনা টুলু ?"

"দেখতেই ত পাচ্ছি !" বিষণ্ণতায় সমস্ত শরীর ভারী হয়ে উঠছিল শম্পার।

"না, চারদিক ঘুরে। আমার চোখেই নতুন লাগছে সব !"

"চলো।" শম্পা যেন আরেকটি বিষণ্ণতার ডাকে সাড়া দিল।

পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। ঘাটের চাতাল ফেটে উঁচু হয়ে আছে খানিকটাতে—খানিকটাতে থোকা-থোকা ঘাস। গাছের ছায়ায় আর গাঢ় সবুজ পানায় ঠাণ্ডা খানিকটা জায়গা, উলু ঘাসে উঁচু করে পাড় বাঁধান। জলপচা মিহি একটা গন্ধ

আসছে, তাই ওটাকে ডোবা বলে চেনা যায়। সবই আছে অন্যরকম হয়ে—চিনে নিতে হয়। একটা গুলঞ্চ লতার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সেই জলপাই গাছটা—হঠাৎ চেনা যায়না। বাতাবি গাছটার ডালপালা থেকে দড়ির মতো লতা ঝুলছে—ডালগুলোর খয়েরী বাকলে শ্যাওলার সবুজ চাপ।

"এতো গাছ অনেকদিন দেখিনি—" মনে-মনেই যেন বলল শম্পা।

"সবই মার হাতের, অনেক আছে, অনেক নেই!"

"গাছ তোমার ভালো লাগেনা, মিতু-দা?"

"অনেক ভালোলাগা মনের উপরে উঠে আসেনা—হয়ত তেমন ভালোই লাগে গাছকে আমার। একবার শুধু তা মনের উপরে উঠে এসেছে পূব বিহারের লাল বালু আর কাঁকর পার হয়ে যখন সাসারামের সবুজ দেখতে পেলাম!"

ডোবার পাড় ঘেঁষে খানিকটা যাওয়া যায়—চারপাড়ের আধাআধি জংলার হাতে, আদ্ধেকটা মানুষের পায়ের নীচে আছে এখনো—ঘাসের উপর সরু পথের চিহ্ন।

"এগুলো চেনো — ধানপাতার মতো পাতা? 'চাঙ্গা' বলে এগুলোকে এখানে—হয়ত অষ্ট্রিক ভাষা", মনে হল মিহির যেন বোটানির মাষ্টারের মতো এক্সকারশনে বেরিয়েছে: "একটা-দুটো এনে মা পুঁতেছিলেন। ওর পাতা মুড়ে টেকোর স্থতোয় বেঁধে দিতেন মা ষষ্ঠীব্রতের দিন—বলতেন আমাদের আয়ু বাঁধছেন! এ-গাছ মরেনা।"

শম্পা মুখ তুলে মিহিরের দিকে তাকাল।

"মা-রা এসব করতেন—রীতকাম, রাইচ্যুয়াল!" মিহির তার চোখে-মুখে হাসির ম্লান স্মৃতি ফুটিয়ে তুলল: "জীবনই ভালো লাগত

তাঁদের—সব জায়গার, সব যুগের জীবন।"

শম্পার ত, কই, মনে পড়ছেনা মাকে এধরণের কাজ করতে দেখেছে কিনা সে কোনোদিন! শুধু একবার—তা-ও দিদিমা ছিলেন বলেই হয়ত—দেখতে পেয়েছিল শম্পা একটা দুর্ব্বোধ্য আচার। বৌদির কপালে ডিম বুলিয়ে—তুলোর সলতের সারবন্দী দীপ ঠেকিয়ে মা বধূবরণ করেছিলেন। মা নিজেও হাসছিলেন, শম্পা আর তার বন্ধুদের ত কথাই নেই! কিন্তু ভাবতে গিয়ে হঠাৎ আজ তার মানে খুঁজে পাচ্ছে কি করে শম্পা? মনে ত হচ্ছেনা আর এই বধূবরণ একটা জটিল রহস্যে ঢাকা। একটি প্রাণশিল্প দিয়ে, আলোর মালা দিয়ে একটি নূতন প্রাণশিল্পীকে, একটি নূতন আলোকে আহ্বান করা হচ্ছে—এই ত সেই দুর্ব্বোধ্য আচার। মন যেমন কথা হয়ে ফুটে উঠতে চায়, ধরা দিতে চায়—এও তাই। একটি ভাব ভঙ্গী হয়ে ফুটে উঠতে চাচ্ছে—তার নামই ত রাইচুয়্যাল! আমাদের আদি জীবনের স্মৃতি এই রাইচুয়্যাল—ভাবের প্রতীক ছিল, ভাবের দাবী ছিল যখন সমস্ত দেহের উপর, শুধু কথার কারুকার্য্যের উপরে নয়।

একটা নারকেলগাছের গোড়ায় এসে দাঁড়াল মিহির। তামাটে আঙুলের মতো নতুন শিকড়গুলোর দিকে তাকিয়ে বললে: "এ গাছটা পোঁতবার বেলায় মার সঙ্গে আমি ছিলাম! মা নাগাড়ে একমাস জল ঢেলেছেন, বলতেন, শিকড় মেললেই চিন্তা যায়!"

শিকড় মেলেছিল, আজও মেলছে শিকড়। শম্পা এগিয়ে গাছটার গা ঘেঁষে দাঁড়াল—তাকাল মাথার উপর—একটি আলো-ছায়ার নীড়, আর যেন কচি-কচি সবুজ শিশুর মুখ উঁকি দিয়ে আছে পাতার ঝিলমিল খুলে।

"মা-কে তোমার খুব মনে পড়ে—না, মিতুদা?"

মিহির সেই ঘুমের ধ্বনি শুনতে পেল শম্পার গলায়, চোখের পেছনে যেন দেখতে পেল ঘুমের অন্ধকার। সময়কে ধরা যাচ্ছে হৃদ্‌পিণ্ডে—একটু-একটু ধরা দিচ্ছে সময়! খানিকক্ষণ আগে সময় হারিয়ে গিয়েছিল, শম্পাও যেন হারিয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে। ফিরে এসেছে—ফিরে এসেছে শম্পা।

"মা-কে?" মিহির যেন দূরের কোনো পরিচিত মরীচিকার দিকে তাকাল: "আজ মনে পড়ছে খুব! গাঁয়ের একটি মেয়ে সহরে এসেছিল—সহরকে ভালোবেসেছিল!"

শম্পা মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। তাকাতে পারছিলনা সে মিহিরের দিকে—চোখে এতো জল নিয়ে তাকানো যায়না।

"আর আশ্চর্য্য, মনে হচ্ছে মা যেন এখানেই কোথায় আছেন!" অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল মিহির—ঠিক বুঝতে পারলনা কিন্তু দেখতে পেলো গাছটার গায়ে কপাল ছুঁইয়ে আনল শম্পা দু'বার—তিনবার—তারপর মুখ তুলে তাকাল তার দিকে। চোখভরা জল কিন্তু অদ্ভুত একটা হাসি ওর সমস্ত মুখে।

২

"এতো মাছ আর এমন সুন্দর দেখতে?"—খুকীর মতো অবাক হয়ে শম্পা তাকিয়ে রইল শিশিরের মুখের দিকে।

"এখানকার নদীর মাছ—তাই এতো টাট্‌কা, ঝক্‌ঝকে—" শিশির হাসতে লাগল, মুখের উপর একটা নূতন স্পর্শই যেন অনুভব করল সে, হাসির রেখাগুলো ভেঙেচুরে অন্যরেখা হয়ে গিয়েছিল, অন্যরেখাই হয়ে ছিল যেন এতোদিন: "খেতেও খুব ভালো, দেখবে!"

"এই আদ্ধেকটা আমি রান্না করব--ওগুলো ঝুমু—"

"নিরামিষ যে ভালোবাসে সে মাছ রান্না করতে জানেনা—" বালতির জলে সব্জীগুলো ডুবিয়ে দিচ্ছিল ঝুমু।

"নিরামিষ ভালোবাসব না, মাছ পাব কোথায় কলকাতায়?" শম্পার চোখে অভিমান ফুটে উঠল।

"বঙ্কিমবাবুর সুজলা-সুফলা বাংলা এখন পূবদিকটাই—পশ্চিমটা হাজা-মজা নদীর দেশ!" শিশির তত্ত্বীয় ধাপে উঠে গেল।

"তোমাকে আমি মাছ খাওয়াব ভাবছ না কি?" খিলখিল করে হেসে উঠল ঝুমু: "মাছের অভ্যেস করে কলকাতায় গিয়ে বিপদে পড়ো শেষটায়! বিশুদ্ধ নিরামিষ তোমার জন্যে—আলু-পটল-মূলো-ডাঁটায় পাছে মাছের গন্ধ থাকে তাই ধুয়ে নিচ্ছি, দেখছ না!"

কয়লা ভাঙতে-ভাঙতে বুড়ো মহিমও হেসে চলেছে। শম্পা এবার যুদ্ধ ঘোষণা করে মহিমকে বললে: দাদু, আমার জন্যে একটা আলাদা উনুন ধরিয়ে দাও!"

মজা পেয়ে ঘাড় নাড়তে লাগল মহিম: "দোব—দোব!"

"এসেই তুমি আলাদা উনুন করছ টুলুদি—আচ্ছা—"

"এই—"চোখে শাসন নিয়ে ঝুমুর দিকে তাকাল শম্পা।

ঝুমু জিভ কেটে মুখ নীচু করে রইল।

হাওয়া দিল, হাওয়া লাগল যেন সমস্ত শরীরে, মনের আনাচে-কানাচে। অনেকদিন এমন ভালো লাগেনি শিশিরের। ঠোঁটের হাসি তার মিলিয়ে যেতে চাচ্ছে না—একটা নূতন সময়ে, নূতন জায়গায় কি পা বাড়িয়ে দিল সে? রান্নাঘরের বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে এলো শিশির—ভাদ্রের চমৎকার রোদে আর ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায়। এ-হাওয়ার মতোই একটা হাওয়া লাগছে তার শিথিল

হৃদ্‌পিণ্ডের আশেপাশে—তাই যেন বহুদিন-ভুলে-থাকা, বহুদিন আগেকার সময়ের ছন্দ বাজিয়ে চলেছে হৃদয়।

হয়ত এম্নি হাওয়াই লাগত মার আর বাবার হৃদ্‌পিণ্ডে পূজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে যখন বাড়ি আসত শিশির। হৃদয়ের ছন্দে দুরকম ছবি নেই—একই রকম ছন্দস্পন্দ সমস্ত হৃদয়ের! আজ বুঝতে পারছে শিশির। হৃদয়কে বোঝা যায় না জীবনের শেষ প্রান্তে এসে না দাঁড়ালে। মার মতো, বাবার মতো যে তার একটা হৃদয় ছিল তা সে তখন বুঝতে পারেনি, যখন বাবা ছিলেন, মা ছিলেন।

মিহিরের ঘরে এলো শিশির। স্যুটকেস গুছিয়ে রাখছিল মিহির—বিছানার উপর চটি একটা বই। শিশিরের চোখ মলাটের হরফগুলোর ছবি তুলে নিয়ে মনে-মনে সাজিয়ে গেল: MAN, THE UNKNOWN।

"বইটা তোমার জন্যেই এনেছি—" মিহির বিছানায় বসে বইটা হাতে তুলে নিল: "পড়ে দেখো!"

মিতুর হাত থেকে বইটা নিজের হাতে এনে শিশির সামনের একটা চেয়ারে বসে গেল—লেখকের নামটার উপর চোখ বুলিয়ে নিলো: Dr. Alexis Carrel.

"বৈজ্ঞানিক, নোবেল প্রাইজ উইনার—মানুষ সম্বন্ধে চমৎকার সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন!"

"পড়ব।" শিশির নিরুত্তেজ গলায় বললে: "মানুষ সম্বন্ধে সব কথাই একদিন মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যেতে পারে!"

"ওটা কিন্তু তোমার য়ীহুদীদের মতো ধারণা!—" হেঁকে হেসে উঠল মিহির: "কার্ল মার্ক্স পৃথিবী বদলে দিতে চেয়েছিলেন, ট্রটস্কি কেবল বিপ্লবেরই স্বপ্ন দেখতেন, নিউটনের জগতকে ভাঙবার মতলব করেই

আইনষ্টাইন যাত্রা সুরু করেছিলেন, চার্লি সমস্ত সমাজ আর সভ্যতাটাকে ঠাট্টা করেই গেলেন! নিজেদের দেশ না থাকলে এম্নি হয়, পায়ের নীচে মাটি সরে গেলে তা-ই হয়।"—মিহির হাসতে লাগল: "পূব বাংলার হিন্দুদের তা-ই হয়েছে!"

"হয়ত তা-ই।" আপত্তি জানাতে পারলনা শিশির।

"তার চেয়ে কি এ-আশা করাই ভালো নয় যে সব পলিটিক্সের শেষেও মানুষ মানুষই থেকে যাবে — মানুষ হয়েই ফিরে আসবে আবার?" সহানুভূতিতে নম্র হয়ে এলো মিহিরের হাসির রেখাগুলো: "মানুষ দেবতা হতে চেয়েছিল একবার, কিন্তু মানুষই থেকে গেছে—এবার অতি-মানুষ হতে চাচ্ছে কিন্তু ফিরে আবার তাকে মানুষই হতে হবে! মানুষের রহস্য ত ফুরিয়ে যায়নি মানুষের কাছে—কেন সে মানুষের সীমা লঙ্ঘন করতে চায় এক্ষুণি?"

অদ্ভুত শোনাচ্ছে মিতুর কথাগুলো কিন্তু শুনতে খারাপ লাগছেনা শিশিরের। টুলুকেই যেন দেখতে পাছে সে—মিতুর চারপাশে টুলুকে দেখতে পাচ্ছে। চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় পৃথিবী আরেক রকম। স্নিগ্ধ, সুন্দর। হাওয়া দেয়, হাওয়া লাগে। সব হারিয়ে এটুকুত তবু পাচ্ছে শিশির—এ সময়টুকু—মিতু আর টুলুর এ-ছবিটুকু! এটুকু পাবে বলেই কি এখানে তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে এতদিন? কে জানত, পঁচিশ বছর আগে নিজের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি স্বপ্ন চোখ আবার এম্নি সত্যি করে ফিরে পাবে! জানত কি তার মন?

"বাবার কথা তোর মনে পড়ে, মিতু?" ভেঙে-যাওয়া ছবিগুলো মনে পড়তে সুরু করে শিশিরের।

"পড়ে। সবার কথাই মনে পড়ে, বাবা-মা-যতীনদা-তিতু-বৌদি—"

হঠাৎ থেমে যায় মিহির।

একটা ভাঙা হাসি ফুটে ওঠে শিশিরের মুখে—যেন একটা অভ্যস্ত হাসি, ব্যথার নাগপাশে জড়িয়ে থেকেও যাকে ভোলা যায়না।

"বাবাকে মনে পড়ে—" মিহির পরিচিত নামের জট থেকে একটি নাম খুলে নিয়ে আসে: "মনে পড়ে যে মানুষ ছিলেন, দেবতা নয়, অতিমানুষ নয়। জীবনকে ঘৃণা করতেন না, আনন্দকে অস্বীকার করতেন না—একজন সাধারণ মানুষ! সাধারণত্ব হারিয়ে ফেলে কোনো লাভ নেই—জবরদস্তিতে আমরা তা হারিয়ে ফেলছি। কিন্তু হারিয়ে ফেলে কি অসাধারণ কিছু তৈরী করতে পারছি? বলতে কি পারব আমাদের সন্তানরা অসাধারণ হবে? নদীকে খরস্রোতা করতে হলে তাকে উঁচু উপত্যকার পথে টেনে নিলে হবেনা, পথ গভীর করে নেবার জমি দিতে হবে। জীবনের দিকেই আমরা গভীর হতে পারি, জীবনের চারপাশে জঞ্জাল জড় করে নিজেদের সার্থক মনে করতে পারিনে!" মুখর হতে হল মিহিরকে—কথা শেষ করে বুঝতে পারল সে। দাদাকে তাঁর বিগ্রহগুলোর অন্ধকার থেকে টেনে বাইরে আনতে হবে বলেই হয়ত অনর্গল কথা বলে চলেছিল মিহির—তাছাড়া যেন নিজের জ্ঞানেরও পরিচয় দিতে চাইল সে দাদার কাছে! অনেকদিন আমায় খ্যাখোনি তুমি—খ্যাখো আমি কি হয়েছি! অনেক শিখেছি, অনেক পড়েছি, অনেক জেনেছি—খ্যাখো! অহঙ্কার নয়, পরীক্ষা দেওয়া। যা নেই, কে আর পরীক্ষা নিতে চাইবে তার? দাদাই চাইতে পারেন। কি শিখেছে মিতু—জিজ্ঞেস করতে পারে তাঁর মন—ম্যাট্রিকের আগে যেমি প্রশ্ন করতেন, দশ-মিনিটে পাইপার অব হেমেলিন গল্পটা বলতে পারিস? পনেরো মিনিটে বলতে পেরেছিল মিতু। খুসীর হাসিতে চোখ তখন উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তাঁর, ঠোঁটের

রেখাগুলো সুন্দর হয়ে উঠেছিল, তবু বলেছিলেন: "দশমিনিটে হলনা!" পরীক্ষাই দিতে এসেছে সে দাদার কাছে—আরো যাঁরা পরীক্ষা নিতে চাইতেন তাঁরা নেই, তাঁদের হয়ে দাদাই আছেন বলে দাদার কাছে এসে দাঁড়াতে হল তাকে। আর দেখতে পেল মিহির আজও আবার তেম্নি খুসীর হাসিতে ভাঙা হাসির ম্লানতা মুছে গেছে দাদার মুখ থেকে। দাদাকে খুসী করতে পারল সে! কিন্তু কি দিয়ে? আর্ট আর আধ্যাত্মিকতা দিয়ে নয়, পলিটিক্স আর জার্ন্যালিজম দিয়ে নয়—জীবনের উষ্ণ, নিবিড় স্পর্শ দিয়ে—শম্পাকে পেয়েছিল বলেই এই স্পর্শ দিতে পারল মিহির। বুলুকে পেলেও কি এম্নি স্পর্শই দিতে পারত সে? জীবনের উপর এম্নি শ্রদ্ধা থাকত কি তার তখনও? থাকত না। জীবনকে শ্রদ্ধা করতে পারছেন না কেন দাদা? হয়ত বৌদির জন্যে। মমতা ছিল, দয়া ছিল তাঁর বৌদির জন্যে কিন্তু শ্রদ্ধা ছিলনা। দাদার সময়ের পেছনে পড়েছিলেন বৌদি—তাই। বাবার সময়ের পেছনে পড়ে থাকেননি মা—মাকে তাই শ্রদ্ধা করতেন বাবা।

"আজ মনে হয়—" নিরুদ্বেগ সমর্পনের হাসিতে পবিত্র দেখাল শিশিরকে: "একটা জটিল সময়ে আমরা জন্মেছিলাম। যা শিখেছি তা পাইনি, যা পেয়েছি তা শিখিনি। জড়িয়ে ধরবার মতো কিছু ছিলনা—কিচ্ছু না!"

"জড়িয়ে ধরবার মন থাকাটাই আসল—যা-কিছু জড়িয়ে ধরতে পারা-ই সব!"

দুভাই ওরা চুপ করে থাকতে পারত খানিকক্ষণ কিন্তু হৈ-হৈ করে ঝুমু এসে ঘরে ঢুকল: "বেশ তোমরা—চুপচাপ বসে-বসে গল্প করছ—ওদিকে কাকিমা কি সুরু করেছেন দেখবে এসো!"

"কাকিমা!" জিভে কেমন যেন একটা অদ্ভুত স্বাদ লাগল

মিহিরের।

"মহিমকে মাংস আনতে বাজারে পাঠাচ্ছেন—বলছেন, নিজে ত রান্না করবেনই, খাওয়াবেন আর খাবেনও!" ঝুমু প্রায় হাততালি দিয়ে হেসে উঠল।

"বেশত!" হাসতে লাগল শিশির। কেমন যেন ভালো লাগছিল তার হাসতে। নীলাম্বরবাবুরও কি এম্নি ভালো লাগত? ভালো লাগল তার বলতে: "পাকস্পর্শ ত হ'ত সেকালে!"

ছয়

ঘরে আসতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। বারান্দায় পাটি বিছিয়ে গল্প করছিল ওরা। উঠতে ইচ্ছা ছিলনা শম্পার। জ্যোৎস্নায় ভূতের গল্প কেন জমে ওঠে তা যেন ও আবিষ্কার করে ফেলেছিল মনে-মনে—ডোবার ধারে কলাপাতার উপরে নীলচে চাঁদ সাদা চাঁদর জড়িয়ে দিয়েছে—হঠাৎ তুমি ভাবতে পারো ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে কেউ! তাছাড়া নরম আলোতে আর আধো অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে সবই কেমন অদ্ভুত হয়ে যায়—সত্যি বলে মনে হয় যা সত্যি নয়। কিন্তু কেউ কি জানে ভূতের গল্প—দাদা, মিতুদা, ঝুমুঁ? কথাটা পাড়লে কেমন হয়? হেসে উঠবে সবাই? হাসবে ত সে-ও, সে কি বিশ্বাস করে নাকি ভূত! তবু সে গল্পে শরীর শিউরে উঠতে পারে। শিউরে ওঠেই। মা জানেন সে-গল্প—ছাদে বসে বলতেন আগে—শম্পা বৌদির গা ঘেঁষে বস্ত—বৌদিও তা-ই। শিউরে উঠতে বেশ লাগত দুজনের। শিউরে ওঠার নেশায়ই যেন পেয়ে বসেছিল তাকে তখন। আজ কি আবার সে-নেশাই উঁকি দিচ্ছে তার মনে? ওঁরা ওঁদের যতীনদার কথা বলছিলেন। দু'জনেই গম্ভীর হয়ে উঠেছিল যতীনদার কথা বলতে গিয়ে। ওঁদের কথায় মন না দিয়ে অমনোযোগী ছাত্রীর মতো আকাশ-পাতাল ভেবে চলা তার উচিত হচ্ছে না। মিতুদা বলছিল: 'দেশ বলে যে একটা জিনিষ আছে, মর‍্যালিটি বলে মানুষের যে একটা কথা আছে তা জানতে পেরেছি প্রথম যতীনদার কাছে!' দাদাও নিশ্বাস চেপে নিয়ে ভারি করে তুলেছিলেন গলা: 'দেশে যতীনদার মতো কয়েক হাজার লোক

ছিল বলেই গান্ধীজির মতো নেতাকে আমরা পেয়েছিলাম !' 'আমাদের যে যা-ই করে তুলুক—বাইরের ছবি আজ যতো এলোমেলোই হোক, ভেতরে আমরা ইস্রেল হতে পারিনে—ভারতবর্ষ তাই নিজেকে বিলিয়ে, বিকিয়ে ফতুর হয়ে যাবেনা কোনোদিন !'—মিতুদা পলিটিক্সে বাঁক নিচ্ছিল। দাদা ব্যক্তিগত ব্যাপারেই ফিরে এলেন ঃ 'একেবারে উচ্ছন্ন হয়ে যাইনি আমরা যতীনদার জন্যে ! মনের ভেতর কোথায় যেন যতীনদা একটু বাসা করে নিয়েছিলেন—তার মায়া ছাড়তে পারেনি মন। ছিঁড়তে পারেনি তার গিঁট !" যতীনদা'র ছবিতে মন দিতে গিয়ে মনোযোগী হয়ে উঠতে হ'ল শম্পাকে। সুপ্রিয়র মুখটিই যেন ভেঙে গড়ে একটু আলাদা হয়ে তার চোখের উপর এসে দাঁড়াল। এঁদের মতো তারও যে একজন দাদা ছিলেন—হু হু করে ঝড়ের মতো কথাটা মনের উপর দিয়ে চলে গেল—ঝড়ের অনুভব পেয়েই জেগে উঠল মন। মিতুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শম্পা। এম্নি করে তার মুখের দিকে যেন আরো একদিন তাকিয়েছিল সে। যেদিন সুপ্রিয়র মৃত্যুর খবর আসে, বিকেলবেলা মিতুদাকে সামনে পেয়ে সে হয়ত ঠিক এম্নি ভাবেই তাকিয়েছিল ! মনে হয়েছিল, মিতুদার বুকে মুখ রেখে যদি সারারাত কাঁদতে পারে, তাহলে বুঝি চোখ তার খানিকটা হাল্কা হয়। আজও তা-ই। দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে চোখ নামিয়ে নিল শম্পা। মিতুদার মুখের দিকে ঝুমু-ও তাকিয়ে আছে—মনে হচ্ছিল সে যেন উপকথা শুনছে—স্বপ্নের দেশের কাহিনী—তার কাছেও যেন অদ্ভুত ঠেকছিল তার বাবাকে আর কাকাকে। কথা ফুরিয়ে এসেছে। শম্পার মনে হল, ছবি এঁকে চলেছে সবার মন, মনের আলাদা-আলাদা ছবি। কারো ছবির সঙ্গে কারো ছবির মিল নেই—যা একটু মিল আছে তার ছবির সঙ্গে

মিতুদার ছবিরই।

"ঘুমোও গে এখন—" শেষটায় শিশির আসর ভেঙে দিলে: "কাল রাত্তিরেও ঘুমোও নি!"

"হ্যাঁ—" মিহির নিজেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে। টুলু এতো তাড়াতাড়ি উঠে আসতে পারেনা—তা সে জানে।

দাদাকে সব কথাই বলেছে মিহির—সবই মেনে নিয়েছেন দাদা—মেনে না নেবার মতো শক্ত মন তাঁর নয় বলেই হয়ত মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তা বলে দুর্ব্বলতার গ্লানি জমিয়ে রাখেন নি মনে। মিহির তাই আজ অসঙ্কোচ। কালও সে জানতনা দাদা কতটুকু নিতে পারবেন, কতটুকু পারবেন না—মিহির ভেবেছিল নিজেদের গোপন রেখেই দাদার কাছ থেকে ওরা বিদায় নেবে। গোপনতার কাঁটা অবশ্যি ওদের দুজনকেই বিঁধছিল — শম্পা কিছুতেই রাজি হতে পারছিলনা এ-গোপনতায়। কিন্তু দাদাই বিবাদ মিটিয়ে দিলেন—মার চুড়িগুলো খুলে এনে শম্পার হাতে দিয়ে বললেন—"তোমার জন্যেই রেখেছিলেন মা—।" দাদাকে আরেক পরিচয়ে চিনতে পারল মিহির, তার মনে দাদার আগেকার মূর্ত্তি ভেঙে-চূরে ঝুরঝুর করে পড়ে গেল — মিহির সঙ্কোচের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো সত্যিকারের আলোতে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে — বিকেলবেলা — সাবজজ রহমান সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিল ওরা দু'ভাই—দাদার কলকাতার সহপাঠী রহমান সাহেব—এখানে এসে খুঁজে বার করে নিয়েছেন দাদাকে—রোজই দুঘণ্টা ফিলসফি আলোচনা করেন দু'বন্ধুতে — রহমান সাহেবের বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পথে দাদা জানতে পেরেছিলেন তার সঙ্গে শম্পার 'বিয়ে' হয়নি। অবাক হলেন না তিনি একটুও, বললেন: "চমৎকার মেয়ে টুলু!"

মিহির ঘরে এলো—টুলু হয়ত এখন দাদার ঘরে গিয়ে দেখছে, ওর হাতে পাতা দাদার আর ঝুমুর বিছানা দু'টো ঠিক আছে কিনা, না কি চাদর কুঁচকে আছে কোথাও, মশারিতে মশা ঢুকতে পারে কোনরকমে! সব ফাঁক---সবার মনের ফাঁক ভরে দিতে জানে এ চমৎকার মেয়ে! ওকে নিয়ে কোথাও তাই বিপদ নেই, কোনোরকমেই ভয় নেই। রঙও ভালো ছিল তার, শুধু দাদার মনের সুন্দর ক্যানভাসই নয়, তাই মিহির এ অপূর্ব্ব ছবি আঁকতে পেরেছে।

যতীনদা যদি আজ থাকতেন—দেখতে পেতেন টুলুকে আর তাকে—কি করতেন তিনি? হয়ত হাততালি দিয়ে হেসে উঠে বলতেন: —"মিতু এম্নি অদ্ভুত কাজই করবে আমি জানি!"—জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যেবার তার মেসে দেখা করতে এসেছিলেন যতীনদা—যখন মিহির পূরোদস্তুর মার্ক্সবাদী—পৃথিবীকে পাল্টে দেবার স্বপ্ন দেখছে—ছেলেমানুষের মতো খুসীতে হেসে উঠেছিলেন তিনি: "কি সব অদ্ভুত কথা বলে ছাখো—"! উদারতা বলে একে ভুল করলে চলেনা—ফরাসীমনের যুক্তিবাদী উদারতা নয় এ—ভারতবর্ষের আশ্চর্য্য মর‍্যালিটি। সহিষ্ণুতা নয়, মর‍্যালিটি! যা তোমার নিয়মে পড়েনা ফরাসী মনের উদারতা থাকলে তাকে তুমি মেনে নিতে পারো কিন্তু মেনে নিয়েও তাকে ইম্মর‍্যালই বলবে—একটা প্রচলিত সংজ্ঞায় মর‍্যালিটির নিয়মের বাইরে ঠেলে দেবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মর‍্যালিটি তার নিয়মের বাইরের রূপগুলোকে সংজ্ঞা ছাড়া শুধু সত্তা হিসেবেই চিনে নিতে পারে। কোনো উদ্বেগ নেই তাতে—যুক্তির কসরৎ নেই, বিবেকদংশন নেই। গান্ধীজিতে তা-ই দেখতে পেয়েছি আমরা—যাঁরা গান্ধীজিকে তৈরী করেছেন তেমন লক্ষলক্ষ নামহীন যতীনদাতে তা-ই দেখতে

পাবো আমরা আড়াইশ' বছর ইংরেজরাজত্বের পরও এই ভারতবর্ষে। ইংরেজ আমাদের প্র্যাকটিক্যাল হতে শিখিয়েছেন—ওঁদের দেওয়া বিদ্যা আমাদের হাতে এসে শুধু পৌঁচেছে — যেদিন মনে গিয়ে পৌঁছুবে—মিশতে পারবে যেদিন আমাদের মর‍্যালিটির সঙ্গে—সেদিনই সত্যিকারের স্বাধীন, নূতন ভারতবর্ষের জন্ম হবে! হবে —জন্ম হবে নূতন ভারতবর্ষের—সেই মানুষগুলোকে চোখের উপর ছবির মতো দেখতে পাচ্ছে মিহির। হয়ত সেদিন মিহির থাকবে না, দাদা থাকবেন না, টুলু-ঝুমু এরা কেউ থাকবেনা—কিন্তু তাদের প্রাণকণা আর সে-প্রাণকণায় তাদের ইচ্ছা থেকে যাবে! মিহিরের একটি প্রাণকণায় কি আজ মা আর বাবা তাঁদের তৃষ্ণার অবসান দেখতে পাচ্ছেন না—তিতু আর যতীনদা কি তাঁদের ইচ্ছার আঁর স্বপ্নের ক্ষুধা মেটাতে পারবেন না মিহিরের বুকের এক-একটি আনন্দস্পন্দে?

হারিকেনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে মিহির বিছানায় এসে বসল। জ্যোৎস্নার একটা চৌকো নক্সা জানলা গলিয়ে টুলুর বিছানায় এসে পড়েছে। আলোটা নিভিয়ে দিলেও বা কি—ওটুকু জ্যোৎস্না নিয়েই ত থাকা যায় আজ। শুধু আজ, কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে আজই শুধু তার মনে হচ্ছে কানায় কানায় ভরে গেছে সে—কোনোদিকে অসম্পূর্ণ হয়ে নেই। আনন্দে আর ব্যথায় পূরোপূরি আলোছায়া তার বুকে। নিজেকে এমন সম্পূর্ণতায় আর হয়ত কোনোদিন পাওয়া যাবেনা। টুলুও তা-ই—তা-ই। নিজেকে এতো নিবিড়ভাবে পায়নি আর ও কোনোসময়। সব কাজে এমন মন ঢেলে দিতে পারেনি ও আর এর আগে। রান্নাঘরে একা ছিল একসময়—মিহির উঁকি দিয়ে হাসতে লাগল

—সে-হাসির উত্তরে খানিকটা কথার হাসিই ছিটিয়ে দিয়েছিল টুলু: "ভালো লাগছে!" মিহির বলেছিল: "কাল আমিও দেখব রাঁধতে ভালো লাগে কি না!" "ভালো লাগতে থাকলে সবই ভালো লাগে!"—টুলুর কথাটা কানের ভেতর তুলে নিয়েছিল মিহিরের। হঠাৎ মনে পড়েছিল মার মুখ—এখানেই কোথাও এম্নি আরেকটা রান্নাঘরে মা রান্না করতেন। "ভালো লাগত তাঁর—সবই ভালো লাগত। সবই ভালো লাগত—তাই গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি—সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, অনুকরণের ক্লান্তি ছিলনা তাই তার শিল্পে। দাদা অনুকরণ নয়, তিতু অনুকরণ ছিলনা, সে হয়ত সৃষ্টিছাড়া অন্য একটা সৃষ্টি। সৃষ্টিছাড়া হওয়াই সৃষ্টির মূলকথা। অনুসরণ নয়, অনুকরণ নয়। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস কেন হিলিয়াম হতে চায়? নিজের রূপ ভেঙে ফেলে অন্যরূপে যেতে চায় কেন অ্যাটম? অস্থির কামনায় বারবার নিজেকে মুছে দেওয়াই প্রকৃতির তত্ত্ব, জীবনের সত্য।

মিহির হঠাৎ থেমে গিয়ে বুঝতে পারল গান গাইতে পারেনা বলেই সে মনে মনে প্রায়ই প্রবন্ধের টুকরো তৈরী করে চলে। এতো কবিতা পড়ল সে—কিন্তু দুলাইন কবিতাও লিখতে পারলনা কোনোদিন! চেষ্টা করলেও হয়ত পারতনা—কবি বলে অভিনয়টুকুও করতে পারেনি কোনোদিন। কবিতা তার মজ্জায় মিশে আছে, যতীনদার অনুভবের মতো—বাইরে কোনোদিন বেরিয়ে আসবে না—আসতে পারে না। এ-ভাবে কিন্তু পলিটিক্সকে পায়নি মিহির—হয়ত সুপ্রিয় পেয়েছিল! কিন্তু মনে হয় মর্‍্যালিটিকে পেয়েছে সে রক্তের উপাদানে। ইম্মর‍্যাল হতে পারলনা সে কোনোদিন—আশ্চর্য্য! বাবা বলতেন, প্রিয়জন মরে গেলে তার

আত্মা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে—আমাদের বিপদ থেকে বাঁচায়! তা হয়ত নয়—আমাদের ভেতরে যে একটি সতর্ক, সাবধানী পুরুষ বেঁচে থাকে তারই কণ্ঠ আমরা শুনতে পাই বিপদে এগিয়ে গেলে, ইম্মর‍্যালিটিতে পা বাড়ালে—তার কথাই বাবা ওভাবে বলতেন। এ আমাদেরই আরেকটা সত্তা, মনের ভেতর মন!

চুপ করে থাকলে কথার ভীড় জমতে থাকে মনে—মিহির অস্বস্তি বোধ করল—টুলু কখন আসবে! কিন্তু টুলু এলেও ত কথাই বলতে হবে তাকে—তবে তা আরেক রকম কথা—জীবন্ত উষ্ণতা আর আবেগ-মেশানো ধ্বনি-শিল্প খানিকটা। গান গাইতে পারেনা; কবিতা তৈরী করতে পারেনা তার প্র্যাকটিক্যাল মন কিন্তু কবিতার মতোই হয়ত কথা তৈরী করতে পারে। প্রেত জীবনের, কতগুলো কঙ্কালকে টেনে এনে তাদের গলায় কথার মালা পরিয়ে দেয়ার চাইতে এ-ই কি ভালো নয়? ভালো? না কি একই রকম? সমুদ্রের পেছনে ঢেউ উঠছেনা মনে হয়, সামনে ব্রেকার দেখছি। কিন্তু পেছনেও স্পন্দন আছে—ওঠা-নামায় দুলছে সমুদ্রের জল—মুক্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেনা আকাশে—কিন্তু আঁকাবাঁকা রেখায় রূপায়িত করছে আকাশ। সমুদ্র জুড়েই ঢেউ, এখানে আর এখন বলেই নয়—সব জায়গায়, সমস্ত সময়ে। একই কথা—পেছনে পড়ে থেকে নীরব হয়ে গেছে—কিন্তু এম্নি ধ্বনি-শিল্প ছিল তা এক সময়—এম্নি উষ্ণতা ছিল, আবেগ ছিল। আজ যেম্নি অনুভবে কথা বলতে পারবে সে টুলুর কানে ঠিক তেম্নি অনুভবই হয়ত ছিল তার যখন মা-বাবা, যতীনদা-হাবুল-তিতুর সঙ্গে কথা বলত এ বাড়ির ছোট ছেলে মিতু।

চুপ করে রইল মিহির—এবার সত্যি চুপ করে রইল।

'চুপচাপ শুয়ে আছে মিতু বিছানায়'। কে যেন বলছিল—মিহির শুনতে পাচ্ছে। কেউ বলতে পারে না তবু সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। টুলুর টেবিলের উপর সাদা কয়েকটা পট—আয়নায় খানিকটা ঝিল্‌মিল্‌ আলো। কয়েকটা আম পাতার ছায়া নিয়ে চৌকো জ্যোৎস্নার নক্সাটা খাটো হয়ে গেছে। বহরমপুর থেকে কে একবার একঝুড়ি আম পাঠিয়েছিলেন—তারই আঁটির গাছ—আম ধরতে দেখে গিয়েছিলেন মা। শিয়রের দিকে চোখ তুল্‌ল মিহির—কে থাক্‌বে—কেউ নেই।

শম্পা এলো। দেয়ালের দরজা বন্ধই আছে—সামনের দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে এখন তার ছুটি।

"বাঃ, শুয়ে পড়েছ তুমি?" একঝাঁক পাখীর গান যেন বুকের ভেতর কল্‌কল্‌ করে উঠছে শম্পার।

"কবিতা লেখার সময় যাচ্ছে—তা যখন লিখতে পারিনে, শুয়েই পড়লাম!"

"বেশ ঘুমোও তাহলে—" শম্পা তার বিছানায় গিয়ে বসল।

"শুয়ে থেকেও গল্প করা যায়।"

হারিকেনের অইটুকু আলোতেই শম্পার মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন দেখতে পাচ্ছে মিহির—আলো না থাকলেও হয়ত দেখতে পেতো—জ্যোৎস্নার ছোট্ট আলপনাটুকু ত ছিল!

"লক্ষীপূজো হত এ-ঘরে, জানো টুলু?" গল্প সুরু করে দিল মিহির: "পিটুলি গুলে মা আলপনা দিতেন—আলপনার উপর জ্যোৎস্না এসে পড়ত—এম্নি জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নাটুকু ঠিকই আছে, শুধু আলপনাটাই মুছে গেছে!" শম্পার চোখের দিকে তাকাল মিহির—কোনো কিশোরীর চোখ যেন রমণীর উষ্ণতায় ভরে উঠছে

কানায়-কানায়—চোখ নামিয়ে নিল শম্পা।

"ছেলেবেলাটা আমার অভিমানেই কেটেছে, আজ মনে হয়। শুধু মনে হত, মা বুঝি আমায় বেশি ভালোবাসেন না—কোল ছাড়িয়ে দেবার ব্যথাটা ভুলতে পারিনি! কিন্তু এ-ব্যথা ত ওদের আরো বেশি থাকবার কথা—দাদার আর তিতুর। ছোট ছেলে হবার অই দোষ, বেশি আদর চায়, বেশি অভিমানী হয়!"

শম্পা উঠে দাঁড়াল। টেবিলের কাছে ঘুরে এসে আবার বিছানার ধারে এসে বসল।

"একা থাকবার আমার শক্তি নেই জানি, তাই এ-দুর্ব্বলতাকে মুখোস পরিয়ে একা থাকতে চেয়েছি আমি! বিপরীত দুটো জিনিষ না হলে মানুষের যেন কিছুতেই চলেনা!"

শম্পা জানলায় গিয়ে দাঁড়াল এবার।

"নিজেকেও মানুষ বেশিদিন ভালোবাসতে পারেনা—শুধু নিজের জন্যে কাজ করে যেতে পারেনা বেশিদিন। অন্তত আরেকটি মানুষের তার দরকার হয় যার জন্যে কাজ করে সে আনন্দ পায়! তাই প্রাণের ধর্ম্মই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া—বাইবেলের ঈশ্বর তা জানতেন!"

মিহিরের বিছানায় ফিরে এলো শম্পা।

"তোমার ছেলেবেলার কথা বলতে পারোনা?" অনুযোগ আর অনুরোধ মিশে নিবিড় হয়ে উঠ্‌ল যেন একটি কিশোরীর কণ্ঠ।

মিহির হাত বাড়িয়ে দিল—শম্পা ওর হাতের উষ্ণতায় জড়িয়ে নিল মিহিরের হাত। জানলাগুলো দিয়ে হাওয়ার একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তবু গা থেকে আলগা করে ফেলল শম্পা

কাপড়ের স্তূপ। আলগা করতে গিয়ে অবাক হল, মাথায় ওর এখনও ঘোমটাটা ছিল!

"এ-ঘর যখন ছিলনা এখানে—" মিহির তার ছেলেবেলার ছবি আঁকতে চেষ্টা করল: "একটা সজ্‌নে গাছ ছিল এখানটায়। একটা মৌচাক হয়েছিল একবার গাছটায়। সেই মৌচাক-কাটার সময় মা যে কেমন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন মনে পড়ে!"

"কেন কাটলেন সে-মৌচাক?" স্বপ্নের স্বর শোনা গেল শম্পার গলায়।

"হয়ত কাটতেই হয়।" মিহিরের গলায়ও অন্ধকার জড়িয়ে এলো।

"মৌমাছিগুলো উড়ে গিয়ে আবার কোথাও তৈরী করে মৌচাক, না?"

"মক্ষীরাণী তৈরী করায়।"

শম্পা গা এলিয়ে দিল বিছানায়—মিহির একটু সরে গিয়ে ওর জন্যে জায়গা করে দিল। একটা বালিশ তুলে এনে মাথার নীচে গুঁজে দিলে। আরাম বোধ করল শম্পা। চোখ উঁচু করে মিহিরের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে: "বলো—"

"তৈরী হবে আবার মৌচাক। Hived in our bosoms like the bag o' the bee...... সত্যি আমি ভাবি টুলু, the honey with these objects grow."

"হবে?"

"হবেনা?"

মিহিরের হাতটা তুলে এনে শম্পা ওর চোখের উপর রাখল। চোখের উষ্ণতায়, আলোর উষ্ণতায় মিহিরের অন্ধকার অজস্র

শব্দের গুঞ্জনে নিঝুম হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"হবে।" নিশ্বাসের শব্দের মতো নরম, আধ-আধ ধ্বনিতে শম্পার ঠোঁট কেঁপে উঠল। যেন বিশ্বাসের কোনো অশরীরী ধ্বনি তুলে অশরীরী হয়ে যাচ্ছে শম্পা। শম্পাকে খুঁজতেই পাশ ফিরে তাকাল মিহির। হাত দিয়ে ছুঁয়ে যেতে চাইল সে অপরূপ ধ্বনির উৎসকে। মিহিরের হাতের রুক্ষতায় একরাশ ফুলের পাপ্ড়ি গলে পড়ল।

শিউলি ফুল কুড়োত একটি ছেলে—হাতে ঠিক এম্নি লাগত কি শিউলি ফুলের পাপড়িগুলো? শম্পার গালের পাশের রোঁয়াগুলোর মতো এম্নি নরম? দুহাতে শম্পার মুখ চোখের উপর তুলে ধরে কি যেন দেখছিল মিহির। নিজেকেই দেখছিল হয়ত। সেই অচ্ছোদ সরসীতে টলমল করে উঠছে বুঝি তারই ছায়া। গভীর, অতল হয়ে কোথায় যে মিশে যাচ্ছে সে-ছায়া কে বলবে! বল্‌তে পারে কি শম্পা? বুঝতে কি পারছে ও, মিহিরকে যে টেনে নিচ্ছে ওর চোখের ভেতর, দেহের ভেতর, জীবনের ভেতর?

এ-মিহিরকে চেনেনা মিহির—এ সোনালি অন্ধকারের মিহিরকে। এ-শম্পাকেও সে কতোটুকু চিন্‌ত ওর ঘুম-ভরা চোখে? এখানে, এখন শম্পা সম্পূর্ণ—এ-সোনালি অন্ধকারে সম্পূর্ণ। যেম্নি গাছ, যেম্নি আকাশ, যেম্নি সমুদ্র আর পাহাড় একটি রাত্রির কাছে সম্পূর্ণ তেম্নি। সম্পূর্ণ মিহিরের কাছেও। কোনোদিনকার বুলুর, কোনোদিনকার সুপর্ণার, কোনো-কোনো মুহূর্ত্তের কোনো-কোনো মেয়ের চোখের উষ্ণতায় সম্পূর্ণ এখন শম্পা। ওর সমস্ত শরীরে ফুলের স্বাদ পাচ্ছে মিহির—ফুলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে তার শরীরে।

মিহির তাকিয়ে আছে। শম্পার চোখের আশ্চর্য্য আলোর দিকেই

মুখ নিয়ে জ্বলো। বিছানার ওধার ঘেঁষে ভাঙা কাচের আলমারির এপাশে-ওপাশে গাঢ় অন্ধকার। মিহিরের মনে হল যেন কা'র, যেন কিসের ছায়া জমে উঠছে ওখানে। ছায়ারা নড়ছে।—তাকাতে ইচ্ছে করছিল তার কিন্তু তাকাতে পারেনি। তাকালে কি সে দেখতে পেত আলমারিতে মিতুর সেই পুতুলগুলো—স্প্রিং-এর পুতুল, তুলোর পুতুল, মাটির পুতুল—বাবার সঙ্গে সংক্রান্তির মেলায় গিয়ে যা কিনে আনত' মিতু? পুতুলের সঙ্গে আর কাউকে দেখতে পেত কি আলমারির সামনে ছায়ার মতো?

মিহিরের মনে হ'ল কে যেন কি খুঁজছে ওখানে। 'মিতুর পুতুলগুলো কই?'—মা! মা-ই বলছেন খালি আলমারিতে উঁকি দিয়ে। শিয়রের দিকটা ভারি হয়ে উঠল ছায়াদের আনাগোনায়। মশারি তুলে নিচ্ছে যেন কার হাত! 'পুতুলগুলো কই'—শুনতে পাচ্ছে মিহির। "এইত—এই—এই"—তার কানের ভেতর এক ঝলক শব্দ ঢুকিয়ে দিল মশারি তুলে নিয়ে কারো মুখ। কে? বাবা?

মাথা তুলে মিহির শিয়রের অন্ধকারের দিকে তাকাল। আলমারির ভাঙা কাচগুলো আকাশের মতোই ঘোলাটে। জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে—মশারিটা সত্যি দুলছে। ভোর হল।

আর মিহিরের মনে হ'ল, গভীর নিশ্বাসে ঘরের সবটুকু অন্ধকারই বুঝি টেনে নিয়েছে টুলু—সব ছায়া — অন্ধকারের রেখাগুলো।

তাকিয়ে আছে তার দৃষ্টিহীন চোখ। সে-চোখ অনুভব করে চলেছে শম্পার চোখের গভীরতা। কার ছবি, কার ছায়া এখন ওখানে? একটি শিশুর মুখ! অনুভব করছে মিহির—মিতুর মতো। মিতুর মতো তবু মিতু নয়। ঘুম-ভরা চোখ! 'টুলু'—একা সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে কাকে যেন ডেকে উঠল মিহির—শম্পার ঠোঁট কেঁপে উঠছে, ঠোঁটের গায়ে পিচ্ছিল উষ্ণতায় অনুভব করল মিহির।

"তোমাকে চাই, তোমাকে—যে-তোমাকে দেখেনি তাকে চাই—"

কে বলছে? কে? শম্পা? না মিহির? হয়ত দুজনেই বলছে ওরা—ধ্বনিহীন কথার রেখা অন্ধকারের মতো জড়িয়ে ধরেছে তাকে আর শম্পাকে।

"চাই—যে তুমি নও, আমি নই—তবু তুমিও, আমিও......"

বলছে কেউ। সমস্ত শরীরের স্পন্দনে এ-কথাই উচ্চারিত হচ্ছে মিহিরের—শম্পার। আমি থাকছি—চিরদিনের জন্যে থেকে যাচ্ছি—শম্পার মনে, শম্পার দেহে, চিরকাল মানুষের স্রোতে। মিহির এবার স্পষ্ট তার নিজের গলা শুনতে পেল—অবিকল মিহিরের সেই গলা যাকে অনেকদিন বলতে শুনেছে সে: আমি মুক্ত, আমি মুক্ত।

ভোরের দিকে হঠাৎ একসময় জেগে উঠেছিল মিহির—চোখে ঘুম ছিল, বুঝতে পারছিল তক্ষুণি আবার ঘুমিয়ে পড়বে, তবু জাগতে হয়েছিল তাকে। টুলু ঘুমুচ্ছে। অন্ধকারের স্তূপের মতো মনে হচ্ছিল ওকে—মশারির ভেতরকার চৌকো পাতলা অন্ধকারটা যেন ওখানে গিয়েই জড় হবে। মিহির মশারির বাইরে মুখ নিয়ে গেল। আকাশের মতো ঘোলাটে ছাদ—আকাশের নীচেই কি ছিল তারা? ওপাশে টুলুর খালি বিছানাটার দিকে তাকিয়ে মিহির আবার মশারির ভেতরে

রর

রর